মুখ আর মুখ

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

MUKH AAR MUKH

প্রথম প্রকাশ ঃ ১লা বৈশাখ ১৩৭১
প্রকাশিকা ঃ লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৯
মুদ্রাকর ঃ অনিলকুমার ঘোষ। নিউ ঘোষ প্রেস। ৪/১ই, বিডন রো, কলকাতা-৬
প্রচ্ছদ ঃ কৃষ্ণেন্দু চাকী

বারান্দায় দাঁড়িয়ে রঙীন মানুষের শোভাযাত্রা দেখছিলাম। ঠিক পুজোর এই সময়টায় কলকাতার রাস্তায় অনেক রকম রঙ দেখা যায়! একেবারে টাটকা নতুন। কয়েকদিন আগে গড়িয়াহাট মোড়ে একটা দোকানের শো-কেসে সাজানো শাড়িগুলো দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছিলাম! এমনিতে আমার শাড়ি সম্পর্কে কোনো আগ্রহ নেই, যতটা আছে শাড়ি পরিহিতাদের সম্পর্কে। কিন্তু কী আশ্চর্য সুন্দর সব রং সেই সব শাড়ির, আমিই মুগ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম—মেয়েরা যে এই সব শাড়ির দোকানে ঢুকে পাগল হয়ে যাবে, তাতে আর সন্দেহ কী!

পুজোর সময় কোনোবারই কলকাতায় থাকি না। সেবার ছিলাম। প্রত্যেকবারের মতনই, সেবারও কোথায় যেন বেড়াতে যাবার প্রোগ্রাম ঠিকঠাকই ছিল, হঠাৎ মহালয়ার দিন হুম করে জ্বর এসে গেল। এমনই জ্বরের দাপট যে কেউ বললো টাইফয়েড, কেউ বললো, ম্যালেরিয়া। আমি গায়ে কম্বল চাপা দিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছি, শরীরে অসহ্য ব্যথা, চোখ খুলতে ইচ্ছে করে না, কথা বলতেও ইচ্ছে করে না। বেড়াতে যাবার প্রোগ্রামটা বাতিল করার পর যেমন হুম করে এসেছিল, তেমনি হুম করে জ্বর ছেড়েও গেল আবার। সপ্তমী পুজোর দিন আমি সিঙ্গি মাছের ঝোল দিয়ে ভাত খেলাম।

ক'দিনের জ্বরেই শরীর খুব দুর্বল হয়ে গেছে, এখনো রাস্তায় বেরিয়ে হাঁটাহাঁটি করার শক্তি নেই। বাড়ির সকলে বেরিয়ে গেলেও আমি বারান্দায় একলা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। সময়ের মনে সময় কেটে যায়।

প্রতি বছরই এইরকম সময় কলকাতার রাস্তায় বেশ কিছু খোঁড়া

ছেলেমেয়ে দেখতে পাওয়া যায়। ঠিক খোঁড়া নয়, খুঁড়িয়ে হাঁটে। কারণ, নতুন জুতোর ফোস্কা। ইস্কুলে পড়ার সময় আমারও ঠিক এইরকম হতো। বিশেষ কিছু এখনো বদলায় নি। মাঝে মাঝে দেখি, একসঙ্গে তিন-চারটি মেয়ে একই রঙের ফ্রক পরে যাচ্ছে। স্পষ্ট বোঝা যায়, ওরা একই বাড়ির মেয়ে। সম্ভবত বোন। ছেলেবেলায় যখন অন্য পাড়ায় থাকতাম, ঘোষদের বাড়ির চার বোনকে প্রতিবার এইরকম এক রঙের ফ্রক পরে বেড়াতে যেতে দেখতাম। ওদের বাবা বড়বাজার থেকে এক থান কাপড় কিনে আনতেন, তাই দিয়ে সকলের জামা। ঠিক যেন কোনো খেলার দলের জার্সি। ব্যাপারটা ওদের খুব একটা মনঃপূত হতো না নিশ্চয়ই। কিন্তু সেই ট্র্যাডিশন এখনো চলছে, এখনো দু'একজন জেদী বাবা মেয়েদের ইচ্ছে অনিচ্ছে গ্রাহ্য করছেন না।

বাড়ির খুব কাছেই তিনটে পুজো প্যাণ্ডেল। তিনটেরই জাঁকজমক প্রায় সমান সমান। এবং বীরবিক্রমে তিনটি প্যাণ্ডেলের তিনটি মাইকে তিন রকম গান বাজে। তাতে যে ঐকতান তৈরি হয়, সেটাকে একটা নতুন ধরনের সঙ্গীতই বলা উচিত। আমার বেশ লাগে। বিশেষত যখন রবীন্দ্রসঙ্গীত, নবদ্বীপ হালদারের কমিক আর হিন্দী সিনেমার গান একসঙ্গে চলতে থাকে, তখন বেশ একটা উচ্চাঙ্গের ডামাডোল তৈরি হয়, আমি খুবই উপভোগ করি। জ্বরে-ভোগা, রোগা, দুর্বল শরীর নিয়ে আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে একা একা হাসি। হঠাৎ যদি কোনো কারণে মাইকগুলো বন্ধ হয়ে যায়, এবং একসঙ্গেই বন্ধ হয়, তখন কিন্তু সেই উৎকট স্তব্ধতা রীতিমতন অস্বস্তিকর লাগে। যে-লোকের রাত্তিরবেলা ঘুমের মধ্যে জোরে নাক ডাকে, তার নাক ডাকা যদি হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তখন যেমন ভয় করে, মনে হয় লোকটা মরে গেল নাকি?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে যখন পা ব্যথা হয়ে যায়, তখন ঘরের মধ্যে এসে বই নিয়ে শুয়ে পড়ি। পুজো সংখ্যাগুলো এত আগে বেরোয় যে কবেই সব পড়া শেষ হয়ে গেছে, এখন আর নতুন পড়ার জিনিসও

বেশী নেই। বাধ্য হয়ে একটা প্রবন্ধের বই-ই পড়ছিলাম, কিন্তু সপ্তমী পুজোর রাত্তিরে কারুর ঘরে শুয়ে প্রবন্ধ পড়তে ইচ্ছে করে? জ্বরটার ওপর এমন রাগ হচ্ছিল!

এই সময় হঠাৎ মনোযোগ অন্যদিকে গেল। কোনো কারণে দুটি প্যাণ্ডেলের মাইক সাময়িকভাবে বন্ধ, আর তৃতীয়টি থেকে একটি ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। একজন তারস্বরে চ্যাঁচাচ্ছে, লিপিকা মিত্র, লিপিকা মিত্র, আপনি যেখানেই থাকুন, মূল প্যাণ্ডেলের ডান পাশে আমাদের ভলান্টিয়ার্স রুমে এক্ষুনি চলে আসুন। আপনার বাড়ির লোকজন অপেক্ষা করছেন···লিপিকা মিত্র, লিপিকা মিত্র···

সন্ধের পর থেকেই মাঝে মাঝে এরকম হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা শোনা যাচ্ছে। এটাও নতুন কিছু নয়। সেই আমাদের ছেলেবেলা থেকেই পুজো প্যাণ্ডেলে অনেকে হারিয়ে যায়। কেউ কেউ ভিড়ের চাপে ছিটকে পড়ে, কেউ ইচ্ছে করে হারায়। যদি কোনো পুঁটুরানীর বাড়ির লোকেরা খুব স্ট্রিক্ট হয়, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে একদম মিশতে না দেয়, তা হলে সে-পাড়ার গদাইদার সঙ্গে পুঁটুরানীর নিরিবিলিতে দেখা করার এই এক চমৎকার উপায়। পুঁটুরানী ভিড়ের মধ্যে ইচ্ছে করে হারিয়ে গিয়ে দেড় ঘণ্টা বাদে বাড়ি ফিরলে কেউ বকবে না।

একটু বাদে আবার ঐ ঘোষণাটি শুনতে পেলাম। এবার ভাষাটি একটু অন্যরকম! এবার একজন কেউ গম্ভীর গলায় হুড়োহুড়ি করে বললো, লিপিকা মিত্র, লিপিকা মিত্র, তুমি এক্ষুনি অফিস ঘরে চলে এসো, তোমার মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন!

আগের বার আপনি, এবার তুমি। লিপিকা মিত্রের বয়েস কত? যদি বাচ্চা মেয়ে হয়? ছ' সাত বছরের একটি মেয়ে যদি বাবা মায়ের কাছ থেকে আলাদা হয়ে পড়ে—তা হলে তো খুবই ভয়ের কথা! বহু লোকই অনেক দূর থেকে আসে ঠাকুর দেখতে। মেয়েটি যদি বাড়ির ঠিকানা বলতে না পারে?

আর একটু পরে, লিপিকা মিত্রের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানা

গেল মাইকের ঘোষণায়। এবার বলা হলো : লিপিকা মিত্র, লিপিকা মিত্র, বয়েস পনেরো। মা, দিদি ও কাকাবাবুর সঙ্গে এসেছে, অনেকক্ষণ তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সোনারপুর থেকে এসেছে, লিপিকা মিত্র—লাল রঙের শাড়ি পরা, অ্যাঁ কী বলছেন ? লাল নয়, গোলাপী ? লিপিকা মিত্র, গোলাপী রঙের শাড়ি পরা, বয়েস পনেরো—

এবার আমি বেশ চিন্তিত হয়ে পড়লাম। মেয়েটি সত্যিই হারিয়ে গেছে, কিংবা ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গেল কেউ, নাকি ইচ্ছে করেই কারুর সঙ্গে গেল ? পনেরো বছর বয়েসটা যেমন সুন্দর, তেমনই সাঙ্ঘাতিক যে! ঐ বয়েসের অনেক মেয়েই হয় সরলতার মূর্তি, পৃথিবীর দিকে সুন্দর চোখ মেলে দেখে। আবার এই বয়েসেই অনেকের শরীর জেগে ওঠে আঁচ, চিন্তাগুলি হঠাৎ হঠাৎ যুক্তিহীন হয়ে যায়। ভুল করারও নেশা জাগে। লিপিকা মিত্র কি ভুল করলো।

ওর মা, দিদি আর কাকাবাবু ব্যাকুলভাবে প্রতীক্ষা করছে। বাবা নেই কেন ? ওর মা কি বিধবা ? এমনও হতে পারে, ওর বাবাকে যেতে হয়েছে কলকাতার বাইরে, কিংবা অফিসে ছুটি নেই, কিংবা তিনি অন্য কোনো পুজো প্যাণ্ডেলের পাণ্ডা, বাড়ির লোকদের নিয়ে বেড়াবার সময় নেই।

পরবর্তী ঘোষণাটি আরও মর্মান্তিক। লিপিকা মিত্র···কেউ যদি লিপিকা মিত্রকে দেখে থাকেন, এক্ষুনি খবর দিন, তার মা অজ্ঞান হয়ে গেছে, লিপিকা মিত্র, বয়েস পনেরো, তার মা অজ্ঞান হয়ে গেছে, সোনারপুর থেকে লিপিকা মিত্র···

রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। ঘোষণাটি শুনছি আমি সাড়ে ন'টা থেকে। এই দু'ঘণ্টা লিপিকা মিত্রের মা পুজো কমিটির অফিস ঘরে অপেক্ষা করতে করতে আর থাকতে পারেন নি। অজ্ঞান হয়ে গেছেন। সোনারপুরের লাস্ট ট্রেন চলে গেছে না এতক্ষণ ? ওঁরা কি করে ফিরবেন ? পুজো প্যাণ্ডেলে যতই ভিড় হোক, এই দু'ঘণ্টার

খোঁজাখুঁজিতে নিশ্চয়ই একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া যায়। মেয়েটি বোধ হয় খারাপ ধরনের নয়, কারণ বোঝাই যাচ্ছে, মেয়ের ওপর মায়ের খুব বিশ্বাস আছে, তিনি ঐ দু'ঘণ্টা ধরে একই জায়গায় বসে আছেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা, মেয়ে অন্য কোথাও যাবে না। এই মেয়েটি পাড়ার গদাইদার সঙ্গে নিভৃত আলাপ করার জন্য কোথাও চলে যাবে? আর, দু'ঘণ্টা ধরে কী এমন নিভৃত আলাপ থাকতে পারে? ওর বাড়ির লোকজন কেউ একজন সোনারপুরে গিয়ে খোঁজ করে আসছে না কেন? হয়তো সে নিজেই এতক্ষণে সেখানে ফিরে গেছে। পনেরো বছরের মেয়ের পক্ষে ট্রেনের টিকিট কেটে সোনারপুর যাওয়া এমন কিছু শক্ত নয়! এই তো কাছেই!

লিপিকা মিত্রের মায়ের অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার কথাটা দু'তিনবার ঘোষণা করায় মনে হলো, ব্যাপারটা বেশ গুরুতর। ছেলে বা মেয়ে নিরুদ্দেশ হলেই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে মা শয্যাশায়ী কিংবা পিতা মরণাপন্ন হয়, কিন্তু বাস্তবে অনেক সময় দেখা যায়, মা বাড়িতে খানিকটা কান্নাকাটি করলেও বাবা লাঠি হাতে বসে থাকেন ছেলে বা মেয়ের ফেরার প্রতীক্ষায়। কিন্তু এখানে বোধ হয় ব্যাপারটা তা নয়, লিপিকা মিত্রের মা নিশ্চয়ই অজ্ঞান হয়ে গেছে। পুজো কমিটির ঝানু মেম্বারদের হাত করা খুব কঠিন কাজ। হিন্দী গান বন্ধ রেখে তাঁদের মূল্যবান সময় নষ্ট করে যখন বার বার এই ঘোষণা চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন ব্যাপারটা সহজ নয়।

এর পর আর একটি অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটলো। অন্য দুটি পুজো প্যাণ্ডেলে তাঁদের নিজস্ব রুচির গান একযোগেই চলছিল। হঠাৎ সব থেমে গেল। এবং তিন জায়গা থেকেই তিন রকম কণ্ঠস্বরে ও তিন রকম আবেগে ঘোষণা হলো, লিপিকা মিত্র নামে একটি মেয়েকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার মা অজ্ঞান হয়ে গেছে, যদি কেউ সন্ধান দিতে পারেন···তার বাড়ি থেকেও খবর এসেছে সেখানে সে ফেরে নি, যদি কেউ সন্ধান দিতে পারেন···পাঁচকোনা পার্ক প্যাণ্ডেলে··লিপিকা মিত্র, বয়েস পনেরো—

আমি শিহরিত হয়ে গেলাম। এই প্রথম বোধ হয় এ পাড়ার এই তিনটি পুজো প্যাণ্ডেল কোনো ব্যাপারে একমত হলো। এর আগে কখনো এ জিনিস দেখি নি।

আমার ইচ্ছে হলো পাঁচকোনা পার্ক প্যাণ্ডেলে গিয়ে লিপিকা মিত্রের মাকে একটু দেখে আসি। ওখানে নিশ্চয়ই একটা কিছু সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ঘটছে, আর আমি একা ঘরে বসে থাকবো? ঘর থেকে বেরিয়ে চটি পায় দিয়েও ফিরে এলাম। শরীর খুবই দুর্বল, ভিড়ের মধ্যে আমি নিজেই মাথা ঘুরে পড়ে যেতে পারি। তা ছাড়া, কোনো শোকার্ত মানুষের মুখ দেখতে আমার ভয় করে। সাধ করে আর কেন মনের মধ্যে আর একটা দুঃখিত মুখের ছবি জমিয়ে রাখা!

আবার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কান খাড়া করে রইলাম। তিনটি মাইকেই এখন আবার তার-স্বরে গান বাজছে, তবু পরবর্তী ঘোষণার জন্য আমার উৎকণ্ঠা রয়ে গেল। বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ব্যথা করে। খাটে এসে শুয়ে পড়লাম, কিন্তু জেগে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। আশ্চর্য আর কেউ লিপিকা মিত্র সম্পর্কে কোনো কথাই বললো না!

লিপিকা মিত্রকে কি পাওয়া গেছে? সে কথাটাও তো জানানো উচিত ছিল! আমার মতন আরও অনেকেই নিশ্চয়ই উৎকণ্ঠায় আছে। হারানোর বার্তা জানাবার পর কি প্রাপ্তি সংবাদও জানানো যায় না? কিংবা, তাকে হয়তো এখনো পাওয়া যায় নি। সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে! লিপিকা মিত্রের অজ্ঞান মাকে বোধ হয় পাঠিয়ে দিয়েছে হাসপাতালে, তাতেই দায় মিটে গেছে সকলের। এখন আবার বিভিন্ন গানের চিৎকার প্রতিযোগিতা চলছে। প্যাণ্ডেলে এখন ঠাকুর দেখতে এসেছে নতুন মানুষ, তারা আগের কিছুই জানে না।

সারা রাত আমার ছটফট করে কাটলো। মাঝে মাঝেই ঘুম ভেঙে যায়। আবছাভাবে দেখতে পাই, গোলাপী শাড়ি পরা পনেরো

বছর বয়েসের একটি সরলমুখী মেয়ে কোন্ এক অনন্তের রাস্তা ধরে হাঁটছে, তার চোখে জল। হয়তো আজই সে পরেছে তার জীবনের প্রথম শাড়ি, বার বার খুলে যাচ্ছে আঁচল, সে বিস্রস্ত, বিভ্রান্ত, একা, সে কোথায় যাবে তা জানে না ধু-ধু করা রাস্তা, সামনে গাঢ় অন্ধকার।

আমার বুক কাঁপে, আমার কান্না এসে যায়!

রোজই রাত্তিরবেলা খুটখাট শব্দ শুনতে পাই। আমার ঘুম খুব পাতলা, একটু-আধটু শব্দেই ঘুম ভেঙে যায়, খানিকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে থাকি। আর কিছু শোনা যায় না, আমার চোখের পাতা বুজলেই আর একবার শব্দ।

আমার ধারণা, রাত্রিবেলার একটা আলাদা জগৎ আছে। সে জগতের সবটুকু আমরা চিনি না। জীবনে বহুবার চেষ্টা করেও আমি ভূত দেখতে পাই নি, সুতরাং ভূত সম্পর্কে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। তবু কিছু রহস্যময় ব্যাপার ঘটেই যায়। একদিন মাঝরাত্রে খুব বৃষ্টি, আমি বৃষ্টি দেখার জন্য বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। সামনের রাস্তায় কোনো লোকজন নেই, গাড়ি নেই, রাত প্রায় দুটো, শুধু অবিরাম বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে, কালো রঙের বৃষ্টি, আমার মনে হয় আকাশের সঙ্গে বুঝি এই পথটার একটা চুক্তি ছিল এই সময় বৃষ্টি হবার। তারপর আরও একটা অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ে। সেই শুনশান রাত্তিরে, সেই বৃষ্টির মধ্যে, একজন লোক রাস্তাটার ঠিক মাঝখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। লোকটির গতিতে কোনো ব্যস্ততা নেই, বৃষ্টির জন্য ভ্রূক্ষেপ নেই, খুব প্রশান্ত তার ভঙ্গি। এই বৃষ্টির মধ্যে একটি লোক কেন ওরকমভাবে মধ্যরাত্রে হেঁটে যায়? লোকটিকে পাগল মনে হয় না। সে এমনভাবে হাঁটে যেন সমস্ত রাস্তাটাই তার। আমি মনে মনে লোকটির নাম দিয়েছিলাম পথের রাজা। এরপর

আবার কখনো বৃষ্টি হলেই আমি তাড়াতাড়ি বারান্দায় দেখতে আসি। এ পর্যন্ত আর দেখিনি বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঠিক আবার কোনোদিন ঐ লোকটিকে আমি দেখতে পাবো অবিকল ওই রকমভাবে হাঁটতে।

কিন্তু মাঝরাত্রে আমার ঘরে খুটখাট আওয়াজ হবে কেন? এটা তো কোনো অলৌকিক ব্যাপার হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোনো ইঁদুর। অনেকদিন আগে আমি একবার আমার মাথার কাছে জানলায় ঠকঠক আওয়াজ শুনেছিলাম গভীর রাত্রে! ঠিক যেন কেউ আমায় ডাকছে। প্রথমটায় বেশ চমকে উঠেছিলাম। তিনতলায় বাইরের দিকে জানলায় কে টোকা দেবে? কোনো চোর যাচাই করে দেখছে আমি ঘুমিয়ে আছি কিনা? কিন্তু দেয়াল বেয়ে উঠবে কি করে? বিছানা ছেড়ে নেমে দেখেছিলাম, বাইরে কেউ নেই। অথচ টকটক শব্দ শুনেছিলাম ঠিকই। ব্যাপারটা সেই অবস্থায় ছেড়ে দিলে একটা রহস্যই থেকে যেত। কিন্তু আমি কিছুক্ষণ জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম। আবার শব্দ। এবার বোঝা গেল। একটা টিকটিকি, তার মুখে একটা জ্যান্ত আরশোলা। সেই আরশোলাটিকে মেরে ফেলার জন্য সে বারবার জানলার গায়ে ঝাপটা মারছে।

আজও খুটখাট শব্দ হবার পর বিছানা থেকে নামলাম। শীতের রাত্তিরে বিছানা ছেড়ে ওঠা কি সোজা কথা! কিন্তু শব্দ হতে থাকলে ঘুমও আসবে না। অন্ধকারে হাঁটতে একটু ভয় ভয় করে। হঠাৎ ইঁদুরটার গায়ে পা পড়লেই সাংঘাতিক কাণ্ড হবে। ইঁদুরে কামড়ালে নাকি প্লেগ হয়। তা প্লেগ হোক না হোক, ইঁদুরে কামড়ানো আমি মোটেই পছন্দ করবো না। কোনোরকমে গিয়ে আলো জ্বাললাম। কিন্তু আলোর মধ্যে কে কবে ইঁদুর দেখতে পায়? তবু এখানে ওখানে উঁকি দিয়ে দেখলাম। হুস-হাস শব্দ করলাম কয়েকবার। ইঁদুরটা যেখানেই থাক, তাকে অন্তত বোঝানো গেল যে আমি জেগে উঠেছি, সে যেন আমাকে বিরক্ত না করে। আবার আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

দু' মিনিট বাদে দরজার বাইরে জুতোর র‍্যাকে ঘটাঘট শব্দ হলো। এই রে, পরশুদিনই নতুন চটি কিনেছি। ইঁদুরে যদি সেটা কেটে দিয়ে যায়? এবার দৌড়ে গিয়ে আলো জ্বেলে দরজা খুললাম। হ্যাঁ, জুতোগুলো একটু এলোমেলো হয়ে আছে, মুষিকপ্রবর নিশ্চয়ই এখানে এসেছিল। অন্তত নতুন চটি জোড়া এখান থেকে সরিয়ে ফেলা দরকার। কোথায় রাখবো? ঘরের মধ্যে এনে দরজা বন্ধ করে রাখা যায়। কিন্তু আমার ঘরের মধ্যেও খুটখাট শব্দ পাওয়া গেছে। ইঁদুরটা আমার ঘরের মধ্যে ঢোকে কি করে? মনে পড়লো ঘরের মধ্যে একটা নর্দমার মধ্য দিয়ে উঠে আসে। নর্দমার মুখটা ঢেকে রাখা দরকার।

সে জায়গাটায় ঢাকা দেবার মতন উপযুক্ত কোনো জিনিস হাতের কাছে নেই। প্রথমেই মনে পড়লো একটা ইঁটের কথা। কিন্তু এত রাত্রে ইঁট পাবো কোথায়? বই দিয়ে চাপা দেওয়া যায়। নর্দমার মুখে বই রাখবো? সেরকম বাজে বই আমার শয়নকক্ষে থাকে না। আর আছে রেডিওটা। হঠাৎ খুব রাগ হয়ে গেল। ইঁদুরটা খুব জ্বালাচ্ছে। একটা কিছু পাকাপাকি ব্যবস্থা করা দরকার।

ড্রয়ার থেকে টর্চটা বার করে সমস্ত ফ্ল্যাটটা খুঁজে দেখলাম। কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। আলো নিবিয়ে টর্চ হাতে করে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। শীতে দাঁত ঠকঠক করছে। পাতলা জামা পরে বিছানা থেকে নেমে এসেছি।

একটু পরে রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দে একটা কৌটো পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকে টর্চের আলো। এবার মহারাজের সাক্ষাৎ পেলাম। ছোটখাটো ইঁদুর নয়। প্রায় একটা শুয়োরের বাচ্চার সাইজ। ধূসর রঙ, ধূর্তের মতন চোখ। টর্চের আলো পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ইঁদুরটা পালালো না। মুখ ঘুরিয়ে আমাকে ভালো করে দেখে নিল, চোখাচোখি হলো দুজনের। সেই মুহূর্তে ও আমাকে বেশী ভয় পাচ্ছিল, না আমি ওকে বেশী ভয় পাচ্ছিলাম, তা বলা শক্ত। পরের মুহূর্তে ডানদিকে একটা লাফ দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেল।

এটা বাড়ির ইঁদুর নয়, রাস্তার ইঁদুর। বাড়িতে এত বড় ইঁদুর থাকে না। রাস্তার নোংরা থেকে একটা এত বড় ধেড়ে ইঁদুর তিনতলা বাড়ির ওপর উঠে এসেছে দেখে প্রথমে আমার বিস্ময়, তারপর ঘেন্নায় গা শিরশির করে। এটাকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার। মাঝরাত্রে এ পাড়া বেড়াতে বেরোয়, সুতরাং শুধু আজকের মতন তাড়ানোই যথেষ্ট নয়, ওকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে এ বাড়িতে ওর প্রবেশ নিষেধ। কিংবা ওকে মেরে ফেললেই বা কী ক্ষতি? ও আমার কথা শুনবে না, মাঝে মাঝেই মাঝরাত্তিরে এসে আমার ঘুম ভাঙাবে।

যে দিকটায় বাইরের নর্দমা, সেদিকে টর্চের আলো ফেলে রেখে আমি এক-পা এক-পা করে পিছিয়ে গেলাম। তারপর আলনা থেকে একটা গরম জামা টেনে এনে পরে নিলাম তাড়াতাড়ি। এবার দরকার একটা লাঠি যোগাড় করা। লাঠিই বা কোথায় পাই? বাড়িতে কোনোরকম অস্ত্রশস্ত্র রাখার অভ্যেসই করিনি। লাঠি ধরনের একমাত্র জিনিস আছে ঝুল-ঝাড়া। সেটা মোটামুটি শক্ত, কাজ চালানো যাবে। একটু বেশী লম্বা, তা হোক, যত দূর থেকে ইঁদুর নিধন করা যায় ততই ভালো।

ঝুল-ঝাড়াটা আছে বাইরের বারান্দায়: সেটা আনতে গেলে এই ফাঁকে যদি ইঁদুরটা পালিয়ে যায়। কিন্তু ঝুঁকি নিতেই হবে। টর্চটা জ্বেলে মাটিতে শুইয়ে রেখে আমি ছুটে বারান্দা থেকে ঝুল-ঝাড়াটা আনতে গেলাম, তার ফলে অন্ধকারের মধ্যে আলমারির গায়ে প্রচণ্ড এক গুঁতো খেলাম। ব্যথায় মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। সমস্ত রাগটা পড়লো ইঁদুরটার ওপর। জিঘাংসা বৃত্তি জেগে উঠলো আমার মধ্যে। ইঁদুরটাকে আজ খুন করবোই!

ঝুল-ঝাড়াটা নিয়ে এসে জুতোর র‍্যাকের কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাঝে মাঝে খুটখাট শব্দ হচ্ছে, অর্থাৎ ইঁদুর মহারাজ এখনো সরে পড়েন নি। কিন্তু আওয়াজ শুনে সেদিকে টর্চ ফেলি, কিছুই দেখতে পাই না। ইঁদুররা কি মাঝে মাঝে অদৃশ্য হতে পারে?

দিনেরবেলা পারে না নিশ্চয়ই, কিন্তু রাত্তিরবেলা সবই সম্ভব। বলেছি না, রাত্তিরের জগৎটাই আলাদা।

তখন আমার মনে হলো মাঝে মাঝে টর্চ জ্বালানোই আমার অনুচিত হচ্ছে। আমার অবস্থান আমি শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছি। এটা আমার ভুল স্ট্র্যাটেজি। টর্চটা নিবিয়ে আমি একটু সরে গিয়ে দাঁড়ালাম। এক হাতে ঝুল-ঝাড়াটা উঁচু করে ধরা। ইঁদুরটাকে নর্দমায় দিক দিয়ে পালাতে হলে জুতোর র‍্যাকের পাশ দিয়ে যেতেই হবে। ওখানে কয়েকটা ছড়িয়ে রেখেছি, শব্দ হতে বাধ্য।

বেশ কিছুক্ষণ ধরে খুটখাট শব্দ থেমে রইল। ইঁদুরটা কি দূর থেকে আমাকে লক্ষ্য করছে? ইঁদুর নিশ্চয়ই অন্ধকারে দেখতে পায়। আমি ওকে দেখছি না, ও আমাকে সরু চোখে দেখে যাচ্ছে—ব্যাপারটা অস্বস্তিকর। শীতটা ক্রমশ জাঁকিয়ে আসছে, এ সময় একটা সিগারেট ধরালে বেশ হতো। কিন্তু সিগারেট জ্বাললেই ব্যাটা সাবধান হয়ে যাবে। আরও কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। একটু পরে হঠাৎ আমার হাসি পেয়ে গেল। একলা একলা হাসা একটা বোকা কিংবা পাগলের মতন ব্যাপার—কিন্তু আমি ঐ দুটোই? শীতের রাতে আমি ঘরের বাইরে একটা ঝুল-ঝাড়া হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই দৃশ্যের মজা আমি নিজেই উপভোগ করলুম।

আমার মনে হলো, আমি প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে গেছি, এটা আমার বাড়ি নয়, একটা গুহা। ঠিক সেকালের মতনই আমি গুহার বাইরে পাথরের মুগুর হাতে আমার শত্রুর সঙ্গে লড়বার জন্য দাঁড়িয়ে আছি! হাজার হাজার বছরেও এই লড়াইয়ের ধরনটা একটুও বদলায় নি। বন্দুক, বোমা, কামান এমন কি অ্যাটম বোম দিয়েও এই ইঁদুরটাকে মারা সম্ভব নয়। একে মারতে হবে পিটিয়ে কিংবা বিষ খাইয়ে। তাও দিনের পর দিনের চেষ্টায়। একে মারলে আবার একটা আসবে। নর্দমার ঝাঁঝরি বন্ধ করলেও আবার অন্য কোনো রাস্তা খুঁজে নেবে। ভারতবর্ষের জনসংখ্যার কত গুণ বেশী যেন ইঁদুরের সংখ্যা? লক্ষ লক্ষ টন ফসল ইঁদুরেই খেয়ে নষ্ট করে গুদামে।

এত বড় দেশের কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই ইঁদুর পুজো হয়। অন্ধকারের মধ্যে শপাৎ শপাৎ করে কয়েকবার ঝুল-ঝাড়াটাকে পেটালাম মাটিতে। ছোটছেলেরা যেমনভাবে খেলা করে। এসব ব্যাপারকে খেলা হিসেবে নেওয়াই ভালো।

আমার ছোটমাসীর প্রাণের বন্ধু ছিলেন ঝর্নাদি। আমরা তাঁকে ঝর্নামাসী না বলে ঝর্নাদিই বলতাম, কারণ তাঁর দাদা রতনদা ছিলেন পাড়ার সকলের দাদা। দাদার বোনকে তো আর মাসী বলা যায় না। অবশ্য সব জায়গায় এরকম সম্পর্ক আমরা মেনে চলতে পারিনি, আমার বন্ধু বিষ্ণুর কাকাকে আমরা সবাই কাকা বলে ডাকতাম, কিন্তু তিনি যখন বিয়ে করলেন, তাঁর স্ত্রীকে আমরা কাকীমা না ডেকে বউদি বলতে লাগলাম প্রথম থেকেই। কারণ কাকার স্ত্রী জয়শ্রীর এমন ছোটখাটো ফুরফুরে চেহারা যে তাকে ঠিক কাকীমা হিসেবে মানায় না।

ছোটমাসী আর ঝর্নাদি একসঙ্গে স্কুলে যেতেন। প্রায় একরকম চেহারার বেণী-ঝোলানো দুই কিশোরী। ওঁদের পড়াশুনো, বিকেল-বেলায় ছাদে আড্ডা কিংবা সিনেমা দেখা, সব একসঙ্গে। একবার ঝর্নাদির টাইফয়েড হলো বলে আমার ছোটমাসী অশোককুমার-কাননবালার 'চন্দ্রশেখর' সিনেমাটা দেখলোই না। আমরা বাড়িসুদ্ধ সবাই গেলাম। ঝর্নাদি দেখতে পারবে না বলে ছোটমাসী কিছুতেই দেখবে না। স্কুল থেকে কলেজে গিয়েও ওঁদের বন্ধুত্ব সেরকমই থেকে গেল। ওঁদের আরও বন্ধু হলো বটে কিন্তু দু'জনের যে নিবিড় সম্পর্ক তা একটুও আলগা হলো না। আমরা পুজোর ছুটিতে বেড়াতে গেলাম দার্জিলিং, আর ছোটমাসী গেল ঝর্নাদিদের সঙ্গে দেওঘরে। কে না জানে, দেওঘরের চেয়ে দার্জিলিং অনেক

ভালো জায়গা, তা ছাড়া দেওঘর আমাদের আগেই দেখা।

বি-এ পাস করার পর ছোটমাসী আর ঝর্নাদি দু'জনেই এম-এ ক্লাসে ভর্তি হবার উদ্যোগ করছেন, এই সময় ঝর্নাদির বউদির মাসতুতো দ্যাওর ঝর্নাদিকে বিয়ে করার প্রস্তাব জানালো। সেই প্রস্তাব শুনে ঝর্নাদি কেঁদে আকুল। কিন্তু ছেলেটি বড্ডই ভালো, চেহারা সুন্দর, পড়াশুনোয় ব্রিলিয়ান্ট, সদ্য দারুণ চাকরি পেয়েছে—একে প্রত্যাখ্যান করার কোনো যুক্তিই তো নেই। মেয়েদের তো এক সময় না এক সময় বিয়ে হয়ই। যদি বহু বিবাহের যুগ থাকতো, তা হলে ঝর্নাদি বোধ হয় তাঁর বরকে অনুরোধ করতেন ছোটমাসীকেও বিয়ে করে ফেলার জন্য। প্রাণের বন্ধুকে সতীন করে নিয়ে দু'জনে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকতেন।

একমাসের মধ্যে ঝর্নাদির বিয়ে হয়ে গেল এবং জানা গেল, ঝর্নাদিকে তাঁর বরের সঙ্গে মীরাটে গিয়ে থাকতে হবে। যাওয়ার দিন ঝর্নাদির কি কান্না! আমার ছোটমাসীকে জড়িয়ে ধরে হেঁচকি তুলে তুলে বলতে লাগলেন, আমি কী করে পারবো? আমি পারবো না অতদূরে থাকতে! কিছুতেই পারবো না! আমাদের ভয় হলো, ঝর্নাদি বুঝি অজ্ঞানই হয়ে যাবে!

প্রথম বছরেই দু'বার কলকাতায় বেড়াতে এসেছিলেন ঝর্নাদি। দ্বিতীয় বছরে একবার। তৃতীয় বছরে একবারও না। পঞ্চম বছরে আর একবার এলেন, সেবারই তাঁর একটি পুত্রসন্তান জন্মালো।

এদিকে এম-এ পড়তে পড়তেই প্রেমে পড়লেন ছোটমাসী। না, কোনো সহপাঠীর সঙ্গে নয়, এক সহপাঠিনীর দাদার সঙ্গে। জাতের কিছু গরমিল ছিল, তাই নিয়ে বাড়িতে সামান্য কিছু মন কষাকষি হলো, শেষ পর্যন্ত মেনেও নিল সবাই। এম, এ পরীক্ষার রেজাল্ট বেরুবার আগেই ছোটমাসীর বিয়ে হয়ে গেল তরুণদার সঙ্গে। এবারেও আমরা একটা সম্পর্কের গোলমাল করে ফেললাম। তরুণদা দারুণ স্পোর্টসম্যান, সব খেলাই ভালো খেলেন, তার মধ্যে ক্রিকেটে বেশ নাম আছে। একবার রঞ্জি ট্রফিতে বেঙ্গলের উইকেট-

কীপার হয়েছিলেন পর্যন্ত। একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে কি মেসোমশাই বলে ডাকা যায়? বিশেষত যার নাম তরুণ? ছোটমাসীর বর হয়েও উনি আমাদের কাছে তরুণদাই রয়ে গেলেন। বিয়ের পর ছোটমাসী চলে গেলেন নিউ আলীপুরে তরুণদার ফ্ল্যাটে, তিন বছর পর তাঁর একটি মেয়ে হলো। মাঝে মাঝে আমি যাই ছোটমাসীর কাছে, বিশেষত টাকা ধার করার জন্য। ছোটমাসী খুব ভালো পার্টি, কক্ষনো ফেরত চান না।

একদিন শুনলাম, ঝর্নাদির বর ট্রান্সফার হয়ে চলে এসেছেন কলকাতায়। এবং অফিস থেকে ফ্ল্যাট পেয়েছেন নিউ আলীপুরেই। ছোটমাসীর বাড়ির খুব কাছেই। এটা একটা সাংঘাতিক যোগাযোগ। দশ বছর বাদে দুই সখীর আবার পুনর্মিলন।

বিয়ের পর মেয়েদের আগেকার বন্ধুত্ব সবসময় টেকে না। অনেকখানি নির্ভর করে তাদের বরেদের সামাজিক মর্যাদার ওপর। একজনের বর গরীব আর একজনের বর অবস্থাপন্ন হলে কি আর আগেকার সেই বন্ধুত্ব সমান থাকে; বড়লোক বান্ধবীর বাড়িতে গিয়ে জল খেতে চাইলে সে যদি ফ্রিজ থেকে জলের বোতল বার করে দেয়, অমনি মনে হয়, ইস্ খুব চাল মারছে। আর যে গরীব, সে দেখাবে সততার অহংকার। কথায় কথায় শুনিয়ে দেবে, ওর আফিসে তো দারুণ ঘুষের ব্যাপার, কিন্তু ও কিছুতেই নেবে না, মানুষটা এমন জেদী···। আসলে হয়তো ঘুষ পাবার কোনো সুযোগই নেই! যাই হোক, পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে বন্ধুত্ব।

কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কোনো প্রশ্নই ওঠে না। ছোটমাসী আর ঝর্নাদি- দু'জনেরই স্বামী বেশ সুপুরুষ, সৎ, সমান অবস্থাপন্ন, বাড়িও একই পাড়ায়। এবং প্রত্যেকেরই একটি করে সন্তান।

ঝর্নাদিকে পেয়ে ছোটমাসী একেবারে উচ্ছ্বসিত। যেন আবার ফিরে গেছেন সেই কৈশোর বয়েসে। দু'জনের যেন একটাই বাড়ি হয়ে গেল। ও-বাড়ি থেকে রান্না আসছে এ-বাড়িতে, কিংবা

ছোটমাসী স্পেশাল কিছু রান্না করে নিয়ে চলে যাচ্ছেন ও-বাড়িতে, ঝর্নাদির সঙ্গেই বসে খাবেন। ওঁদের দু'জনের দুই স্বামীর মধ্যেও বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল—প্রায়ই সন্ধেবেলা একসঙ্গে আড্ডা দেন।

এই যে দুটি পরিবার, পরস্পরের মধ্যে এত বন্ধুত্ব, বাইরে থেকে দেখে মনে হয় এঁরা কত সুখী। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমি বুঝতে পারলুম, এঁদের সুখের জীবনে একটা সূক্ষ্ম ফাটল ধরেছে। তার জন্য দায়ী এক খলনায়ক আর এক খলনায়িকা। প্রকৃতপক্ষে তারা দু'জন হচ্ছে আসলে দুটি সরল নিষ্পাপ শিশু। ঝর্নাদির ছেলে আর ছোটমাসীর মেয়ে।

একদিন বিকেলে ঝর্নামাসীর বাড়িতে গিয়ে দেখলাম দুটি সমবয়সী বালক-বালিকা বসবার ঘরে ছুটোপুটি করছে। ছোটমাসীর মেয়ে পাপিয়াকে তো আমি একটি খাঁটি দস্যি বলেই জানি। ঝর্নাদির ছেলেটিকে দেখে বেশ শান্তশিষ্টই মনে হয়. যদিও সেই মুহূর্তে সে একটি টাইম ম্যাগাজিনের পাতা ছিঁড়ছিল খুব মনযোগ দিয়ে।

ভেবেছিলাম ঝর্নাদির সঙ্গে দেখা হবে কিন্তু ঝর্নাদি নেই সেখানে। ছোটমাসী বললেন, ঝর্নারা জমি দেখতে গেছে যাদবপুরের দিকে, তাই ওর ছেলেকে রেখে গেছে এ-বাড়িতে।

আমি বললাম, বাঃ, তোমাদের তো বেশ সুবিধেই হয়েছে। তুমিও কোথাও গেলে পাপিয়াকে ওদের বাড়িতে রেখে যেতে পারো।

ছোটমাসী গম্ভীর হয়ে গেলেন, কোনো কথা বললেন না।

আমরা গিয়ে খাবার টেবিলে বসলাম। ছোটমাসীর একটাই মাত্র দোষ, বাড়িতে গেলেই জোর করে কাস্টার্ডের পুডিং খাওয়াতে চান। কিন্তু ওগুলো যে কি বিচ্ছিরি খেতে হয়।

চায়ের কাপে সদ্য চুমুক দিয়েছি এমন সময় বাইরের ঘরে বেশ জোরে ঝনঝন করে শব্দ হলো।

ছোটমাসী বললেন, এই রে, আবার বুঝি কিছু ভাঙলো।

দু'জনেই উঠে গেলাম।

একটা সুন্দর পোর্সিলিনের বুদ্ধমূর্তি মেঝেতে চুরমার হয়ে পড়ে আছে।

আমরা যাওয়া মাত্রই পাপিয়া বললো, আমি ভাঙিনি! আমি ভাঙিনি! ঐ বাবলু ভেঙেছে।

বাবলুর মুখে কোনো অপরাধবোধ নেই। সে ভাঙা টুকরোগুলো জোড়া লাগাবার চেষ্টা করছে। একবার মুখ তুলে বললো, আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া যায়।

ছোটমাসীর মুখখানা থমথমে। টুকিটাকি পুতুল-টুতুল দিয়ে ঘর সাজাতে খুব ভালোবাসেন। ঐ জিনিসগুলো তাঁর খুব প্রিয়। কিন্তু রেগে গেলেও পরের বাচ্চাকে তো আর বকতে পারবেন না। তাই বললেন, বাবলু, থাক ওতে আর হাত দিও না, হাত কেটে যাবে।

মূর্তিটা ছিল একটা বেশ উঁচু বইয়ের র‍্যাকের ওপরে। অত উঁচুতে বাবলুর হাত যাওয়ার কথা নয়। তবু হাত গেল কি করে? পাপিয়া জানিয়ে দিল বাবলু বুক শেলফ বেয়ে বেয়ে উঠেছিল। সর্বনাশের ব্যাপার, পুরো বুক শেলফটাই উল্টে পড়ে যেতে পারতো!

ভাঙা টুকরোগুলো সরিয়ে ফেলে আমরা আবার চলে এলাম খাওয়ার টেবিলে। ছোটমাসী বললেন, ঝর্না এমনিতে এত বুদ্ধিমতী, কিন্তু ছেলের ব্যাপারে একেবারে অন্ধ। ছেলেকে কক্ষনো বকে না। এত জিনিসপত্র ভাঙে।

আমি বললাম, ঝর্নাদি বুঝি ডঃ স্পকের বই পড়েন নি? তোমার তো বইটা আছে, দিয়ে দাও না।

আমরা দেখেছি, পাপিয়া জন্মাবার পরই ছোটমাসী সব সময় ঐ বইখানা সঙ্গে রাখতেন। বাচ্চার তিন মাস, চার মাস, পাঁচ মাস বয়েসে মাকে কী কী করতে হবে, সবই নাকি বইতে লেখা আছে। পাপিয়া দোলনা থেকে মাটিতে পড়ে গেল, ছোটমাসী দৌড়ে গিয়ে বই খুলে দেখলেন, এগারো মাসের বাচ্চা মাটিতে পড়ে গেলে কী হয়! ছোটমাসী বই পড়ে বাচ্চা মানুষ করেন বলে আমরা এক

সময় হাসাহাসি করতাম। আমরা বলতাম, আমাদের মা কিংবা দিদিমারা তো ঐ বই পড়েন নি, তবু আমরা ঠিকঠাক মানুষ হলাম কি করে?

এ কথা ঠিক, পাপিয়া জিনিসপত্র ভাঙে না। ছোটমাসী তাকে এক বছর বয়েস থেকেই শিখিয়েছেন, কোন্‌টা কোন্‌টা পাপিয়ার নিজস্ব জিনিস। আর কোন্‌টা বড়দের জিনিস। পাপিয়ার খেলনা বা বেলুন বা প্লাস্টিকের ছবির বই তার নিজের, সেগুলো সে ভাঙতে বা ছিঁড়তে পারে, কিন্তু মায়ের সেন্টের শিশি কিংবা বাবার হাত-ঘড়িতে সে হাত দেবে না। এই শিক্ষায় কাজ হয়েছিল। কিন্তু পাপিয়ার অন্য দোষ আছে। ডক্টর স্পকের শিক্ষাতেও একেবারে আদর্শ শিশু গড়ে তোলা যায় না। ছোটমাসী ঝর্নাদিকে ছেলের ব্যাপারে অন্ধ-বললেন, সেই হিসেবে ছোটমাসীও অন্ধ। আজকাল অধিকাংশ মায়েদেরই একটা করে বাচ্চা। সুতরাং সমস্ত মাতৃস্নেহ ঐ একটি শিশুর ওপর বর্ষিত হয়—অতখানি স্নেহ সহ্য করা সব শিশুর পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রত্যেক মা-ই ভাবে, তার সন্তানটির কিছু দোষ নেই।

ছোটমাসী বললেন, বাবলুর পাঁচ বছর বয়েস হয়ে গেছে, এখন আর ঝর্নার ডক্টর স্পকের বই পড়ে কী লাভ হবে? একদম গোড়া থেকে সাবধান না হলে···অথচ বাবলু এমনিতে এত ভালো ছেলে···

একটু বাদেই ঝর্নাদি এসে উপস্থিত হলেন। দরজা খোলা মাত্র পাপিয়া বলে উঠলো, ঝর্নামাসী, ঝর্নামাসী, আজ না বাবলু বুদ্ধমূর্তিটা ভেঙে ফেলেছে। একদম ভেঙে ফেলেছে!

ছোটমাসী নিজের মেয়েকে একটু বকুনি দিয়ে বললেন, ছিঃ পাপিয়া, ওরকম নালিশ করতে নেই।

ঝর্নাদি হেসে বললেন, আবার বুঝি বাবলু কিছু ভেঙেছে! ওকে নিয়ে এমন লজ্জায় পড়তে হয়! সেইজন্য আমি যে বাড়িতেই যাই, তাদেরই বলি, দামী দামী জিনিসপত্র সরিয়ে রাখতে। কখন যে কোনটা ভেঙে ফেলবে!

ছোটমাসী আমার দিকে আড়চোখে তাকালেন। অর্থাৎ আমাকে বুঝিয়ে দিলেন, ঝর্নাদি সম্পূর্ণ ভুল শিক্ষা দিচ্ছেন ছেলেকে। জিনিসপত্র সরিয়ে রাখাটা মোটেই ঠিক কাজ নয়। বরং বাচ্চাদের শেখাতে হবে যে, সব জিনিস ভাঙা চলে না। বাড়িতে কোনো বাচ্চা ঢুকলেই কি লোকে ঘড়ি-পেন-সেন্টের শিশি-কাপ-ডিস-গেলাস সব লুকিয়ে ফেলতে পারে?

একটু বাদে বাবলু এসে বললো, মা ছাখো, পাপিয়া আমার পায়ে আঁচড়ে দিচ্ছে।

ঝর্নাদি বললেন, খেলতে গেলে ওরকম হয়। নালিশ করতে নেই। বাবলুর ডানপায়ে স্পষ্ট নখের দাগ। ছোটমাসী তখন এমন গল্পে মত্ত যে সেটা দেখলেনই না। নিউ মার্কেটে কবে তিনি অপর্ণা সেনকে সামনাসামনি দেখেছিলেন সেই বৃত্তান্ত সবিস্তারে জানাচ্ছেন।

একটু বাদে আবার বাবলু ও পাপিয়ার মারামারির প্রবল শব্দ শোনা গেল। মেয়ে হলেও পাপিয়া বেশি গুণ্ডা ধরনের, সেই বেশি মারছে বাবলুকে।

ছোটমাসী হালকা গলায় বললেন, এই ওরকম মারামারি করে না।

বাবলু এসে আবার নালিশ করলো, ছাখো না মা, পাপিয়া আমার মাথায় স্কেল দিয়ে মেরেছে।

বাবলুর কপালের খানিকটা জায়গা ফুলে গেছে। ছেলের সেই অবস্থা দেখে ঝর্নাদির মুখমণ্ডলে একটা ব্যথার ছাপ ফুটে উঠলো। কিন্তু তিনি তো আর পাপিয়াকে বকতে পারেন না। নিজের ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, তুই এই ঘরে থাক।

ছোটমাসী পাপিয়াকে মৃদু, খুবই মৃদু ধমক দিয়ে বললেন, পাপিয়া, এরকম করে না! এমনি এমনি খেলতে পারো না? মারামারি করবে কেন?

ডক্টর স্পকের বইতে কী লিখিছে জানি না, আমার মনে হলো, এই সময় পাপিয়ার কান ধরে একটা চড় মারা উচিত ছিল। যাতে

সে লোহার স্কেল দিয়ে আর কারুকে মারতে সাহস না পায় ভবিষ্যতে। কিন্তু ছোটমাসী প্রায় কিছুই বললেন না। এর আগে একদিন বড় জ্যাঠামশাইয়ের বাড়িতে আর একটা বাচ্চা ছেলে পাপিয়াকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল বলে রাগে-দুঃখে ছোটমাসী বলেছিলেন, ও-বাড়িতে আর কক্ষনো যাবেন না। কিন্তু নিজের মেয়ের ব্যাপারে তিনি অন্ধ।

আবার একটু বাদে শোনা গেল, বাবলু একটা চামচ জানলা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে। একটা চামচ হারানোর চেয়েও সেটা রাস্তায় কোনো লোকের মাথায় যদি পড়ে তাহলে অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার হবে। আমরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলাম। ছোটমাসী চাকরকে নিচে পাঠালেন।

ঝর্নাদি এবারও কিন্তু ছেলেকে বকলেন না। হালকাভাবে বললেন, ছেলেটার জ্বালায় হাতের কাছে কিছু রাখবার উপায় নেই। আমার তো এই মাসে তিনটে চামচ হারিয়েছে।

এই সময় আমি প্রস্থান করলুম।

মাস তিনেক বাদে আমি আবার গিয়েছিলাম ছোটমাসীর বাড়িতে। কথায় কথায় ঝর্নাদির প্রসঙ্গ উঠলো। জিজ্ঞেস করলাম, ঝর্নাদিদের খবর-টবর কি?

ছোটমাসী উদাসীনভাবে জানালেন যে, ওদের খবর-টবর সব ভালোই। তবে দিন-দশেক দেখা হয় না।

আমি স্তম্ভিত। দু'জনে এত প্রাণের বন্ধু, এখন এক পাড়াতে থেকেও দিন দশেক দেখা হয় না। প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার! ঝগড়াঝাঁটি কিছু হয় নি, শুধু ছেলেমেয়ে সামলে আর সময় পান না। এক কালের দুই সখী এখন হয়ে উঠেছেন দুই অন্ধ জননী।

বাইরে বেরিয়ে দেখলাম অন্য দৃশ্য। ছোটমাসীর চাকরের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে পাপিয়া আর ঝর্নাদির চাকরের সঙ্গে বেরিয়েছে বাবলু। দু'জনে মহানন্দে খেলা করছে ত্রিকোণ পার্কে। শিশুদের হৃদয় জলের মতন। কোনো দাগ স্থায়ী হয় না, ঝগড়াঝাঁটি ভুলে

যায় দু'মিনিটে। পাপিয়া আর বাবলু দু'জনেই যখন আর একটু বড় হবে, তখন পাপিয়া আর মারামারি করবে না, বাবলুরও জিনিসপত্র ভাঙার নেশা চলে যাবে—তখন আশা করা যায়, ছোটমাসী আর ঝর্নাদি—এই দুই সখীর পুনর্মিলন হবে।

পুনশ্চ। ছোটমাসীর বাড়িতে বেড়াতে যেতেই উনি আমাকে প্রায় মারতে এলেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, তুই আমাদের নামে কী সব আজেবাজে কথা লিখেছিস, তোর এত সাহস! আমি নিরীহভাবে উত্তর দিলাম, যা দেখেছি তাই তো লিখেছি। কিছু তো বানাই নি। শুধু নামগুলো বদলে দিয়েছি। কেউ চিনতে পারবে না।

—আমার বন্ধুর সম্পর্কে তুই যা-তা লিখেছিস। তোর সঙ্গে দেখা হলে দেখবি ও কি করে!

—কি লিখেছি ঝর্নাদি সম্পর্কে? খারাপ তো কিছু নেই।

—খারাপ নেই! তুই লিখেছিস, ও তার মাসতুতো ভাইকে বিয়ে করেছে। ছিঃ, ছিঃ।

—মাসতুতো ভাই? তা কখন লিখলাম!

তুই লিখেছিস ঝর্নাদির বউদির মাসতুতো দেওরের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছে! তার মানে কি হয়? বউদির মাসতুতো দেওর মানে মাসতুতো ভাই হয় না?

—এই রে! আমি ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে লিখতে গিয়েছিলাম—এসব সম্পর্ক-টম্পর্ক আমার মাথায় ঢোকে না একদম! আসলে ওটা বউদির মাসতুতো দেওর নয়, বউদির মাসতুতো ভাই হবে, তাই না? ঝর্নাদির সঙ্গে দেখা হলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে তো!

আগের বার প্রায় দিন দশেক ছিলাম, তাই ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরটি বেশ চেনা হয়ে গিয়েছিল। ট্রামে চেপে বইমেলায় যাতায়াত করতাম। এইবারেও ১৬ নম্বর ট্রামে চেপে নামলাম 'বুক মেসে' বা বইমেলার গেটের সামনে। কিন্তু নেমে আর গেট খুঁজে পাই না। মাত্র তিন বছরে অনেক কিছু বদলে গেছে, প্রবেশ দ্বারটি এখন অন্যত্র এবং সুবিশাল। পাশেই গম্বুজের মতন একটি বহুতল বাড়ি উঠছে, সেটাও বইমেলার অন্তর্গত হবে।

আগেরবার ছিলাম আমন্ত্রিত, এবার রবাহুত দর্শক মাত্র। তবে বিদেশ থেকে কেউ এলেই তাকে একটি সৌজন কার্ড দেওয়া হয় বিনামূল্যে, এই সৌজন্যটুকু বইমেলা কর্তৃপক্ষ প্রদর্শন করেন। পাস-পোর্ট দেখিয়ে কার্ড সংগ্রহ করে ভেতরে ঢুকতে যেতেই সশস্ত্র প্রহরীর সম্মুখীন। মনটা বিবশ হয়ে গেল। বইমেলার মধ্যেও পিস্তল-বন্দুক! আজকাল বিমান-ভ্রমণে এতরকম সিকিউরিটির ঝঞ্ঝাট যে সব আনন্দই মাটি হয়ে যায়। হুমদো হুমদো চেহারার লোকেরা গায়ে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে, আমি আবার পুরুষ মানুষের স্পর্শ একেবারে সহ্য করতে পারি না। বইমেলাতেও সেই উৎপাত। শুধু যে হাত-ব্যাগই পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে তাই-ই নয়। প্রহরীদের সামনে শ্রীগৌরাঙ্গের চ্যালাদের মতন হাত তুলেও দাঁড়াতে হচ্ছে।

ফ্রাঙ্কফুর্টের মেলা এলাকাটা এবার যেন আরও বড় মনে হল। অনেকগুলি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হল, তিন-চারতলা করে। সেগুলির এক একটি ঘুরে দেখতেই পা ব্যথা হয়ে যায়। মেলার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিনা পয়সার বাস চলে, হলের সিঁড়িগুলি চলন্ত, তবু হাজার হাজার বইয়ের স্টলের গোলক ধাঁধার মধ্যে পথ হারিয়ে ফেলতে হয়। প্রথমে ঢুকে তো আমি ভারতীয় প্রকাশকদের জন্য

নির্দিষ্ট অংশটি খুঁজেই পাই না। চতুর্দিকে নতুন বইয়ের গন্ধ। ভারতীয় বিভাগটির ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকাশকদের বই তাঁরাই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন, তারপর প্রকাশকরা ওখানে গিয়ে আলাদা আলাদা দোকান সাজিয়ে বসেন। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্টের নিজস্ব একটি প্রদর্শনীও থাকে। ভারতীয় প্রকাশকদের মধ্যে দিল্লিরই আধিপত্য, কিছু বম্বের, মাদ্রাজ অঞ্চলের প্রকাশকদের সংখ্যা খুবই কম। কলকাতার বেশ কয়েকজন প্রকাশক আছেন বটে, তবে অধিকাংশই ইংরিজি বইয়ের, এঁদের মধ্যে সদাব্যস্ত বিমল ধরের উপস্থিতি সর্বত্র বিরাজমান। ভারতীয় স্টলগুলির মধ্যে একটিতে এক ঝকঝকে ধারালো চেহারার রমণীর দিকে বারবার চোখ চলে যায়, কেমন যেন চেনা চেনা লাগে। পরে জানা গেল, ইনি নর্তকী ও অভিনেত্রী মল্লিকা সারাভাই, পিটার ব্রুক্‌সের মহাভারতে দ্রৌপদীর ভূমিকায় অভিনয় করে যিনি বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন। মল্লিকাদেরও পারিবারিক প্রকাশনা-ব্যবসা আছে, এ বছর তাঁরা ইংরিজি মহাভারতের একটি সংস্করণও প্রকাশ করেছেন।

ছিয়াশি সালে এসে বাংলা বইয়ের অনেকগুলি দোকান দেখেছিলাম। সে বছর মেলা কর্তৃপক্ষ ভারতকে মুখ্য আকর্ষণ বলে ঘোষণা করেছিলেন। এ বছরের মুখ্য আকর্ষণ যেমন ফ্রান্স। সেবারে কলকাতার অধিকাংশ চেনা প্রকাশককে দেখেছিলাম এই মেলায়, এ বছর বাংলা বই টিমটিম করছে মাত্র দুটি স্টলে, আনন্দ পাবলিশার্স ও ফার্মা কে এল মুখোপাধ্যায়ের। ভারতীয় এলাকার বাইরেও বাংলা বই রয়েছে অন্যত্র আরও দুটি জায়গায়, থার্ড ওয়ার্লড কান্ট্রির এলাকায়, যেখানে কলকাতার মন্দিরা নামে এক প্রকাশক এবং বাংলাদেশের এক প্রকাশক আমন্ত্রিত।

এত বৃহৎ বিশ্ব বইমেলায় ভারতের স্থান নগণ্য, বাংলা বইয়ের উপস্থিতি নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলা যেতে পারে। যদিও বাংলা সারা পৃথিবীর সপ্তম প্রধান ভাষা। এই বইমেলায় পশ্চিমী দেশগুলির

বই-ব্যবসাই প্রধান, তাদেরই রমরমা। আনন্দ পাবলিশার্সের বাদল বসু প্রতি বছর এই মেলায় বাংলা বই সাজিয়ে বসে থাকেন। একটা প্রেস্টিজ-এর ব্যাপার আছে ঠিকই, এই এলাহী বইমেলায় কলকাতার বাংলা বইয়ের প্রকাশক অকুতোভয়ে অংশগ্রহণ করছেন, বিশ্ব প্রকাশকদের তালিকায় তাঁদেরও নাম স্থান পাচ্ছে, কিন্তু ব্যবসার কোনো সুরাহা হয় বলে মনে হয় না। এখানে বইয়ের খুচরো বিক্রির প্রশ্ন নেই, হোল সেল বিক্রির চুক্তি এবং অনুবাদের শর্ত বিনিময় হয়। বাংলা বইয়ের ক্ষেত্রে এ পর্যন্ত সে রকম কিছু ঘটেছে বলে শুনিনি।

প্রায় ছেলেবেলা থেকেই আমি বইয়ের জগতের সঙ্গে জড়িত, মাছ যেমন জলের মধ্যে সাবলীল থাকে, সেই রকমই এত নতুন বইয়ের প্রদর্শনী আমাকে মুগ্ধ করে রাখে, যে-সব ভাষা বুঝি না, সেই সব ভাষারও বইয়ের মলাট দেখে দেখে সময় কাটাই।

অনেক দেশের বড় বড় প্রকাশকরা কিছু কিছু উপহারও দেয়। যেমন কলম কিংবা পেপার ওয়েট কিংবা নানা রকম ঝোলানো ব্যাগ। ব্যাগের আকর্ষণই বেশি। বিনা পয়সায় কিছু পেতে শুধু যে আমাদের মতন গরীবদেশের মানুষদেরই উৎসাহ তাই-ই নয়, সচ্ছল শ্বেতাঙ্গরাও ঘুরে ফিরে সেই সব সংগ্রহ করে, কোনও কোনও স্টলের অতি সুদৃশ্য ব্যাগ কেউ কেউ নানা ছলে একাধিকও সংগ্রহ করে। ভারতীয় কোনও স্টলেই কোনও উপহার নেই, বইয়ের মলাট ও ছাপা-বাঁধা পশ্চিমী প্রকাশকদের তুলনায় ম্লান, তাই এই তল্লাটে ভিড়ও কম।

এক সময় এসে পড়লাম পেঙ্গুইন স্টলের সামনে। এবারে পেঙ্গুইন যেন কিছুটা আত্মগোপন করে আছে। ভাইকিং-এর সঙ্গে ভাগাভাগি করে একটা মাঝারি আকারের স্টলে বইগুলি সাজানো, কর্মীদের মুখে চোখে চাপা উদ্বেগ। কাছাকাছি সেপাই শান্ত্রীদের জমায়েত না দেখে একটু অবাক লাগছিল, পরে দেখি যে অনেক সশস্ত্র পারী-প্রহরী এখানে সেখানে আত্মগোপন করে আছে।

পেঙ্গুইনের ওপর একটা আক্রমণের হুমকি সর্বক্ষণই রয়েছে। যদিও এঁরা সালমন রুশদির বিতর্কিত বইটি এবার রাখেননি।

মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে একখানি বই ও তার লেখককে নিয়ে এত আলোড়ন আগে কখনো ঘটেনি। এই লেখকের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশ্যে ঘোষিত হয়েছে, আততায়ীকে বিপুল পুরস্কার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বিভিন্ন দেশ ও ব্যক্তি। অনেকগুলি দেশের রাষ্ট্রনায়ক এই লেখকের পক্ষে বা বিপক্ষে বিবৃতি দিয়েছেন, কূটনৈতিক সম্পর্ক বিপন্ন বা ছিন্ন হয়েছে এই একখানি বইকে কেন্দ্র করে। এক বছরেরও অধিককাল সেই লেখক প্রাণ ভয়ে আত্মগোপন করে আছেন।

এবারের বইমেলার প্রবেশ দ্বারে সিকিউরিটির এত কড়াকড়ির মর্ম ক্রমশ জানা গেল।

স্যাটানিক ভার্সেস বইটির জার্মান অনুবাদ এই সময়ে প্রকাশের কথা ছিল। পশ্চিম জার্মানির সরকার গোলমালের আশঙ্কায় এই অনুবাদের প্রকাশ নিষিদ্ধ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ওসব গণতান্ত্রিক দেশে কোনও বই নিষিদ্ধ করা সহজ কথা নয়। জার্মান প্রকাশকদের সংস্থা সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে দেয়, বাক-স্বাধীনতার ওপর এই হস্তক্ষেপ আদালতে গ্রাহ্য হয়নি। মামলায় জিতে সেই অনুবাদের প্রকাশক বইটি এবারের বইমেলাতেই সাড়ম্বরে উদ্বোধন করতে চেয়েছিলেন।

বইমেলা কর্তৃপক্ষ পড়ে যান বিপদে। বহু ফ্যানাটিক সংস্থা এবং রাষ্ট্র হিসেবে ইরান এখনো প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মুখ। বইমেলার মধ্যে বোমাবাজি হলে সাঙ্ঘাতিক ভয়ের ব্যাপার, চতুর্দিকে কাগজের সমুদ্র, একবার আগুন লেগে গেলে সেই বহ্ন্যুৎসব হবে পৃথিবীর সবচেয়ে লজ্জাজনক ঘটনা।

মেলাকর্তৃপক্ষ সেইজন্য জার্মান প্রকাশকদের সঙ্গে একটা আপোসে এসেছেন। স্যাটানিক ভার্সেস-এর জার্মান অনুবাদ মেলার মধ্যে উদ্বোধন করা হবে না, পরে যে-কোনো একদিন হতে পারে। এর

বিনিময়ে, কর্তৃপক্ষ এই মেলা থেকে ইরানকে বিতাড়িত করেছেন। ইরান যতদিন না একজন লেখকের ওপর থেকে মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা তুলে নেয়, ততদিন ইরানকে বিশ্ব বইমেলায় অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে না।

তবু চোরা-গোপ্তা আক্রমণের ভীতি রয়ে গেছে। তা ছাড়া গোপন সূত্রে নাকি খবর পাওয়া গেছে যে পুরুষের বদলে সশস্ত্র নারী গেরিলারা এবার পেঙ্গুইন বা অন্য স্টলের ওপর আক্রমণ চালাতে পারে। তাই ঢোকার মুখে এবার মেয়েদেরই বেশি তল্লাশ করা হচ্ছে। বিভিন্ন হলেও মেয়ে-পুলিশদের প্রাধান্য।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য কোনও আক্রমণের উদ্যম দেখা যায়নি। তবে একটি স্টল দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। নরওয়ে'র স্টলে পৃথিবীর বহু লেখকের ছবি টাঙানো রয়েছে, তার মধ্যে রুশদির ছবি! বহু বিতর্কিত বইটির নরওয়েজিয়ান অনুবাদও অকুতোভয়ে তাঁরা সাজিয়ে রেখেছেন। কোনও কোনও দেশে যেমন যখন তখন বই নিষিদ্ধ করা হয়, তেমনই বিপরীত ভাবে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান দেশগুলিতে বাক স্বাধীনতা কিংবা যা খুশি লেখার ও পড়ার অধিকারের দাবি অত্যন্ত উগ্র।

এক একসময় ক্লান্ত হয়ে বাংলা বইয়ের স্টলে এসে বসি। অন্য দেশীয়দের জনস্রোত পাশ দিয়ে চলে যায়, বাংলা বইয়ের র‍্যাকগুলির দিকে তাদের চোখ থামে না। বাংলা ভাষা কিংবা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে যেন কারুর কোনও আগ্রহ নেই। অন্যদের আকৃষ্ট করার মতন তেমন উদ্যোগও নেওয়া হয়নি। ইংরিজি ও জার্মান ভাষায় উল্লেখযোগ্য বাংলা বইগুলির সিনঅপসিস, লেখক-পরিচিতি, কিংবা সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্য নিয়ে ভালভাবে প্রচারের ব্যবস্থা করা উচিত সমবেতভাবে বাংলা প্রকাশকদের। আনন্দ পাবলিশার্স একটি ইংরিজি ক্যাটালগ এনেছেন। কিন্তু সেটাও যথেষ্ট নয়। আরও অনেক তথ্যপূর্ণ, চকচকে, ঝকঝকে তালিকার প্রয়োজন।

কচিৎ দু' একজন বাংলা-জানা জার্মান আসেন, কিম্বা অন্য কোনও

দেশের প্রকাশক সত্যজিৎ রায়ের বইয়ের অনুবাদের জন্য আগ্রহ দেখান। পশ্চিম বাংলার কোনও কোনও বাঙালী আসেন আড্ডা দিতে কিংবা আত্মীয়-বন্ধুদের খোঁজ নিতে, আর আসেন বাংলা-দেশীয়রা।

হফ্ট বানহফ অর্থাৎ প্রধান রেল স্টেশনের সিঁড়ি দিয়ে একদিন উঠে আসছি, একটি যুবক আমার পাশে এসে ইংরিজিতে বিনীত-ভাবে জিজ্ঞেস করলো, আপনার নাম কি অমুক? নিশ্চিন্ত হয়ে সে অতি উৎসাহের সঙ্গে ডেকে আনলো তার বন্ধুদের, এবং প্রায় জোর করেই আমাকে, বাদল বসুকে এবং ফার্মা কে এল-এর রণজিৎ মুখার্জিকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে।
ছেলেটির নাম বাবুল। সে এবং তার অতি তরুণী সুন্দরী স্ত্রী থাকে বইমেলার কাছেই এক অ্যাপার্টমেণ্টে। বাবুল ও তার বন্ধুরা আমাদের রান্নাবান্না করে খাওয়ালো এবং কয়েকটা দিন হই চই ও আড্ডায় মাতিয়ে রাখলো। এই সব বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত, কেউ ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার, কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ বা হোটেলে কাজ করে। কিন্তু বাংলা সাহিত্য নিয়ে তাদের উৎসাহ সব সময় টগবগ করছে। সেই তুলনায় পশ্চিম বাংলার বাঙালীরা দুর্গা পুজো কিংবা গান বাজনার জলসায় যতটা আগ্রহী, সাহিত্য সম্পর্কে তেমন নয়। একজন ফিল্ম স্টার কিংবা গায়ক-গায়িকাদের নিয়ে তাঁরা মাতামাতি করতে পারেন, কিন্তু সাহিত্যিকদের খোঁজ খবর তাঁরা বিশেষ রাখেন বলে মনে হয় না। পৃথিবীর বড় বড় শহরগুলিতে এখন অনেক বাঙালী থাকেন, তাঁদের অবস্থাও মোটামুটি সচ্ছল, কিন্তু তাঁরা সাহিত্য নিয়ে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করছেন, এমন কটা শোনা যায়?
বাবুল ও তার বন্ধুরা আমাদের সঙ্গে এমন আন্তরিক ব্যবহার করতে লাগলো, যেন আমরা তাদের অনেক কালের আত্মীয়। আমরা তিনজনেই উঠেছিলাম এক জার্মান পরিবারে পেয়িং গেস্ট হয়ে, কিন্তু

বাবুলরা এমন করতে লাগলো, যেন আমাদের খাওয়ানো/পরানোর দায়িত্বও ওদের। ওদের প্রত্যেকের বাড়িতেই বেশ কিছু বাংলা বই রয়েছে, বাংলা পত্রিকা রাখে, কথায় কথায় বাংলা সাহিত্য থেকে নানা রকম উদ্ধৃতি দেয়, প্রবাসী হয়েও মাতৃভাষার সেবা ও সম্মান করতে তারা একটুও ভোলেনি।

হাইডেনবার্গের কাছাকাছি হিসবার্গ শহরে থাকেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। ইনি বহুকাল ও-দেশবাসী হলেও দেশের সঙ্গে পুরোপুরি সংযোগ রেখেছেন, প্রত্যেক বছর কলকাতায় এসে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে যান। এখানকার কোন্ লিটল ম্যাগাজিনে কী লেখা বেরিয়েছে, সে সম্পর্কে অলোকরঞ্জন এতসব খবর রাখেন, যত আমিও জানি না। অলোকরঞ্জন জার্মানিতে অক্লান্তভাবে বাংলা সাহিত্যের জন্য পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও সেমিনারে তিনি বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে বলেন, নিজে অনেক অনুবাদ করেছেন এবং অন্যদের অনুবাদে উদ্বুদ্ধ করাচ্ছেন। এ সবই অলোকরঞ্জনের ভালোবাসার পরিশ্রম।

অলোকরঞ্জন আমাকে ও বাদল বসুকে ধরে নিয়ে গেলেন তার বাড়িতে। সেখানে তাঁর পত্নী টুডবার্টার আদরযত্ন এবং তাঁর জননীর স্নেহচ্ছায়ায় আমার অবস্থা যেন অতি প্রশ্রয় পাওয়া কোনো বালকের মতন। টুডবার্টা এক অসাধারণ রমণী, যেমন বিদূষী ও বুদ্ধিমতী, তেমনি তাঁর কর্মক্ষমতা। তিনি চারবেলা নানা রকম রান্নাবান্না করে আমাদের খাওয়াচ্ছেন, তারই মধ্যে আমাদের সঙ্গে গল্প করছেন, আবার কখনো গাড়ি চালিয়ে আমাদের নিয়ে বেড়াতে যাচ্ছেন। টুডবার্টা বাংলা সাহিত্য সম্পর্কেও অনেক খবর রাখেন, বাংলা গান ও ভারতীয় মার্গসঙ্গীত তাঁর প্রিয়, গাড়ি চালাতে চালাতে সেই সব গান-বাজনা শোনেন।

টুডবার্টারের সেবা যত্নেরও তুলনা নেই। আমার শীতে কষ্ট হবে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে ভেবে (শীত লাগছিল না) তিনি প্রায় জোর করেই তাঁর ক্লোসেট থেকে একটি ওভারকোট আমাকে পরিয়ে

দিলেন। মাসিমার পায়ে ব্যথা, সেই জন্য টুডবার্টা হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর শাশুড়ির পায়ে একদিন জুতো পরিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই দৃশ্যটি দেখে আমার মনে হচ্ছিল, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এরকম বর্ণনা পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ইদানীং এমন দৃশ্য দুর্লভ।

ওই বাড়িতে একদিন মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন লোথার লুৎসে। ইনি শুধু আমার নন, অনেক ভারতীয় লেখকেরই পূর্ব পরিচিত। লোথার হিন্দী খুব ভালো জানেন, বাংলা জ্ঞানও যথেষ্ট। ভরাট স্বাস্থ্য, উৎসাহে সর্বক্ষণ টগবগ করছেন, ইনি দাশগুপ্ত পরিবারের একজন বিশিষ্ট বন্ধু।

এক বিশেষ ধরনের সুস্বাদু জার্মান স্যুপে চুমুক দিতে দিতে লোথার আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সুনীল, তুমি তোমার কোন্ বইয়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে এসেছো?

আমি বললাম, সে রকম কিছু না তো! আমার কোনো বইয়ের অনুবাদ তো বেরুচ্ছে না।

লোথার জিজ্ঞেস করলেন, তা হলে তুমি এ সময় ফ্র্যাঙ্কফুর্টে এসেছো কেন?

আমি বললাম, এমনিই। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে দেখা করতে।

লোথার আমার দিকে বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে আমার কিছু কাজ আছে, যাবার পথে আমি ফ্রাঙ্ক-ফুর্টের বইমেলা ঘুরে যাচ্ছি, কারণ, এতে অতিরিক্ত বিমান ভাড়া লাগবে না। শুধু এই কারণে এসেছি, তা লোথার লুৎসের কাছে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। ফ্রাঙ্কফুর্ট বইমেলায় লেখকরা বিশেষভাবে আমন্ত্রিত না হলে আসেন না। কোনো কোনো প্রকাশক নতুন বই প্রকাশ উপলক্ষে সেই লেখককে নিয়ে আসেন, তাঁকে নিয়ে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রচার মাধ্যমগুলির দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেন। বাংলা বইয়ের লেখকদের নিয়ে সে রকম কোনো অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা নেই এখানে, বাংলা বইয়ের অনুবাদও হয় কদাচিৎ, তাও অনেকটা যেন উপরোধে ঢেঁকি গেলার মতন। অনুবাদ বেরুলেও

বিক্রি হবে কেন? বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে অন্যান্য দেশের পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সঞ্চারের কোনো ব্যবস্থা নেই। বাংলা ভাষার নামই এখনো অনেকে জানে না।

লোথার লুৎসে বইমেলাতে একদিনও যাননি, তার কারণ, ঐ মেলায় বাণিজ্যই প্রধান। নতুন বই বিক্রিরও কোনো ব্যবস্থা নেই।

সত্যি, ফ্রাঙ্কফুর্টের বিশ্ব বইমেলা দেখলে মনে হয়, মোটর গাড়ি, ফ্রিজ, টি ভি ইত্যাদির মতন বই নিয়েও এক বিশাল বাণিজ্য চলছে। সেই বাণিজ্য প্রায় পুরোপুরিই পশ্চিমী প্রকাশকদের আওতায়। তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির (এই তৃতীয় বিশ্বে আখ্যাটা শুনলেই আমার গা জ্বলে যায়।) প্রকাশকদের অবস্থা যেন নেমন্তন্ন বাড়িতে হরিজনদের মতন।

অন্য কোনো দেশে যাওয়া-আসার পথে লণ্ডনে থেকে যাওয়া সহজ। তাছাড়া আমার খুব ছেলেবেলার বন্ধু ভাস্কর দত্ত এখানে থাকেন, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা না করে কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না, সেই জন্য আমি বেশ কয়েকবার লণ্ডনে গেছি।

এই প্রথম আমি লণ্ডনে এলাম আমন্ত্রিত হয়ে। না, ঠিক প্রথম নয়, বহুকাল আগে একবার এসেছিলাম, ইংলণ্ডেশ্বরীর আমন্ত্রণে, শুনতে গালভারি শোনালেও সেটা আসলে অতি ফর্মাল ব্যাপার ছিল। এবারে এসেছি বাংলা ভাষাভাষীদের ডাকে।

এবারে যেন দেখলাম এক নতুন লণ্ডন। আমার কাছে এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। এখানকার ক'জনই বা জানেন যে কলকাতা ও ঢাকার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের তৃতীয় কেন্দ্র এখন লণ্ডন।

'বাংলা সাহিত্য পরিষদ' নামে একটি সংস্থা নেমন্তন্ন করেছেন শামসুর রাহমান এবং আমাকে। তিন দিনের সাহিত্য সম্মেলন এবং একদিন টেমস নদীতে বজরা ভ্রমণের ব্যবস্থা। এই সংস্থার সভাপতি কাদের মাহমুদ এবং সম্পাদক সৈয়দ শাহীন।

প্যারিস থেকে ভাস্কর, বাদল বসু ও আমার লণ্ডনে পৌঁছোনর কথা

সকাল সাড়ে নটায়, বিমানের গণ্ডগোলে আমরা হিথরো এয়ারপোর্টে পা দিলাম বিকেল পাঁচটায়। সেই সকাল নটা থেকে সৈয়দ শাহীন ও তার বন্ধু বেলাল এয়ারপোর্টে ঠায় বসে আছে। তাদের অকৃত্রিম আন্তরিকতার সেই প্রথম পরিচয়।

ভাস্কর তার বাড়িতে আমাকে নিয়ে যাবেই। কিন্তু শাহীনদের দাবি, তারা আমাকে আমন্ত্রণ করেছে, সুতরাং এবার তাদের কাছেই আতিথ্য নিতে হবে। দু' একদিন পরে গিয়ে অবশ্যই থাকবো, এই কথা দিয়ে সেদিনকার মতন ছাড়া পাওয়া গেল।

অন্যান্যবার লণ্ডনে এসে পরিচিত ও বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। কিছু কিছু বাঙালী গোষ্ঠী যে সানডে স্কুল বা রবিবারের বাংলা স্কুল খুলেছেন, সে খবরও জানি, ভাস্করের সঙ্গে গিয়ে একটা স্কুল দেখেওছি। এখানে আছে টেগোর সোসাইটি ও টেগোরিয়ান নামে সংস্থা। দেশ থেকে গান-বাজনা-নাচের দল প্রায়ই ইংলণ্ডে গিয়ে অনুষ্ঠান করে আসেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্য নিয়ে বড় ধরনের কোনো অনুষ্ঠান কিংবা কবি সম্মেলনের ব্যবস্থা লণ্ডনের বাঙালীরা কখনো করেছেন বলে শুনিনি।

লণ্ডনে পশ্চিমবঙ্গীয় বাঙালীদের তুলনায় বাংলাদেশীদের সংখ্যা অনেক বেশি। তাদের উপস্থিতি সর্বত্র টের পাওয়া যায়, দক্ষিণ লণ্ডনের কোনো কোনো পাড়ায় সিলেটিদের পাড়া বলা যেতে পারে। সেখানকার স্কুলগুলিতে বাংলা পড়ানো হয়, অনেক জায়গায় বিভিন্ন সরকারি নোটিশ লেখা থাকে বাংলায়।

এখানকার বাংলাদেশী লেখকদের মধ্যে কয়েকজন আমার বন্ধুস্থানীয়, বি বি সি-র বাংলা বিভাগের অনেকের সঙ্গে আড্ডা হয় বুশ হাউজে গেলে। কিন্তু বাংলাদেশীরা যে বাংলা নিয়ে এখানে এত কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে চলেছেন, সে সম্পর্কে আমার বিশেষ ধারণা ছিল না।

এখন ইংল্যাণ্ড থেকে সাতখানি বাংলা পত্রিকা বেরোয় নিয়মিত। সেগুলি সখের পত্রিকা কিংবা লিটন ম্যাগাজিন নয়, রীতিমত ব্যবসায়িকভাবে চলে, অনেক ছেলেমেয়ে সেখানে কাজ করে,

সেটাই তাদের জীবিকা। লণ্ডনে বাংলা ছাপারও কোনো অসুবিধে নেই আর, এই সব পত্রিকা মূলতঃ রাজনীতি এবং সংবাদমূলক, সাহিত্যের জন্য আলাদা পৃষ্ঠাও বরাদ্দ আছে। অদূর ভবিষ্যতে লণ্ডন থেকে কোনো বাংলা দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

লণ্ডন থেকে বাংলা বই ছাপাও শুরু হয়ে গেছে। ওখানকার লেখকদের আর কলকাতা কিংবা ঢাকার ওপর নির্ভর না করলেও চলবে। এর মধ্যে প্রায় ষাটখানি বাংলা বই প্রকাশিত হয়েছে লণ্ডন থেকে। প্রবন্ধ, স্মৃতিকথা, উপন্যাস জাতীয় কয়েকটি বই আমি দেখেছি, ছাপা-টাপা বেশ ভালো। পশ্চিম বাংলা ও বাংলাদেশের পরবর্তী প্রজন্মের কিছু কিছু লেখকের বইও প্রকাশিত হতে পারে লণ্ডন থেকে।

এই সব কিছুরই উদ্যম বাংলাদেশীদের। পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের কেমন যেন উদাসীন মনে হয়। অনেকেই বাংলা বইটই পড়েন না। তবে, তাঁরা কিছুই করছেন না, এটা বলাও ঠিক নয়। হিরন্ময় ভট্টাচার্যের 'সাগর পারে' একটি সুপরিচিত পত্রিকা, আরও কয়েকজন বই লিখে লণ্ডন থেকে প্রকাশ করছেন।

বন্ধুবর আবদুল গাফ্ফর চৌধুরীর সঙ্গে দেখা হলো অনেকদিন পর। তিনি সহৃদয়ভাবে আলিঙ্গন করলেন আমাকে। আমি বললাম, আপনি 'পূর্ব-পশ্চিম' উপন্যাসের একটি চরিত্র, তিনি বললেন, আমিও আপনাকে নিয়ে একটি গল্প লিখেছি ঃ দেখা হলো প্রাবন্ধিক হাসন মুরশেদ এবং সম্পাদক শফিক রেহমান এবং আরও অনেকের সঙ্গে। নতুন পরিচিত বহু অল্পবয়েসী ছেলেমেয়েদের উৎসাহ দেখে আমি মুগ্ধ। কয়েকজন কী চমৎকার আবৃত্তি করে। বাইশ থেকে তিরিশ বছর বয়স্ক প্রবাসী পশ্চিমবঙ্গীয়রা অনেকেই ভালো করে বাংলায় কথাই বলতে পারে না, বাংলা কবিতা পাঠ তো দূরের কথা।

প্রথম অনুষ্ঠানটি হলো লণ্ডন ইউনিভার্সিটির ম্যানিং হলে। প্রেক্ষাগৃহটি বিশেষ বড় নয়, কিন্তু একসময় সব আসন পূর্ণ, কিছু

কিছু লোকজন দাঁড়িয়েও ছিল। আজকাল বিদেশের সাহিত্য অনুষ্ঠানগুলিতে লোকজন বিশেষ হয় না, এখানে এই জনসমাগম দেখে হকচকিয়ে যাবার মতন অবস্থা। গোটা অনুষ্ঠানটি আগাগোড়া বাংলায়, দু' একজন সাহেব আলো-মাইক ঠিক করছিল, না হলে বোঝবারই উপায় নেই যে ব্যাপারটা লণ্ডন শহরে ঘটছে।

পরবর্তী দুটি অনুষ্ঠান বাংলাদেশ সেণ্টার ও টয়েনবী হলে। যদিও শনি রবিবার ছুটির দিনে ব্যবস্থা, কিন্তু ঝিরঝির করে বৃষ্টি হচ্ছিল, সেই সঙ্গে নভেম্বরের শীতল বাতাস। লণ্ডনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত বহুদূর, তবু উৎসাহীদের সংখ্যা কম নয়। কলকাতা ও ঢাকা থেকে আমরা দু'জন, আর বিলেতের অনেক লেখক-প্রাবন্ধিক শিল্পী অংশগ্রহণ করলেন। প্যারিস প্রবাসী বাংলাদেশের মূকাভিনয় শিল্পী পার্থপ্রতিম মজুমদারও দুর্দান্ত মূকাভিনয় দেখালেন একদিন।

লম্বা বক্তৃতার বদলে আমি কিছুটা সময় প্রশ্নোত্তরের প্রস্তাব করেছিলাম। বক্তৃতা দিয়ে সাহিত্যের কোনো সুরাহা হয় না। শ্রোতা ও দর্শকদের মধ্য থেকে প্রশ্ন এলে বোঝা যায়, তাঁরা সাহিত্য সম্পর্কে কতদূর খোঁজ খবর রাখেন, সাম্প্রতিক লেখাজোখার সঙ্গে কতটা ওয়াকিবহাল। এখানে অনেকেই বেশ পড়াশুনো করেছেন মনে হলো। শামসুর রাহমানের সঙ্গে শ্রোতাদের প্রশ্নোত্তর বেশ জমে উঠেছিল। শামসুর চমৎকার কবিতা-পাঠ করেন, সুবক্তাও বটে।

অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা এবং অংশগ্রহণকারী অধিকাংশই বাংলাদেশী তো বটেন, দর্শক-শ্রোতাদের মধ্যেও তাই! অনিন্দ্য রায় কিম্বা অমলেন্দু বিশ্বাসের মতন দু' একজন কবির যথেষ্ট উৎসাহ আছে বটে কিন্তু অন্য অনেককেই এই সব অনুষ্ঠানে দেখা গেল না। বাংলা-দেশীদের সঙ্গে পশ্চিম বাংলার বাঙালীদের ঝগড়া নেই বটে, ব্যক্তিগত-ভাবে এদিকের সঙ্গে ওদিকের কারুর কারুর বন্ধুত্বও আছে, কিন্তু সমবেতভাবে কোনো কিছু করার বিশেষ প্রয়াস দেখা যায় না। আমি অনেক সময় বলি, আর কিছুদিন পর বাংলা সাহিত্য ও

সংস্কৃতির ধারক হবেন বাংলাদেশীরাই, ভারত থেকে বাংলা ক্রমশ মুছে যাবে। এতে অনেকে চটে যান। কিন্তু পৃথিবীতে এখন বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবেই ক্রমশ পরিচিত হয়ে উঠছে, ভারতের এই প্রাদেশিক ভাষা সম্পর্কে অনেকের খেয়াল থাকে না। ভারতীয় বাঙালীরা মাতৃভাষাকে তেমন মর্যাদা দিচ্ছেন কোথায়? প্রবাসের সচ্ছল বাঙালীরা কতটুকু সময় দান করছেন মাতৃভাষার জন্য? কিন্তু পৃথিবীর বহু দেশেই বাংলাদেশীরা মাতৃভাষার জন্য গর্বিত, এই ভাষার প্রসার ও সম্মানবর্ধনের জন্য যত্নশীল।

দু' একজন বাংলাদেশী তরুণ অভিমান ভরে আমাকে বলেছেন, ভারতীয় বাঙালীরা তাঁদের অনুষ্ঠানে বাংলাদেশীদের আমন্ত্রণ জানান না। কিন্তু বাংলাদেশীদের অনুষ্ঠানে ভারতীয় বন্ধুদের আমন্ত্রণ জানানো হয়, কার্ড পাঠানো হয়, তবু প্রায় কেউই আসেন না। এই অভিযোগ কতদূর সত্য তা আমি জানি না, আমি কতটুকুই বা দেখেছি। কিন্তু আমার মনে হয়, ভারত আর বাংলাদেশের মধ্যে রাজনৈতিক ব্যবধান যাই-ই থাকুক, অন্যান্য ব্যাপারে যতই মত বিরোধ ঘটুক, সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দুনিয়ার সমস্ত বাংলা ভাষা-ভাষীদের এককাট্টা হয়ে থাকা উচিত। দুই বাংলার বাঙালীরা একসঙ্গে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধির জন্য প্রয়াস চালালে, বিশ্বের কাছে এই ভাষা সংস্কৃতির গৌরব বর্ধন হবে, তাতে তো সকলেরই লাভ। এটা আমার আশা, সকলে যে মানবেন তার কোনো মানে নেই!

আমারও সেই রকমই মাঝে মাঝে মনে হয়, স্বর্গে কি লাইব্রেরি আছে? মৃত্যুর পর যদি কোনো ক্রমে স্বর্গে পৌঁছেও যাই, তা হলে বই ছাড়া সময় কাটবে কী করে? স্বর্গে নাকি খাওয়া-দাওয়া আর অন্যান্য সব আমোদ-প্রমোদ ফ্রি, তবু দিনের পর দিন একখানাও

বই পড়তে পারবো না, এই অবস্থাটা কল্পনাও করতে পারি না।

কত রকম প্রতিকূল পরিবেশে, কত কষ্ট করেই না বই পড়েছি জীবনের নানা সময়, এখনও সেই সব কথা মনে পড়লে তৃপ্তিতে মন ভরে যায়।

আমাদের বাল্যকালে ইস্কুলের সিলেবাসের বই ছাড়া অন্য বই পড়ার ব্যাপারে নিষেধ ছিল। স্কুলের বইগুলিকে বলা হয় 'পড়ার বই', আর বাকি গল্প-কবিতার বই যেন না-পড়ার বই! কিন্তু এতকাল পরে আমি বুঝতে পেরেছি, স্কুল কলেজের পাঠ্য বই থেকে আমি যত শিখেছি, গল্প-উপন্যাস-কবিতার বই পড়ে তার চেয়ে কম কিছু শিখিনি। ইতিহাস-ভূগোল-দর্শন প্রভৃতি অনেক কিছুই তো পেয়েছি এই সব বই থেকে। সবচেয়ে বড় কথা, সাহিত্য থেকেই পাওয়া যায় জীবনবোধ।

সেই ছোটবেলা থেকেই পড়ার বইয়ের আড়ালে রেখে গল্পের বই পড়ার অভ্যেস রপ্ত করেছিলাম। জ্যামিতি বইয়ের নিচে 'চাঁদের পাহাড়', ভূগোল বইয়ের নিচে 'সুন্দরবনের আর্জান সর্দার'। ইস্কুলে যে-মাষ্টারমশাইয়ের ক্লাসের পড়ানো একেবারেই ভালো লাগতো না, খুব নীরস মনে হতো, সেই সব ক্লাসে আমরা কয়েকজন পেছনের বেঞ্চিতে বসে গল্পের বই চালাচালি করতাম।

বাড়িতে অনেক সময় বাইরের লোক এলে পড়ার জায়গা থাকতো না, গল্পের বই পড়তে দেখলে অভিভাবকরা কান মুলে দিত, তখন পালিয়ে যেতাম ছাদে। সেখানেও হঠাৎ বৃষ্টি এসে গেলে বসতাম সিঁড়িতে। বৃষ্টির জন্য আলো কমে যায়। তখন চোখের একেবারে কাছে এনে বই পড়া। কোনো কোনো বইয়ের এমন টান যে শেষ না করলে ঘুম আসে না। রাত্তিরে সবাই শুয়ে পড়লে আমি আবার চুপিচুপি উঠে বাথরুমে গিয়ে আলো জেলে সে বই শেষ করেছি।

একবার ট্রেনে বাবা-মায়ের সঙ্গে বেড়াতে যাচ্ছিলাম দেওঘর। একই কামরায় আর একটি পরিবারে আমার বয়েসী একটি ছেলে ছিল।

তার কাছে অনেকগুলো গল্পের বই ছিল, আমাকে সে একটা বই ধার দিল। আজও মনে আছে, সেই বইখানা ছিল ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের রচনা সংগ্রহ। পুরো বইটা শেষ হলো না, আমরা পৌঁছে গেলাম। আমরা দেওঘর, সেই ছেলেটি যাবে রিখিয়া। মাঝখানের দূরত্বটা ছেলেবেলার পক্ষে অনেক। দেওঘরে আমি ত্রৈলোক্যনাথের বই পাবো কোথায়? দুটো দিন ছটফট করে কাটলো। তারপর একজনের কাছ থেকে একটা সাইকেল ধার করে চলে গেলাম রিখিয়ায়। সেই ছেলেটি এবং তার বাবা-মা আমাকে দেখে খুশী হয়েছিলেন, আদর যত্ন করলেন, খাওয়ালেন, কিন্তু আমি যে আসলে বইখানা শেষ করার জন্য ছুটে এসেছি, তা আর জানালাম না।

আমাদের ছেলেবেলায় গল্পের বইয়ের সংখ্যা বেশি ছিল না। এত রকম কমিক্স ছিল না। ইংরিজি বই খুব কম আসতো। বাংলা বই হাতের কাছে যখন যা পেতাম, পড়ে ফেলতাম সবই, বাছবিচার করার কোনো প্রশ্নই ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা যেমন পড়তাম, তেমনি রহস্য রোমাঞ্চ সিরিজের চটি চটি বই, মারামারি-খুনোখুনীর বই গিলতাম দারুণ আগ্রহে। যে-গুলো সত্যিকারের ভালো বই, এখনো মনে দাগ কেটে রয়ে গেছে, আর যে-গুলো আজেবাজে, অকিঞ্চিৎকর, সেগুলো স্মৃতি থেকে ঝরে গেছে কবে! আমার ধারণা, বাজে বই পড়লেও কোনো ক্ষতি হয় না। স্মৃতির ছাকনিই সবচেয়ে বড় বিচারক।

আমি এখনো কোনো সময় একা বসে থাকলেই কেমন যেন খালি খালি লাগে। চোখ তখন কিছু না কিছু ছাপার অক্ষর খোঁজে। যে-কোনো একটা বই কিংবা পত্র পত্রিকা টেনে নিই। যে-কোনো লেখা থেকেই কিছু না কিছু পেয়ে যাই। অনেক মানুষের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলার পরেও মনে কোনো দাগ কাটে না, কিন্তু কোনো লেখা যদি দু' চার পাতা পড়া যায়। সে রকম পড়িয়ে নেবার ক্ষমতা লেখাটির থাকে, তবে সেই লেখা পাঠককে নিশ্চিত কিছু দিয়ে যায়।

লোডশেডিং-এর মধ্যেও মনে হয়, একমাত্র বই পড়ার সুযোগ থাকলে বিরক্তি কাটতো। এখন আমরা শহরের বাড়িতে হারিকেন রাখি না, হারিকেনের আলোতে পড়ার অভ্যেসও চলে গেছে। কিন্তু শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেলে অন্যরকম অভিজ্ঞতা হয়। রবীন্দ্রনাথের জায়গা, সাহিত্য শিক্ষার অত বড় পীঠস্থানেও সন্ধে-বেলা লোডশেডিং একেবারে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। কিন্তু সেখানে ব্যাঙ ডাকে, বাতাসে ঝিঁঝির শব্দ ভাসে, একটু গ্রাম গ্রাম ব্যাপার রয়ে গেছে। তাই মোমবাতি জ্বেলে অসমাপ্ত বইটির মধ্যে ডুবে যেতে কোনো অসুবিধে হয় না।
স্বর্গে হয়তো লোডশেডিং নেই। সেখানে অজস্র তারকাপুঞ্জ আলো দিচ্ছে, অন্ধকারের সমস্যা হবে না। কিন্তু বই না পেলে সময় কাটবে কী করে? স্বর্গে লাইব্রেরি আছে কি না জানতে না পারলে নিশ্চিন্তে স্বর্গেও যাওয়া যাবে না।

রাসবিহারী এভিনিউর ফুটপাথে দাঁড়িয়ে বিকেলবেলা একটি তরুণী একটি তিনতলা বাড়ির ওপরের জানলার দিকে মুখ করে ডাকছিল, কৌশিক, কৌশিক? অবিলম্বে জানলা খুলে গেঞ্জিপরা একটি স্বাস্থ্যবান যুবক মুখ বাড়িয়ে বললো, কে। ঝুমা? ওপরে আয়! মেয়েটি বললো, ওপরে আর যাবো না, একটা শুধু দরকারি কথা আছে। যুবকটি নিচে নেমে এলো, এবং শুধু একটি মাত্র দরকারি কথা নয়, অনেক দরকারি কথা হতে থাকে, পাশের সিগারেটের দোকান থেকে আমি যে দু এক টুকরো শুনতে পাই; তাতে বুঝতে পারি এরা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী। আমার রোমাঞ্চ হয়।

আমাদের ছাত্র জীবনে, খুব বেশীদিন আগের কথাও নয়, আমরা কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে খুব সহজে দেখা করতে পারতাম না,

অনেক ছলছুঁতো খুঁজতে হতো। মেয়েদের বাড়িতে দেখা করতে যাওয়া প্রায় নিষিদ্ধই ছিল। গ্রীষ্মের ছুটির দীর্ঘ ব্যবধানে অতিষ্ঠ হয়ে একবার এক সহপাঠিনীর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে তার ব্যায়ামবীর দাদার কাছে আধ ঘণ্টা ইন্টারভিউ দিতে হয়েছিল এবং টেবিলের তলায় আমার পা দুটো কাঁপছিল ঠকঠক করে। আর ছেলেদের বাড়িতে কোনো মেয়ের ডাকতে যাওয়া প্রায় অকল্পনীয় ব্যাপার। আমাদের বাড়িতে কোনো অনাত্মীয় মেয়ের আগমন পাড়া প্রতি-বেশীদের উঁকিঝুঁকি দেওয়ার মতন ঘটনা। মাত্র কয়েক বছরে এত বদলে গেছে? এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা তাদের সহপাঠীদের বাড়িতে এসে নাম ধরে সহজভাবে চেঁচিয়ে ডাকতে পারে। এটাই তো সবচেয়ে সুস্থ এবং স্বাভাবিক জিনিস। ঐ তরুণ-তরুণীর প্রতি আমার একটুও হিংসে হয় না, বরং আমার ওদের আশীর্বাদ করতে ইচ্ছে হয়।

কলকাতা এরকম হঠাৎ হঠাৎ ভাবে বদলায়।

একজন ক্রিকেট খেলোয়াড়কে যে বয়েসে বৃদ্ধ বলা হয়, সেই বয়েসটা একটা গীর্জার পক্ষে কিছুই না। তেমনি পৃথিবীর বনেদী শহরগুলি, যেমন বাগদাদ, জেরুজালেম বা বারাণসী, এদের তুলনায় দুশো ছিয়াশি বছরের কলকাতা নিতান্তই নাবালক। কলকাতার কোনো পূর্ব স্মৃতি নেই, কোনো ঐতিহ্য নেই। এই হিসেবে কলকাতার নাগরিকরা দায়মুক্ত, এখানকার নিয়ম রীতি আপনা-আপনি তৈরি হয়ে উঠছে।

কলকাতা সব সময় জীবন্ত। হঠাৎ হঠাৎ উত্তেজনার ঝড় ওঠে। কখনো প্রচণ্ড হিংস্র হয়ে পড়ে, কিন্তু কলকাতা কখনোই ঝিমিয়ে থাকে না। দিল্লির ছাত্ররা যখন ব্রাহ্মণ-হরিজনে বিবাহ নিয়ে বিক্ষোভ জানায়, কলকাতার ছাত্ররা তখন বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত। ভিয়েৎনাম বা কিউবার ঘটনা নিয়ে যখন কলকাতার ছাত্ররা অস্থির, তখন বোম্বাই-মাদ্রাজ দিল্লির ক্যামপাস শান্ত নিস্তরঙ্গ। এক সময়

কলকাতার ছাত্ররা সুরেন বাঁড়ুজ্যের ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া খুলে নিজেরা টেনে এনেছিল। বাংলার রাজনীতির সঙ্গে বাংলার ছাত্ররা বহুকাল জড়িত। অবশ্য রাজনীতি থাকলে দলাদলি থাকবেই এক সময় রাজপুতদের অসাধারণ শৌর্য-বীর্য থাকলেও বারো রাজপুতের তের হাড়ি হবার কারণে তারা পরাধীন হয়ে যায়। কলকাতার ছাত্ররাও রাজনৈতিক দলাদলিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে—এবং দলাদলির ফলে মাঝে মাঝে মারামারি। আমাদের ছাত্র বয়েসে নিজেদের মধ্যে মারামারিটা ঘুষোঘুষি বা ইটোইটিতেই থেমে থাকতো, দৈবাৎ দু'একজন ছুরিও বার করেছে—কিন্তু বোমা-পাইপগান নিয়ে কোনো সহপাঠীকে একদম খুন করে ফেলার ব্যাপারটা কেউ দেখে নি। মাঝ-খানের কয়েক বছর এই নৃশংস ও হৃদয়বিদারক ব্যাপারটি ঘটছিল, সুখের কথা, ছাত্ররা এখন আর খুনী হতে চায় না। যতদিন ছাত্র থাকবে, ততদিন মারামারি থাকবেই, সে খেলার রেজাণ্ট নিয়েই হোক বা রাজনীতি নিয়েই হোক—কিন্তু সে মারামারি ঘুষোঘুষিতে নিবদ্ধ থাকলেই ভালো। কলকাতার ছাত্রদের পক্ষে সবচেয়ে প্রশংসনীয় কথা এই, এরা কোনোদিনই ভাষা, প্রাদেশিকতা কিংবা সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ্বে মাতেনি। সেদিক থেকে এখানকার ছাত্রসমাজ অনেক মুক্ত, অনেক রুচিশীল।

কলকাতার যৌবন দুরন্ত, কিন্তু অশালীন না। দিল্লিতে কোনো কলেজের ছাত্র সাইকেলে চেপে যেতে যেতে রাস্তার পাশে বাসের জন্য অপেক্ষমান কোনো তরুণীর বেণী ধরে টান মারলো আর মেয়েটি যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠলো, এই বীভৎস দৃশ্য আমার নিজের চোখে দেখা। কলকাতার যুবসমাজ কোনো পথ-যাত্রিণীর রূপ যৌবন সম্পর্কে দু চারটে মধুর উক্তি করে নিশ্চয়ই, কখনো কখনো তাদের ভাষা কলেজ বাথরুমের দেয়ালের ভাষার পর্যায়েও নেমে যায় বটে, কিন্তু কখনো কোনো অচেনা নারীর সম্ভ্রমহানি করে না, শারীরিকভাবে আঘাত দেওয়া দূরে থাক। তাছাড়াও কলকাতা ছাড়া এখনও ভারতের আর কোথাও ট্রামে বাসে মহিলাদের দেখে পুরুষরা জায়গা

ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় না।

সিটি—বঙ্গবাসী—বিদ্যাসাগর—সেন্ট পলস্—স্কটিশচার্চ আর প্রেসিডেন্সি এই সব অতিকায় কলেজগুলি মোটামুটি কাছাকাছি হওয়ায়, এর মধ্যস্থল কলেজ স্ট্রীট কলকাতার ছাত্রদের একটি প্রধান কেন্দ্র। এই কলেজ স্ট্রীটে কতবার কতরকম ঝড় বয়ে গেছে। এখানকার কফি হাউস যুব সমাজের একটি প্রাণের জায়গা। দু' পাঁচ বছর পর পর আড্ডাধারীরা বদলে যায়, কিন্তু আড্ডার স্রোত অব্যাহত থাকে। এখন এক একদিন কফি হাউসে গেলে একটাও চেনা মুখ দেখি না, কিন্তু এক সময় আমার বন্ধুবান্ধবরাই ছিল এখানকার রাজন্যবর্গ। এবং এখনো দেখতে পাই, ঠিক আমাদের মতনই একদল অবিকল সেই একই ভঙ্গিতে তর্কে মেতে টেবিল ফাটাচ্ছে। বিভিন্ন টেবিলে বিভিন্ন গোষ্ঠী। সাধারণত ছাত্রনীতিই সব জায়গার আলোচনায় প্রাধান্য পায় বটে, কিন্তু কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসে যেন কবি ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বিশেষ স্থান আছে। কফি হাউসে যে-কেউ গিয়ে এক কাপ কফি কিনে খেতে পারে, তবু কেন যেন রটে যায়, যারা কফি হাউসে যায়, তারাই ইনটেলেকচুয়েল। কফি হাউসের অনেক টেবিলেই অনেক সাহিত্য পত্রিকার আজ অফিসিয়াল অফিস। আড্ডাধারীদের পকেট থেকে বেরোয় টাকার বদলে ভাঁজ করা কবিতা। অনেকেই জানে না, কলকাতা গোপনে গোপনে কবিদেরই শহর।

বারোয়ারি পুজো এবং খেলার মাঠে কলকাতার যৌবন বেশী স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের ম্যাচের পর বিশাল এক যৌবনস্রোত ময়দান ছেয়ে ফেলে, বন্যার মতন ক্রমশ তা রেড রোড পেরিয়ে ধেয়ে আসে এসপ্লানেডের দিকে। কত রকমের জামা আর কত রকমের চুলের বাহার। রাস্তায় গাড়ি-টাড়ির গা ধমাধম করে পিটিয়ে উল্লাস জানায়, বাসের জানলা দিয়ে ঝুলে কিংবা ছাদে চড়ে প্রাণ বিপন্ন করে হাসতে হাসতে বাড়ি ফেরে। এই সব যুবকদের সামান্য উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের সমালোচনা যখন করেন কেউ, আমি

আশ্চর্য হয়ে যাই। এ আর কি উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার। এর চেয়ে কত গুণ বেশী উচ্ছৃঙ্খল তারা হতে পারতো, হবার কথা ছিল। যে-রকম অসহ্য কষ্ট সহ্য করে তারা খেলা দেখে, তিনদিন ধরে লাইনে দাঁড়িয়েও টিকিট পায় না, অথচ ঠিকই টিকিট পেয়ে যায় পেটমোটা লোকেরা, তাদের যাতায়াত ব্যবস্থার এত দুর্ভোগ—এর ফলে কোনোদিন যে তারা ফেটে পড়েনি, সারা শহরে আগুন জ্বালিয়ে দেয়নি. সেটাই আশ্চর্য নয়? এক লক্ষ যুবক এক সঙ্গে হলে কী না করতে পারে!

বারোয়ারি পুজোয় ছেলেরা একটু চাঁদার টাকায় ফুর্তি-টুর্তি করে। কীভাবে যেন রটে গেছে, দুর্গাপুজো করে পাড়ার ভালো ছেলেরা আর কালীপুজো করে পাড়ার মস্তানরা। নিশ্চয়ই এটা সত্যি নয়··তবু এরকম একটা রটনা চলছে। যারাই যে পুজো করুক না, কিন্তু খানিকটা আনন্দ-টানন্দ তারা তো করবেই। যে শহরে খেলার মাঠের সংখ্যা নগণ্য, ভালো বেড়াবার জায়গা নেই, বিশ্রী কতকগুলো সিনেমা ছাড়া সময় কাটাবার কোনো ব্যবস্থা নেই, সেখানে যুবকরা বছরে দু'বার অন্তত আনন্দ করার সুযোগ নেবে না? তারা শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী ছেলে হয়ে থাকবে? যে দেশের যুবসমাজ শান্তশিষ্ট লক্ষ্মী—
—সে দেশের সর্বনাশ হতে আর দেরি থাকে না।

কলকাতার যৌবনের একটা ভারি করুণ দিক আছে। বিকেল বেলা নানান পথের মোড়ে মোড়ে যুবকরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা করে—ঘণ্টার পর ঘণ্টা একই জায়গায়, পা বদলে নেয় মাঝে মাঝে। এই দৃশ্য দেখে আমার কষ্ট হয়, বুক টনটন করে। এরা বেকার, এদের আর কোনো যাবার জায়গা নেই। স্বাস্থ্যবান, সুসজ্জিত সব যুবা। চুপচাপ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে—এর থেকে অর্থহীন আর কি হতে পারে? এরা কাজ করতে অরাজি নয়, কিন্তু কেউ এদের কাজ দিতে পারে না। শুধু চাকরি দেওয়াই নয়—এক সঙ্গে কোনো একটা বড় কাজে নামবার জন্য এদের কেউ কখনো ডাকে নি। আমি মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি, কোনো একদিন কলকাতার দু'তিন লক্ষ যুবক

এক সঙ্গে শাবল গাঁইতি হাতে নিয়ে কোনো একটা রাস্তা তৈরি করা, বা বাঁধ বাঁধা কিংবা বাগবাজারের খালটিকে গভীরভাবে কেটে, নাব্য করে, ছু'পাশে সুদৃশ্য রাস্তা গড়ে কলকাতাকে আর একটি সুদৃশ্য জিনিস উপহার দিয়েছে।

সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরেই শুনলাম, রেবাদের বাড়িতে আমাদের সকলের রাত্তিরের নেমন্তন্ন। অবাক হয়ে গেলাম। সকালেও শুনিনি একথা, অন্তত তিনচার দিন আগে নেমন্তন্ন না করলে সেখানে কেউ যায় নাকি? কিসের এমন জরুরী নেমন্তন্ন! রেবার ছোট ভাইয়ের মুখে-ভাত।

বাড়িতে সবাই খুব হাসাহাসি করছে ব্যাপারটা নিয়ে। রেবাদের সঙ্গে আমাদের কোনো আত্মীয়তা নেই, পাড়ার মেয়ে, ওদের বাড়ির কারুর সঙ্গেও আমাদের চেনাশুনো নেই। আমার বোনকে ও মায়াদি বলে ডাকে, সারা ছুপুরটা আমাদের বাড়িতেই থাকে—বারো-তেরো বছর বয়েস রেবার, ভারী সরল আর মিষ্টি মেয়ে, আমাদের বাড়ির সবাই ওকে ভালোবাসে। আমাকে যে কেন ও সেজদা বলে, তা আমি আজও বুঝতে পারিনি, অনেকদিন বলেছি, এই তুই আমাকে সেজদা বলিস কেন—তা হলে মেজদা কিংবা বড়দা কে? আমার তো আর কোনো ভাই নেই। রেবা তবু বলবে, আমার সেজদা ডাকতেই ভালো লাগে, বেশ করবো সেজদা বলবো, তোমার তাতে কি?

আজ ছুপুরে রেবার মা এবং বাবা ছু'জনেই এসেছিলেন হাত জোড় করে অত্যন্ত বিনীতভাবে আমাদের সবাইকে নেমন্তন্ন করে গেছেন।

সে এক হাস্যকর অবস্থা! আমার বোন মায়া খিল্‌খিল্‌ করে হাসতে হাসতে বললো, জানিস্‌ দাদা, ওর বাবা-মার পাশে রেবাও দাঁড়িয়ে ছিল—চোখ দুটো লাল আর ফুলো ফুলো, বোঝাই যায় ওর বাবা-মা'র কাছে কেঁদেকেটে আমাদের জন্য নেমন্তন্ন আদায় করেছে—ওরা আগে নিশ্চয়ই রাজী হয় নি—হবেই বা কেন—আমাদের সঙ্গে কি আর সম্পর্ক—এদিকে আমরা যে এটা বুঝতে পেরেছি, সে ভাবও দেখানো যায় না······

কেউই নেমন্তন্ন রক্ষা করতে না গেলে রেবা খুব আঘাত পাবে, তাই মা আর মায়া গেল শুধু—আমি তো অচেনা বাড়িতে কোনোদিনই নেমন্তন্ন খেতে যাই না। দূর থেকে শুনতে পেলাম রেবাদের বাড়িতে সানাই বাজছে।

বেশ রাত করে ফিরে আমার বোন বললো, জানিস দাদা, সে এক এলাহী-কাণ্ড! প্রায় হাজার খানেক লোককে নেমন্তন্ন করেছে বোধহয়? বিরাট প্যাণ্ডেল, সারা বাড়িটা একেবারে আলো দিয়ে মুড়ে দিয়েছে। আর খাইয়েছে কি! দারুণ! লুচি-পোলাও, দু রকম মাছ, মাংস, তিন রকম মিষ্টি, দই।

আমি খানিকটা তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বললাম, তা খাওয়াবে না কেন! রেবার বাবাটা তো এক নম্বরের চোর! চুরি করা টাকায়—মা আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, ভারি বিচ্ছিরি ধরনের কথা! লোকের নামে ওরকমভাবে কথা বলতে নেই। আসলে চার মেয়ের পর এই একমাত্র ছেলে তো—তাই খুব ধুমধাম করেছে।

রেবাদের বাড়িটাকে পাড়ার লোকে বলে চোরের বাড়ি। আমারও অনেকটা সেই ধারণা। রেবার বাবাকে দেখলে অবশ্য ওরকম মনে হওয়ার কোনো কারণ নেই। অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্রলোক, চেহারাটাও সুন্দর—লম্বা, ফর্সা, অনেকটা ঘিয়ের কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মহাদেব-মহাদেব ভাব। কারুকে কোনোদিন ঠকান নি, দোকান থেকে ধারে জিনিস কিনে টাকা মেরে দেন নি! রেবার বাবা হরপ্রসাদ সরকার—কলকাতায় থাকেনও খুব কম, পাকিস্তানের

বর্ডারের কাছে কোন্ একটা থানার ও.সি. তিনি। পুলিসের দারোগা হলেই যে অসৎ হবে—তার কোনো মানে নেই নিশ্চয়ই, কিন্তু রেবার বাবা ঐ বর্ডারের কাছের থানায় বদলি হবার পরই রেবাদের বাড়ি যেন রাতারাতি বদলে গেল। হরপ্রসাদবাবু গুপ্তধন পান নি, ডারবির লটারি জেতেন নি, তবু ওঁদের একতলা ছোট্ট বাড়িটা রাতারাতি তিনতলা হয়ে গেল, পাশের বস্তিটা কিনে নিয়ে তিনি সেখানে ফ্ল্যাট বাড়ি তুললেন। এসব কি করে হয়। ম্যাজিকে? আমারও বিশ্বাস হয় না। শুধু দারোগার চাকরির মাইনেতে যে এসব হয় না, তা অন্ধতেও বোঝে। ছেলের অন্নপ্রাশনে এক হাজার লোককে ওরকম খাওয়ানো কি সোজা কথা!

আমি মায়াকে বললুম, তোদের ঐ বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে না যাওয়াই উচিত ছিল!

—কেন যাবো না কেন?

—ঐ চোরের টাকায় খাওয়াটাও অন্যায়!

—আহা-হা, রেবা ঐটুকু মেয়ে, অমন করে বলেছে, না গেলে ওর মনে আঘাত লাগতো না? কার বাবা কি রকম কে তার খোঁজ নিতে যাচ্ছে!

রেবার মনে সামান্য মালিন্যও নেই। সবসময় প্রাণশক্তিতে ভরপুর, সব সময় ছটফট করে, আমাদের বাড়িতে থাকতে যে ওর কেন অত ভালো লাগে, তা জানি না! মায়ার কাছে ও পড়াশুনোও দেখে নেয়, ওর মা প্রস্তাব দিয়েছিল মায়াকে রেবার জন্য মাস্টারনী রাখতে—মায়া অবশ্য তাতে রাজী হয় নি, সে বলেছে না, না, তার দরকার নেই, রেবা এমনিই আমার কাছে পড়ে যাবে। সারা দুপুর রেবা আমাদের বাড়িতে বসে কাটায়, মায়ের সঙ্গে রান্নাঘরে বসে গল্প করে, কোনো কোনোদিন ছুটির বিকেলে দেখি রেবাই আমার জন্য চা নিয়ে আসছে। আমার সঙ্গে এসে খুনসুটি করে, ছেলে-মানুষী প্রশ্ন করে, আমার তখন মেজাজ যে-রকমই হোক—রেবার সঙ্গে দেখা হলে না হেসে উপায় নেই! রেবাদের বড়লোকের বাড়ি,

ওদের বাড়িতে কত রকম খাবার—কিন্তু আমাদের বাড়িতে মুড়ি আর চানাচুর ও পরম আহ্লাদে খায়। এক একদিন আমার কাছে আব্দার করে, সেজদা, ফুচকা খাওয়াবে? খাওয়াও না। ঐ যে ফুচকাওয়ালা যাচ্ছে—

একদিন রেবার জন্য আমি দারুণ অপমানিত হলুম। গলির মোড়ে একটা সাইকেলের দোকান—সেখানে কতগুলো লোফারের আড্ডা, দিনরাত হৈ-হট্টগোল করে, মাঝে মাঝে কয়েকদিনের জন্য ওরা কোথায় উধাও হয়ে যায়—আবার ফিরে এসে দ্বিগুণ উৎসাহে হৈহৈ করে। ছেলেগুলোর জন্য পাড়ার অনেকেই সন্ত্রস্ত, আমি ওদের এড়িয়ে যাই।

গোটা তিন চারেক ছেলে আমাকে ঘিরে ধরে বললো, নীলুদা, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলবো। প্রাইভেট কথা!

আমি অবাক হয়ে বললুম, আমার সঙ্গে?

—হ্যাঁ, দাদা, একটু ইয়ে মানে, একটু বিপদে পড়ে—

—বিপদে পড়ে আমার কাছে? মজার ব্যাপার তো!

—আপনি ইচ্ছে করলে একটা ব্যবস্থা করতে পারেন! মানে বুঝলেন, পাড়ার লোক যদি পাড়ার লোককে না দেখে।

—খুলে বলুন তো ভাই!

—আমাদের ঘণ্টে, চেনেন তো, নীল গেঞ্জি পরে ঐ যে সাইকেলের দোকানে বসে থাকতো—সে মানে, ইয়ে, একটা বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছে, আপনাকে একটু উদ্ধার করে দিতে হবে।

—বাজে ব্যাপারে জড়িয়ে মানে!

—থানায় ধরা পড়েছে, ওর কোনো দোষ নেই।

—থানায় ধরা পড়েছে তো পাড়ার এম. এল. এ'র কাছে যাও! আমি কি করবো—

—এখানে নয়। বনগাঁয় ধরা পড়েছে।

বনগাঁয়? স্মাগলিং করতে গিয়েছিল বুঝি?

—না, না। একজন চেনা জানা লোকের সঙ্গে দেখা করতে

গিয়ে—

—সে যাই হোক, বনগাঁ-তে ধরা পড়েছে, তো আমার কি করার আছে?

—আপনি ইচ্ছে করলেই পারেন। ওখানকার ও. সি. হলেন গিয়ে হরপ্রসাদ সরকার—ওর মেয়ে তো আপনাদের বাড়িতে আসে। আপনাদের সঙ্গে ওদের খুব চেনা-জানা—আপনি যদি একটু বলে-কয়ে ঘণ্টেকে ছাড়িয়ে দেন—

—আমি? একজন স্মাগলার······কি বলতে চাও কি?

রাগে জ্বলতে জ্বলতে আমি বাড়ি ফিরে এলুম। ছি, ছি, এসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে অকারণে জড়িয়ে পড়ার কোনো মানে হয়। দোতলায় উঠেই আমার বোন মায়াকে দেখতে পেয়ে আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, এই, তোকে বলে দিচ্ছি—তুই রেবাকে এ বাড়িতে আসতে বারণ করে দিবি! খবর্দার যেন আর কোনো দিন ও এ বাড়িতে না ঢোকে! একটা চোরের মেয়ে—লোকে ভাবছে আমরাও বুঝি ঐ দলের—

—দাদা, তুই কি বলছিস? রেবার কি দোষ!

—তর্ক করিস্ না! কোনো কথা শুনতে চাই না। যা বলছি শুনে রাখ্। রেবা যেন কোনোদিন আর এ বাড়িতে না আসে।

—আমি একথা বলতে পারবো না।

—তা হলে আমার সঙ্গে দেখা হলে আমিই বলে দেবো—

ঠিক সেই সময় পাশের ঘর থেকে রেবা বেরিয়ে এলো। জানতুম না, ও এবাড়িতে আছে। তার সরল মুখখানা বিহ্বল হয়ে গেছে, দু'চোখে টল্‌টল্ করছে জল, কাঁপা কাঁপা গলায় বললো, সেজদা, আমি আর এ বাড়িতে আসবো না! আর আসবো না!

রেবা হুহু করে কেঁদে ফেললো। আমি ঠিক সেই মুহূর্তে কি করা উচিত কিছুই বুঝতে পারলুম না। আমার চোখ জ্বালা করে উঠলো। ঐ কচি মেয়েটাকে ওরকম বিষম আঘাত দেবার অধিকার আমার আছে কিনা সে কথা আমাকে কে বলে দেবে?

পৃথিবীর প্রতি সাতজন মানুষের মধ্যে একজন ভারতীয়। এটা আমাদের একটা গর্বের বিষয় হতে পারতো। কিন্তু পৃথিবীর বাকি ছ'জন মানুষেরা ভারতীয়দের কোনো সম্মান করে না। তাদের চোখে ভারত একটা ভিড়ে গিস্‌গিস্‌ করা দেশ, সেখানকার মানুষ গরীব। অর্থাৎ আমাদের জনসংখ্যাকে লোকবল বলা যায় না, বরং এটাই যেন দেশের বোঝা।

ভারতের থেকে একমাত্র বেশী জনবহুল দেশ চীন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের জনসংখ্যা যোগ করলে, অর্থাৎ প্রাক্তন মূল ভারত ভূখণ্ডের জনসংখ্যা চীনকেও ছাপিয়ে যায়। এবং অঙ্কের নিয়মেই, প্রতি বছর মানুষ বৃদ্ধির গতিও বাড়ছে।

পৃথিবীর মধ্যে, ভারতেই সরকারীভাবে জন্ম নিয়ন্ত্রণের কাজ প্রথম শুরু হয়। বাইশ-তেইশ বছর ধরেই অক্লান্ত চেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু ফল বিশেষ পাওয়া যায় নি। অনেকভাবে প্রচার করা হয়েছে। অনেক পুরস্কারের প্রলোভন দেখানো হয়েছে, কিন্তু গ্রামের মানুষ বা শহরের অসচ্ছল মানুষ ব্যাপারটা ঠিক গ্রহণ করতে পারে নি। এ বছরেই প্রথম আর একটা চিন্তা দেখা দিয়েছে, এবার জোর করে বা আইন করে সন্তান জন্ম নির্দিষ্ট করা যায় কিনা।

এই শতাব্দীতে যে কটি নতুন চিন্তার সন্ধান আমরা পেয়েছি, তার মধ্যে, আমার মতে সবচেয়ে নতুন এবং মৌলিক চিন্তা হচ্ছে জন্ম নিরোধ। চন্দ্র-অভিযান দেখে মৌলিক চিন্তা নয়, মানুষ আগেই যেতে চেয়েছিল, এখন পেরেছে। কিন্তু চেষ্টা করে, কিংবা কৃত্রিম উপায়ের সাহায্য নিয়ে মানুষের জন্মরোধ, শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে কলঙ্ক বা বিড়ম্বনা এড়াবার জন্য নয়, সামাজিকভাবে এবং শাসককুলের প্রশ্রয়ে—এ জিনিস মানুষ আগে স্বপ্নেও ভাবে নি। জীবিত মানুষ সরাসরি কাটাকাটি করে মরেছে কিন্তু অনাগতকে হত্যা যেন

একটা নৈর্ব্যক্তিক ঘটনা। তাহলে তো দেবকী কিংবা বসুদেবকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করে রাজা কংস সব ঝামেলা থেকে বেঁচে যেতে পারতো।

অনেক পুরোনো ধারণাই বদলায়। এখন জন্ম নিয়ন্ত্রণ একটি বাস্তব সত্য। তবু অনেকের মনের মধ্যেই একটা খচখচ ভাব আসে। খৃষ্টান মিশনারিরা যখন বলেন, মানুষকে জন্ম নিয়ন্ত্রণে বাধ্য করা একটা পাপ, তখন অনেকেরই মনে হয় ওঁরা ঠিকই বলছেন। মানবিকতা মানে মানবের জন্ম মৃত্যুর স্বাধীনতা। কিন্তু আসলে এটা একটা ফাঁপা, অবাস্তব কথা। একটা ছেলের জন্ম দিয়ে, তারপর তাকে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করে, তারপর তাকে অকারণ যুদ্ধে পাঠিয়ে মেরে ফেলাই বা কি ধরনের মানবিকতা? এটা কি আমরা অস্বীকার করতে পারি যে খৃষ্টান ও বৌদ্ধরাই এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় বড় যুদ্ধগুলো বাধিয়েছে এবং বাধাচ্ছে? কোনো সামরিক সেনাপতি যখন ভজনালয়ে যায়, কেউ কি তাকে হত্যাকারী বলে ধিক্কার দেয়? জীবিত মানুষের নিধন কিংবা অনাদরের চেয়ে অনাগতকে হত্যা করা অনেক সুস্থ চিন্তা।

ডেসমণ্ড মরিস নামে একজন রাগী লেখক বলেছেন, তা যারা জন্ম নিয়ন্ত্রণের বিরোধিতা করে, তারাই আসলে এক নম্বরের যুদ্ধবাজ। তারা যুদ্ধ চায়। কেননা, নির্বিচারে এভাবে জনসংখ্যা বাড়লে অদূর ভবিষ্যতেই পৃথিবীটা মানুষের ভিড়ে গিস্‌গিস্‌ করবে, বাসযোগ্য প্রতিটি ইঞ্চি জমি ভরে যাবে, মানুষের দাঁড়াবারও জায়গা থাকবে না, তখন মারামারি কাটাকাটি করা ছাড়া উপায় কি? এটা একটা অঙ্কের সত্য, যা কিছুতেই ওল্টানো যায় না। পৃথিবীর জনসংখ্যা এখন চার শো কোটি। বর্তমান হারে জনসংখ্যা বাড়লে আগামী শতাব্দীর প্রথম দশকেই পৃথিবীর সংখ্যা হবে সাত শো সত্তর কোটি। অর্থাৎ এখন আমরা মায়া-দয়া দেখিয়ে যে শিশুদের জন্ম দিয়ে যাচ্ছি, তাদের জন্য আমরা কিন্তু খাদ্য ও বাসস্থান রেখে যেতে পারবো না—এটা কী ধরনের মানবিকতা? একটা গোপন কথা

নিয়ে প্রকাশ্যে আলোচনা করলে অনেকের খারাপ লাগে। সত্যিই তো, মানুষের যেটা সবচেয়ে গোপন ব্যাপার—সেটা নিয়ে আজকাল এত আলোচনা, বিবৃতি। কিন্তু উপায় কি? যখন দেখি চার-পাঁচটা লাংটো নোংরা ছেলে ধুলোয় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর তাদেব গর্ভবতী মা তাদেরই একজনকে ধরে চ্যালাকাঠ দিয়ে পেটাচ্ছে, তখন ধীর স্বরে বলতে ইচ্ছে হয়, প্রত্যেক মানুষই ভগবান, তবে আর ভগবানের সংখ্যা বাড়িয়ে দরকার নেই।

যে জনসংখ্যা নিয়ে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, সেই জনসংখ্যা আজ থাকলে. আজকের খাদ্য ও অন্যান্য জিনিসপত্রের উৎপাদনে ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং রীতিমতন একটি সচ্ছল দেশ হতে পারতো! কিন্তু জনসংখ্যার সঙ্গে আমাদের অন্য উৎপাদন পাল্লা দিতে পারছে না। পারবেও না কোনোদিন। কারণ শস্যের উৎপাদন ঠিক দ্বিগুণ করে যাওয়া সম্ভব হবে না, কিন্তু আর পঞ্চাশ বৎসর বাদে আপনি আপনিই মানুষের সংখ্যা প্রতি বছর দ্বিগুণ হতে থাকবে। সুতরাং এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য রাখতে হলে মানুষের সংখ্যার সীমা বেঁধে দিতেই হবে।

এটা প্রত্যেক পরিবারের নিজস্ব বিবেচনার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল এতদিন। কিন্তু পরিবার বলতে আমরা শহুরে শিক্ষিত পরিবার বুঝি। আজকাল সে-সব পরিবারে একটি-ছুটির বেশী বাচ্চা হয় না, কারণ তার বেশী সন্তানের ইংরিজি ইস্কুলে পড়াবার খরচ চালাতে পারবে না। কিন্তু কফি হাউসের সামনে যে মেয়েটি আমার কাছে ভিক্ষে চায়, তার নাম আইমা, তার বাবা থাকে বসিরহাটে, ওরা চোদ্দ ভাইবোন, এর মধ্যে ছটি ছোট ছেলেমেয়েসমেত ওর মাকে ওর বাবা বছরে চার মাস খেদিয়ে দেয়—তখন ওরা শহরে ভিক্ষে করে। ফুটপাথে শোয়। আবার ফসল উঠলে ওরা বাড়ি গিয়ে বাড়ির ভাত খেতে পায়। আইমা এবং তার ভাইবোনদের আমি বছর তিনেক ধরে দেখছি, আইমার মুখখানা অনেকটা অড্রে হেপবার্ণের মতন। তার বয়স এখন তের চোদ্দর বেশী হবে না, মাত্র

কয়েকদিন আগে তাকে কলেজ স্কোয়ারের রেলিং-এর পাশে আবার দেখলাম গর্ভবতা। এই আইমা নামের মেয়েটিকে কিংবা বসিরহাটে তার বাবাকে আমরা কোন 'নিজস্ব বিবেচনা'র ওপর ছেড়ে দিতে পারি!

সন্তানের জন্ম দেবার ক্ষমতার সঙ্গে মানুষের সৃষ্টি ক্ষমতাও জড়িত, এরকম একটা ধারণা প্রচলিত আছে। যে-কারণে হিজড়েদের সমাজে স্থান দেওয়া হয় না। হিজড়েদের প্রজনন ক্ষমতা নেই বলেই তারা কখনো সুস্থ সামাজিক জীবনযাপন করতে পারবে না। এরকম মনে করা হয়। অবশ্য এর কতখানি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে, আমার জানা নেই। আমাদের সমাজে প্যাণ্ট কোট বা সুদৃশ্য পোশাকের আড়ালে যে এখনো কিছু হিজড়ে লুকিয়ে নেই, তা কি আমরা জোর করে বলতে পারি? তারা সমাজের ভারসাম্য টলিয়ে দেয় নি।

তা ছাড়া, সন্তান সৃষ্টি ক্ষমতা বা যৌন-ক্ষমতা না থাকলেও যে কেউ কেউ নিজ শিল্পকার্যে বিখ্যাত হতে পারে, এমন উদাহরণ আছে। যেমন, কবি বোদলেয়ার। পশ্চিমের অতি সভ্যদেশ-গুলিতে হোমোসেক্সুয়াল বা সমকামীর সংখ্যা শতকরা ছ'জন বা তার বেশী। পৃথিবী বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে সমকামীদের তালিকা রীতিমতন সুদীর্ঘ। এসম্পর্কে স্পষ্ট স্বীকৃতি নেবার ব্যাপারেও আজকাল কোনো গ্লানি নেই। অপরাধে অস্কার ওয়াইল্ডের চরম হেনস্থা হয়েছিল, আজকাল বহু দেশেই সেটা অপরাধ বলেই গণ্য নয়। সমকামীদের সঙ্গে প্রজননের কোনো সম্পর্ক নেই, যদিও শিল্পে বা প্রশাসনে তাদের দাপট যথেষ্ট। এই সঙ্গে চিরকুমার বা ব্রহ্মচারীদের কথাও এসে পড়ে। দেশসেবা সংক্রান্ত কাজে এরাই যোগ্যতর এইরকমই প্রচলিত মত। কিংবা অপুত্রক দম্পতিও কোনোকালেই কোনো দেশে কোনো কাজে অযোগ্য বলে বিবেচিত হন নি।

এইসব কথা মনে আসার কারণ আছে। সম্প্রতি ভারতের কয়েকটি রাজ্যে দুটি সন্তানের পর জন্ম-শাসন বাধ্যতামূলক করার জন্য আইনের কথা চিন্তা করা হচ্ছে। এর পক্ষে এবং বিপক্ষে নানারকম কথাও উঠেছে। সম্প্রতি আমি গ্রামে গ্রামে ঘোরার সময় কয়েকটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র দেখতে গিয়েছিলাম। আজকাল অনেক এঁদো গ্রামেও কুঁড়েঘরের মাটির দেওয়ালে 'ছোট পরিবার সুখী পরিবারের' লাল ত্রিকোণ আঁকা বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। পরিবার পরিকল্পনা নিয়ে প্রচার কম চালানো হয় নি। জন্ম-শাসনের জন্য কৃত্রিম বস্তুগুলি শস্তায় বা বিনামূল্যে দেওয়া হয়েছে। নির্বীজকরণের জন্য আর্থিক পুরস্কার, এমনকি রেডিও উপহার দেবার প্রলোভন পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। তবু স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এজন্য ভিড় হয় না। নানালোককে প্রশ্ন করে কিছু জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। আমি ভিড়ের মধ্যে মিশে কান খাড়া করে অপরের আলাপচারি শুনি, চোখ খোলা রেখে অন্যদের ব্যবহার দেখি। চার-পাঁচটির বেশী বাচ্চা হয়ে গেলে এমন চাষী বা মজুরকে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ধরে আনে দালালরা, কারণ তারাও কিছু পায়। সকলের মুখেই কেমন একটা ভীতু-ভীতু ভাব। যদিও অপারেশানটি অতি সাধারণ, ব্যথা-ট্যাথা বেশী লাগে না বলেই জানা গেল। আর একটা অদ্ভুত কথাও শোনা গেল সেখানে। কিছু কিছু বয়স্ক পুরুষমানুষ, যারা সংসারের চাপে বাধ্য হয়ে কিংবা উচিত জেনেই প্রজনন ক্ষমতা বিসর্জন দিয়েছে—তারা নাকি এখন দুপুর রোদ্দুরে মাঠের পাশে উবু হয়ে বসে থাকে, ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকায়, কোনো কাজে উৎসাহ পায় না। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞের মতন মাথা নেড়ে বলতে লাগলো, এমনটিই তো হবার কথা। যে মানুষের পুরুষত্ব নেই, সে আবার মানুষ নাকি? আমার মনে হলো অনেকেই অনেক কিছু জানে। কিংবা না জেনেও গম্ভীরভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে। মন্তব্যকারীদের মধ্যে কয়েকজন বেশ বৃদ্ধ, তাঁদের বর্তমান পুরুষত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া যায় না।

প্রতিটি ক্ষেত্রেই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের পরিচালক বা কর্মীকে বলতে শুনেছি

যে, অপারেশানের পর এরকম প্রতিক্রিয়া হওয়া সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। শারীরিক বা মানসিক কোনোরকম পরিবর্তনই এর ফলে আসার কথা নয়। তবু যে মানসিক পরিবর্তন ঘটছে তার কারণ অশিক্ষা। কিংবা আরও সহজ ভাষায় বলা যায়, মানসিক দারিদ্র্য। যৌনক্ষমতা বা যৌন ব্যবহারে কোনো বাধার সৃষ্টি হলে মানুষ তা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সেখানে তার স্বাধীনতা একেবারে চূড়ান্ত হওয়া দরকার কিংবা শুধু মাত্র সঙ্গী বা সঙ্গিনীর সম্মতির উপর নির্ভরশীল। কিন্তু একাধিক সন্তানের জন্ম দেবার পর, আরও বেশী সন্তানের জন্ম দিতে না-পারার জন্য মনোবেদনা জাগা নিতান্ত ভিত্তিহীন বা সৌখিন বেদনা মাত্র বর্তমান পৃথিবীর পরিপ্রেক্ষিতে এই সৌখিনতাটুকু অনায়াসে বর্জন করা যায়।

হুগলীর একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আমি এক প্রৌঢ়া রমণীর কান্না শুনতে পাই। এই রমণীর নাম যোগোবালা নয়, কিন্তু আমরা তাই বলবো। যোগোবালা সবসমেত ন'টি সন্তানের জন্ম দিয়েছে, এর মধ্যে বেঁচে আছে সাতটি। যোগোবালা তার বাড়ির পুরুষকে না জানিয়েই চলে এসেছিল, সে আর সন্তান চায় না, সে নিষ্কৃতি চায়। ইতিমধ্যে খবর পেয়ে তার স্বামী চলে এসেছে, জোর করে তাকে নিয়ে যাবে। সে এ-সব কৃত্রিম উপায় পছন্দ করে না, এ যেন ভগবানের ইচ্ছেয় বাধা দেওয়া, তাছাড়া কোনো পুরুষ ডাক্তার তার স্ত্রীকে স্পর্শই করতে পারবে না। তার রাগী চেহারা আমি দেখতে পাই। তার চেহারা খুব সুন্দর, অর্থাৎ ঠিক গ্রাম্য চাষীর মতন, একটুও অন্যরকম নয় -তার রাগও সুন্দর। এই রাগকে নিশ্চিত সম্মান জানানো উচিত। যদিও আমি জানি, একে জেলের ভয় দেখালে এর রাগ নিমেষে উপে যাবে।

এই লোকটি পৃথিবীর কোনো খবর রাখে না, দেশ সম্পর্কেও খুব কম জানে—জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে দেশের কি দুর্দশা হচ্ছে না হচ্ছে, সে তার ধার ধারে না। সে শুধু জানে নিজের পরিবারটুকুর কথা। কিন্তু নিজের একগুঁয়েমির জন্য সে তার পরিবারটিরও যে ক্ষতি

করছে সে তা বুঝবে না। মানুষের সব ব্যাপারেই স্বাধীনতা থাকা উচিত। কিন্তু নিজের ছেলেমেয়ে এবং স্ত্রীর ওপরে অত্যাচার করার স্বাধীনতাও কি কারুর থাকবে? কিংবা কে তাকে বাধা দেবে? এই গূঢ় প্রশ্নটির উত্তর আমি চট করে খুঁজে পাই না। অনাহারে অতিষ্ঠ হয়ে কোনো লোক যদি তার শিশুপুত্রকে আছড়ে মারে তাহলেও বিচারক তাকে ছাড়বেন না। তখন এ যুক্তি খাটবে না যে আমার ছেলেকে নিয়ে আমি যা খুশী করেছি। তার নামে হত্যার অভিযোগ আসবে। কিন্তু হত্যা করার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত, সে যদি তার ছেলেমেয়েকে খেতে না দেয়, তাদের লেখাপড়া না শেখায় এবং বছর বছর নতুন সন্তানের জন্ম দেয়—তাহলে কিন্তু কোনো বিচারকই তাকে শাস্তি দিতে যাবে না। এইসব ক্ষেত্রে, সন্তানকে হত্যা করা কিংবা নতুন সন্তানের জন্ম দেওয়া—এর মধ্যে কোন্‌টা বেশী পাপ? যোগোবালা তার স্বামীর নামে মামলা করতে যাবে না কোনোদিন। স্বামীর ঘর ছাড়া দুনিয়ায় আর কোথাও তার অন্ন নেই। সে যদি বছর বছর সন্তান ধারণের গ্লানি আর সহ্য করতে না চায় কিংবা তার জ্যান্ত সাতটি সন্তানকেই ভালোভাবে খাওয়া পরা দিতে চায়, তবে তার উপায় কি? উপায় না থাকলে এইরকম কান্না। শেষ পর্যন্ত যোগোবালাকে তার গোঁয়ার স্বামী টানতে টানতে নিয়েই গেল।

তার স্বামীকে বাধা দেবার ক্ষমতা কারুর নেই। একমাত্র আইনের হাতই তাকে বাধা দিতে পারতো। আমার মনে হলো, আজ না হোক কাল, কিংবা দু'দশ বছর বাদে এইরকম আইনই পৃথিবীর নিয়তি। যদি মানুষকে বাঁচতে হয়।

এই পৃথিবীতে বাবা ও মায়ের স্থান নেবে তাদের দুটি সন্তান তার বেশী আর জায়গা নেই। অনেকে আরও একটি সন্তানের পক্ষপাতী, যদি একজন অকালে ঝরে যায়—এই কারণে। শিশু মৃত্যুর হার এই ভারতবর্ষেও এখন এক-তৃতীয়াংশের কম। ভবিষ্যতে আরও নতুন নতুন ওষুধ আসবে যাতে প্রতিটি শিশুর জীবনই হয়তো

নিশ্চিত করা যাবে। কিন্তু যে জন্মে গেছে, তাকে মেরে ফেলার কোনো ওষুধ যেন কোনোদিন আবিষ্কৃত না হয়।

বহু সন্তানের পক্ষেও কম যুক্তি নেই। সেকালের নারীরা বহু সন্তানবতী হয়েও সুখে থাকতেন। সেকালে শিশু-মৃত্যু বা সূতিকা-রোগ জননীর মৃত্যু যেমন খুবই সাধারণ ছিল, তেমনি অনেক পরিবারে বহু সন্তান বেঁচেবর্তেও থাকতো। তারা এই পৃথিবীকে সমৃদ্ধ করেছে, অষ্টম বা একুশতম গর্ভের সন্তানও দারুণ প্রতিভাবান হয়েছেন। কিন্তু পৃথিবীর অবস্থা এখন অনেক বদলে গেছে। মানুষকে বাঁচতে হয় বর্তমান নিয়ে। কোনো প্রতিভাবানের জন্য প্রতীক্ষা করার কি দিন আছে আর? দুটি বৃহৎ দেশে যত আণবিক অস্ত্র জড়ো করা আছে তা হঠাৎ একদিনে ফাটলে মানুষের যাবতীয় প্রতিভা-ফ্রতিভা ফুঁ হয়ে যাবে।

ফেরার পথে যোগোবালা এবং তার স্বামীর বাড়ির সামনে দিয়েই আসতে হয়। তখনও বাড়ির মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি পুরো মাত্রায় চলছে। একটি মাত্র ঘর, উঠোনের উল্টোদিকে জীর্ণ দেওয়াল। উঠোনে ঘুরঘুর করছে কয়েকটি মুরগী আর ধুলোমেখে খেলা করছে তিনটি শিশু। তাদের খেলার কোনো সরঞ্জাম নেই, গায়ে নেই জামা, নাক দিয়ে গড়াচ্ছে সিক্নি, মাটি খুঁড়ে মেখে কাদায় তাল বানিয়ে তাই নিয়েই মহানন্দে আছে। সন্ধে হয়ে এসেছে, এখনো উনুনে আঁচ পড়ে নি। হঠাৎ বুকের মধ্যে শিরশির করে ওঠে। মনে হয় এ পৃথিবীতে সবাই বেঁচে থাক। এই দুঃখ কষ্ট অপমানের পৃথিবীতেও সবাই বেঁচে থাকুক অন্তত। মৃত্যুর থেকে বেঁচে থাকা সব সময়ই ভালো। তবে, এই দুঃখ কষ্টের ভাগ দেবার জন্য আরও বেশী অনাগতদের ডেকে আনা বোধহয় স্বার্থপরতা।

ধানবাদ থেকে ঝরিয়া পার হয়ে সিন্ত্রি যাবার পথে রাস্তার ডান দিকে চাসনালা খনি। খনিটির মালিক ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টিল কোম্পানি। গেট দিয়ে খনি এলাকায় ঢুকলেই চোখে পড়ে এদিক সেদিক ছড়ানো বিস্তর পুলিশ। এত সব পুলিশ কার জন্য প্রথমটা বোঝা যায় না। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হাঁটা শুরু করার একটু বাদেই মনে পড়ে, আমাদেরই পায়ের নিচে, অনেক নিচে, এই শীতের মধ্যে আরও শীতল হয়ে রয়েছে প্রায় হাজার ফুট কালো নোংরা জল। সেই জলে ডুবে রয়েছে অন্তত ৩৭২ জন কিংবা ৩৭৪ কিংবা ৩৭৫ কিংবা তারও বেশী জন মানুষ। ক্রমশ আরও বেশী পুলিশ, খনিশ্রমিক, টিণ্ডাল এনজিনিয়ার, টেকনিশিয়ান ও আমলাদের দেখা যায়। এখানে প্রচুর লোক, বড় বেশী লোক, কেন এত লোক তা বোঝা যায় না। হঠাৎ দেখলে মনে হয় জায়গাটা একটা পিকনিক এলাকা। নোংরা, ধুলো ওড়া প্রান্তরের এই ভিড়ের মধ্যে বেশী করে চোখে পড়ে বেশ কয়েকজন শ্বেতাঙ্গকে এবং তাদের মাথায় গাঢ় নীল বা গাঢ় খয়েরি রঙের লোহার টুপি। আমাদের দেশের খনি শ্রমিকদের টুপির রং সাদা। ওই শ্বেতাঙ্গরা রাশিয়ান এবং পোলিশ, ওঁরা ত্রাণকার্যে সহায়তা করতে এসেছেন। বড় ছোট আকারের প্রচুর লোহার পাইপ, হোস পাইপ মাটিতে ছড়ানো, তার ওপর দিয়ে সাবধানে হেঁটে এসে পৌঁছোতে হয় খনির দুটি প্রধান প্রবেশ ও নিষ্ক্রমণের পথ অর্থাৎ শ্যাফট্স-এর কাছে। এখানে কিছু দিশি ও বিদেশী পাম্প ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে জলের মধ্যে, পাইপ বেয়ে সেই নোংরা এবং সম্ভবত বিষাক্ত জল গিয়ে পড়ছে দামোদর নদীতে।

সারা দেশব্যাপী এখনো এরকম একটা ধারণা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে যে, খনির মধ্যে ওই জলের নিচে এখনো কোথাও বন্ধ হয়ে আছে

বাতাস, সেখানে টিকেও থাকতে পারে কয়েকটি প্রাণ। কারণ, বড়াধেমো কলিয়ারিতে এইরকমই একটা দুর্ঘটনার পরও ১৭ জন শ্রমিক বেঁচে ফিরে এসেছিল। কিন্তু চাসনালায় প্রকৃত ত্রাণকার্যে যাঁরা ব্যস্ত, দিনের পর দিন এবং রাতের পর রাত পরিশ্রমে যাঁদের চোখের কোণে কালি, তাঁদের উদ্দীপনা এখনো একটুও না কমলেও তাঁদের চলাফেরার মধ্যে সেই তড়িৎগতি নেই, অন্য মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য যেমন থাকে। আমার মনে হলো, ওঁরা সম্ভবত কেউই বিশ্বাস করেন না যে, সলিল সমাধি থেকে কেউ জীবিত ফিরে আসবে।

কেন ফিরে আসবে না?

একথা এখন সকলেরই জানা যে, হেমন্তকুমার নাগ নামে এক বাঙালী ভদ্রলোক ঝরিয়ার রাজাদের কাছ থেকে ইজারা নিয়ে প্রথম এই খনিটি চালাবার চেষ্টা করেন। বছর কয়েক আপ্রাণ চেষ্টা করে, ব্যর্থ হয়ে, তিনি ইস্তফা দেন। সে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা। মাত্র বছর দশেক আগে ইসকো কিনে নেয় খনিটি, প্রচুর টাকা এবং প্রযুক্তিবিদ্যা লাগে এটার মধ্যে। এর মধ্যে আছে বিশ্ব ব্যাঙ্ক এবং বিভিন্ন ইঙ্গ, ফরাসী, জারমান কোম্পানির স্বার্থ ও দেখাশুনো। অন্যান্য খনির তুলনায় এটি রীতিমতন একটা শক্ত খনি, এখানে কয়লার স্তর ৪৫ ডিগ্রি বাঁকা অবস্থায় রয়েছে। তাছাড়া ভেতরটা স্যাঁতসেঁতে এবং গ্যাস ছড়ানো। তবু এত কাঠখড় পুড়িয়ে খনিটিকে চালু করার কারণ এখানকার কয়লার জাত ভালো। কয়লার খনি বলতেই ওপরে একটা গোল চাকা লাগানো কালো লোহার ত্রিভুজের যে ছবিটা আমাদের চোখে ভাসে, চাসনালায় ত' দেখতে পাওয়া যাবে না। শ্যাফট দুটির মুখে সুন্দর রং করা বিরাট বিরাট দুটি ইস্পাতের খাঁচা। এখানে মজুররা গাঁইতি হাতে নিচে নামে না। অধিকাংশ কাজই চলে যন্ত্রপাতিতে। বেশ সাহেব সাহেব ব্যাপার।

হেমন্তকুমার নাগের আমলে এরকম সুযোগ-সুবিধে ছিল না। তিনি

মাটিতে গর্ত করে ঢালু রাস্তা বানিয়ে খনির ভেতরে নামবার ও কয়লা তোলবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি যে অংশটা থেকে কয়লা তুলতেন, সেই খনি অংশটি পরিত্যক্ত হবার পর, কোনো এক সময় ভেতরে আগুন ধরে যায়। খনির আগুন যে কি জেদী, তা খনি এলাকার লোকই জানে। কিছু চেষ্টা হয়েছিল বালি দিয়ে আগুন নেভাবার, কিন্তু সবচেয়ে নিশ্চিত উপায় ছিল খাদগুলো জলে ভরে দেওয়া। ১৩ কোটি গ্যালন জল সেই খাদে ভরে দেওয়া হয়েছিল।

মাথার ওপরে অতখানি জল নিয়ে নতুন চাসনালা খনির কাজ শুরু হয়। প্রায় তিরিশ বছর ধরে সেই জল রয়ে গেছে। পুরোনো জল কাজে লাগে। সেই খাদ্যের মধ্যেই পাম্প বসিয়ে জল টেনে পরিশ্রুত করে সেই জলই পানীয় হিসেবে ব্যবহার করা হতো খনি-কলোনিতে। চাসনালার কোলিয়ারি শ্রমিকরা যে জল পান করে এতদিন বেঁচেছিল, সেই জলই তাদের ডুবিয়ে মারলো।

জলে ভরা খাদ এবং নতুন খাদের মধ্যে ছিল একটি আশী ফুট চওড়া দেয়াল। সেই দেয়ালের কোন্ জায়গায় কীভাবে ফাটল ধরলো সেটা জানতে আরও বহুদিন লেগে যাবে। অনেকে বলছেন, কেন মাত্র আশী ফুট দেয়াল ছিল, কেন দুশো ফুট ছেড়ে রাখা হয়নি। বিশেষজ্ঞরাই এ বিষয়ে ভালো জানেন। কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, আশী ফুট কি কম নাকি ? প্রায় আমাদের মনুমেনটের আধখানা —অতখানি চওড়া দেয়াল ভেঙে জল আসার সম্ভাবনা কি সহজে মাথায় আসে ? মনে হয়, এটা একটা অঙ্কের সমস্যা ! অবশ্য আশী ফুট দেয়ালই ছিল শেষপর্যন্ত কিংবা আরও কমিয়ে ফেলা হয়েছিল, তা বিচার করবেন তদন্ত কমিশন। মাত্র দিন সাতেক আগেই ডিরেকটরেট জেনারেল অব মাইন সেফটির লোকজন খনির অভ্যন্তর পরীক্ষা করে কাজ চালিয়ে যাবার সবুজ সঙ্কেত দিয়ে গিয়েছিলেন। ২৭ ডিসেমবর দুপুর একটা পঁয়তিরিশ মিনিটে যখন প্রথম শিফটের কর্মীরা ভেতরে কাজ করছেন, সেই সময় হঠাৎ একটা বিরাট শব্দের

সঙ্গে সঙ্গে ওপরে উঠে এলো একটা গুঁড়ো কয়লার ঝড় ও ধোঁয়া. মুহূর্তের মধ্যে সেই ঝড় থেমে গেল, ভেতরে হুড়হুড় করে ঢুকতে লাগলো জল। কী সাংঘাতিক সেই জলের তোড় যে মাত্র চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ১৩ কোটি গ্যালন জল এসে ভরিয়ে দিল খনিগর্ভ! বিস্ফোরণের মাত্র কয়েক মিনিট আগে খনির তরুণ ম্যানেজার দৈবাৎ উঠে এসেছেন ওপরে। শব্দ পেয়েই তিনি ফিরে এসে মরীয়া হয়ে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ে ভেতরে নেমে যেতে চান ততক্ষণে জলের উচ্চতা হুহু করে বাডছে, অন্যরা তাঁকে টেনে সরিয়ে আনে। আচম্বিত ঘটনায় তাঁর প্রায় একটা ঘোর লাগার মতন অবস্থা, শুনেছি, দ্বিতীয়বার ওপরে উঠে এসে তিনি অসংলগ্নভাবে হ্যামলেটের লাইন উচ্চারণ করেন।

খনিতে জলবন্দী হয়ে শ্রমিকদের মৃত্যুর ঘটনা পৃথিবীতে বিরল নয়। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি এতখানি জলে এত বড় একটি খনি ডুবিয়ে দিয়ে এতগুলি মানুষকে ডুবিয়ে দেওয়ার ঘটনা অভূতপূর্ব।

শ্যাফটের পাঁচ শো ফিট গভীরে কয়লা কাটার প্রথম সুড়ঙ্গ বা খনির ভাষায় 'হরাইজন'। সেখানে কাজ করছিল ৮০।৯০ জন শ্রমিক। তার অনেক উঁচুতে জল এসে গেছে, সুতরাং সেখানকার শ্রমিকরা জলের অনেক তলায়। দ্বিতীয় হরাইজন হাজার ফুট নিচে, সেখানে ছিল বাকি শ্রমিকরা—সবশুদ্ধ চার শো জনের কাছাকাছি. এর মধ্যে জনা তিরিশেক যে-কোনো কারণেই হোক আগে উঠে এসেছে।

ভূগর্ভে জল ও বাতাসের সহাবস্থান চলে না। ওই বিপুল পরিমাণ জল এসে ভেতরের বাতাসকে তাড়িয়েছে ওপরে। তবে, যেহেতু জল এসেছে দারুণ দ্রুতবেগে, তাই অতিগভীর সুড়ঙ্গের কোনো এলাকার বাতাস হয়তো বেরুবার পথ নাও পেতে পারে, সেখানকার বাতাস জলকে জায়গা দেবে না। সেই এলাকাটুকুতে কয়েকজন শ্রমিকের ঘাপটি মেরে বসে থাকা একেবারে অসম্ভব নয়। এটাই হচ্ছে বহু ঘোষিত 'এয়ার পকেট।' এরকম কোনো এয়ার পকেট

তৈরি হয়েছে কিনা কেউ জানে না, এবং তৈরি হলেও, সেখানে বাতাসের চাপ এত বেশী হতে পারে যে যে-কোনো মানুষেরই ফুসফুস ফেটে যাবে। উদ্ধার কর্মীদের মধ্যে এইসব চিন্তার কালো ছায়া রয়েছে বলেই তাঁদের গতিভঙ্গির মধ্যে সেই বিশ্বাসের তড়িৎ নেই। তাছাড়া, পাম্পগুলো চালু রাখা ছাড়া আর কোনো লম্ফঝম্ফও এখানে সম্পূর্ণ নিরর্থক। নিছক নাটক করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

নাটক অবশ্য এখানে কিছু কিছু হচ্ছে নিশ্চয়ই। দুর্ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়ার পরই কর্মীদের কিছু ক্রুদ্ধ আত্মীয়স্বজন এবং বাইরের লোক ভেতরে ঢুকে এসে মারপিট শুরু করে দেয়। তখন এখানে কোনো পুলিশ ছিল না। এখন প্রায় হাজার খানেক পুলিশ। তার মধ্যেও দল বেঁধে বহু দূর দূর থেকে, ছেলেমেয়ে নিয়ে অনেকে চাসনালা দেখতে এসেছে। নিস্তরঙ্গ ভারতীয় জীবনে বিশেষ কোনো ঘটনাই তো ঘটে না। এখানে মৃত্যুও দর্শনীয়। এখানে মৃতের শোভাযাত্রা দেখেও লোকে প্রণাম করে। ওরা এসেছিল সেই মৃত্যুর চেহারা দেখতে! এসে দেখেছে অবশ্য কিছু পাম্প, কিছু ঝকঝকে জেনারেটার, প্রচুর জীবিত মানুষ এবং সাহেব।

বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্যের প্রস্তাব এসেছে। পোল্যান্ড ও রাশিয়া থেকে উড়ে এসেছেন অভিজ্ঞ খনিকর্মীরা। কিছু পোলিশ কর্মী অবশ্য আগে থেকেই কাছাকাছি ছিলেন। রাশিয়ানদের বড় আকারের পাম্পগুলি চালু করার মধ্যেও অনেক নাটক। মাঝে মাঝেই রটে যায় এই বুঝি পাম্প চালু হলো, কিন্তু হয় না, সময় পিছিয়ে যায়। তারপর দুপুরে পাম্প চালু হলো, সকলের বুক থেকে বেরিয়ে এলো একটা স্বস্তির নিশ্বাস, ঠিক সেই সময় জলমগ্নদের কথা কারুরই মনে থাকে না—যেন পাম্প চালু হবে কি হবে না এটাই যেন বিরাট এক সম্মানের প্রশ্ন। দুপুরের পাম্প বিকেলে আবার বিকল হয়ে যায়। আবার হতাশা।

এরই মধ্যে দেখা যায় উদ্যমী শ্বেতাঙ্গরা একবারও হতাশ হয় না।

মিনি রকেটের আকারে লম্বা সাব মারসিভ পাম্পগুলি। তোলা ও নামানোর সময় তারা আঠার মতন লেগে থাকে, তারা অপরকে কোনো নির্দেশ দেয় না, নিজের হাতে তেল কাদা মাখা যন্ত্রগুলি নিয়ে তারা সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। তলায় কাঠের প্যাল্লা দেওয়া কিংবা কপিকলে চেন লাগানোর জন্য তাদের সাহায্য করে কিছু ভারতীয় খনিশ্রমিক, তাদের যথারীতি মলিন পোশাকে। আমাদের ইনজি-নিয়াররা কোনো যন্ত্রে নিজের হাত লাগান না, দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন কিংবা দোভাষীকে নির্দেশ দেন। বোধ হয় এটাই প্রটোকল। পৌনে চারশো মানুষ যখন জলের তলায়, তারই মধ্যে ইসকো অফিসে ম্যাপ আঁকা হয় শ্মশান ও সমাধিক্ষেত্রের, পুরুত মোল্লা ও পাদ্রীদের ঠিক করে রাখা হচ্ছে। তার পাশেই মেয়েরা সার বেঁধে এসে দাঁড়াচ্ছে আর একটি ঘরের জানলায়, সেখান থেকে তাদের দেওয়া হচ্ছে কমপেনসেসনের টাকা। অনেক টাকা। অত টাকা পাওযার কথা তারা স্বপ্নেও ভাবে নি কখনো।

'ক্ষতিপূরণ' কথাটা অনেক সময় অদ্ভুত কিংবা হাস্যকর শোনায়। একজন শক্ত সমর্থ জোয়ান মরদ মারা গেছে, তার স্ত্রীকে আমরা কোন ক্ষতিপূরণ দিতে পারি? টাকা? একটি মানুষের প্রাণের দাম ঠিক কত টাকা? সেই জন্যই, সিঁথিতে তখনও জ্বলজ্বলে সিঁদুর লাগিয়ে এত শোকে ক্রুদ্ধা রমণী চাসনালায় এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বলেছিল, আমি কিছু শুনতে চাই না, আমার স্বামীকে ফিরিয়ে দিন!

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই, দুর্ঘটনার কারণ যাই হোক না কেন, দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর খুব তাড়াতাড়ি যে কোনো রকম ব্যবস্থা নিয়ে যদি ডুবন্ত মানুষগুলোকে বাঁচানো সম্ভব হতো, তাহলে, সে চেষ্টার ত্রুটি হয় নি। অবশ্য কত তাড়াতাড়ি? ভারত কোকিং কোলের ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রীযুক্ত শর্মা খবর পেয়েই অভুক্ত অবস্থায় দুর্ঘটনার প্রায় ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যেই অকুস্থলে হাজির হন। প্রায় সামরিক প্রস্তুতির মতন দ্রুততায় রাত্তিরের মধ্যেই আশেপাশের

সমস্ত অঞ্চল থেকে-দক্ষকর্মী ও প্রযুক্তিবিদ এবং যতদূর সম্ভব সরঞ্জাম সংগ্রহ করে ফেললেন। দিশি পাম্পগুলো জল ছেঁচার কাজে লেগে যায় পরদিন সকালে। অর্থাৎ প্রায় কুড়ি ঘণ্টা বাদে। এবং জল বার হচ্ছিলও বেশ গরিব পরিমাণে। কুড়ি ঘণ্টা বাদে এই ব্যবস্থায় অতগুলো জলেডোবা লোককে বাঁচাবার আশা পাগলেও করে না। কিংবা পাগলেই করে। অত জল চট করে শুকিয়ে ফেলার জন্য দরকার ছিল একজন অগস্ত্যর।

প্রতি বছর কয়েক হাজার লোক সাপের কামড়ে মরে, বাঘের পেটে যায়, পথদুর্ঘটনার বলি হয়। তাছাড়া আছে বন্যা কিংবা খরা। মৃত্যু আবার এদেশে নতুন কথা কি! তবু এক সঙ্গে প্রায় পৌনে চারশো লোক হঠাৎ খনির মধ্যে চাপা পড়ে যায়, তখন সারা দেশের হৃৎপিণ্ডে একটা ঝাঁকুনি লাগে। একটু অপরাধ বোধও হয়, মনে হয়, ঐ লোকগুলো আমাদের জন্য কাজ করছিল, সারা দেশের প্রয়োজনে কয়লা তুলছিল, ওদের মৃত্যুর কিছুটা দায়ভাগ আমাদের ওপরেও বর্তায়।

হেমন্তকুমার নাগের আমলে পুরোনো কায়দায় যে-খনি থেকে কয়লা তোলা হতো—মাটির নিচে ঢুকে পড়া ঢালু সুড়ঙ্গ, এখানকার ভাষায় যার নাম ইনক্লাইন—সেই জায়গা দেখতে গিয়েছিলাম। এখানে দিশি পাম্প চলছে বলে তেমন ভিড় নেই। বেশীর ভাগ ভিড় শ্যাফটের কাছে, যেখানে বিদেশী পাম্প এবং বিদেশী বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন—কর্তাব্যক্তি ও নিষ্কর্মা দর্শকদের সেখানেই আনাগোনা। এখানে এই ইনক্লাইনের মধ্যে উঁকি দিয়ে গা ছমছম করে, গোল অন্ধকারের মধ্যে কত নিচে নেমে গেছে শ্রমিকরা, ওপর থেকে টেলিফোনে কথা হচ্ছে তাদের সঙ্গে। যারা ঐ নিচে গিয়ে পাম্প চালাচ্ছে, তাদেরই ভাই, বন্ধু ও সহকর্মীরা বিশ বাঁও জলের তলায় লুটোপুটি খাচ্ছে। এখানে গেলেই বোঝা যায়, খনির কাজ কত বিপজ্জনক, ভূগর্ভে গিয়ে খনিজ কেটে তুলে আনা আসলে প্রকৃতির বিরুদ্ধতা, রীতিমতন লড়াই, আকস্মিক মৃত্যু এখানে অস্বাভাবিক

কিছু নয়।

এত বড় দুর্ঘটনায় সারা দেশকে শুধু দুঃখিত থাকলেই হয় না' বিপদগ্রস্ত পরিবারগুলির জন্য কিছু করাও দরকার। টাকা দেওয়া ছাড়া আর কী করার থাকতে পারে। টাকা এবং সহানুভূতি। টাকা জিনিসটা আসলে খারাপ কিছু নয়, অনেক ক্ষেত্রেই অতি উত্তম শোক-নিবারক ওষুধ।

প্রতিটি পরিবার কত টাকা পাবে, তার পাকা হিসেব এখনো হয় নি। মোটামুটি একটা হিসেব নেওয়া যায়। খনিটির মালিক ইসকোর কাছ থেকে পরিবার পিছু এক হাজার, বিহার সরকার পাঁচশো, খনি শ্রমিককল্যাণ দফতর থেকে আড়াই শো, এছাড়া প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন রাজ্য সরকার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দান ও চাঁদা, সারা ভারতের খনিশ্রমিকদের এক দিনের মাইনে এবং দুর্ঘটনায় জীবননাশে বাধ্যতামূলক ক্ষতিপূরণ প্রায় দশ হাজার টাকা। পরিবার পিছু ইতিমধ্যেই মোটামুটি পঁচিশ হাজার টাকার হিসেব পাওয়া যেতে পারে। আরও উঠবে। এছাড়া বিহার সরকার প্রতি পরিবারকে কিছু জমি দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। টাকাটা কে পাবে? বিলিতি আইন অনুযায়ী স্ত্রীই স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু বিলিতি কেতা অনুযায়ী আমাদের শ্রমিক-মজুরদের জীবনযাত্রা নির্বাহ হয় না। বুড়ো বাপ-মা ছেলের আয়ের ওপরেই নির্ভর করে, অনেক সংসারে শাশুড়িই গৃহকর্ত্রী। এখন সুস্থ সমর্থ ছেলে হঠাৎ হারিয়ে যাবার পর, ছেলের বউ কি শ্বশুর শাশুড়িকে এর পরেও অনেকদিন দেখবে? বিদ্যাসাগর মশায়ের অনেক আগে থেকেই এ দেশের সমাজের নিচের তলায় বিধবা-বিবাহের অবাধ প্রচলন আছে। বিধবা স্ত্রী যদি কিছুদিন পর আরেকজনকে বিয়ে করে চলে যায় এবং যেতেই পারে, তার সে নৈতিক অধিকারও আছে, তখন বুড়ো-বুড়ীদের কী হবে? আইন এসব ক্ষেত্রে বধির ও অন্ধ।

যেখানে হঠাৎ টাকা, সেখানেই শকুন। একদিকে যেমন আতঙ্ক,

শোক ও ত্রাণকার্যের ব্যস্ততা, অপরদিকে তেমনি এই সব সন্তপ্ত পরিবারকে ঘিরে কাক-চিল-শকুনের ওড়াউড়ি শুরু হয়েছিল। এটাই জীবনের নিয়ম। ওদের হাত থেকে ছোঁ মেরে টাকা কেড়ে নেবার জন্য শ্যেন দৃষ্টির অভাব ছিল না। সেইজন্যই এখন কর্তৃপক্ষ কাঁচা টাকা হাতে না দিয়ে প্রত্যেক উত্তরাধিকারিণীর নামে অ্যাকাউন্ট খুলে দিচ্ছেন।

মরদরা বেঁচে থাকলে একসঙ্গে যত টাকা তারা চোখেও দেখতো না —সেই টাকার সম্ভাবনায় তাদের স্ত্রী বা নিকট আত্মীয়রা বিহ্বল হয়ে পড়তেই পারে। দূর থেকে অনেকের মনে হতে পারে, শ্রমিক কলোনিতে বুঝি এখনও শোক ও কান্নার ঝড় বইছে। আসলে তা নয়, সেখানে একটা থমথমে ভাব। নিচুর স্বরে কথা এবং একটু টাকা-টাকা গন্ধও পাওয়া যায়। এই নিয়তিবাদী জাতের যে-কোনো পরিবারের হঠাৎ মৃত্যুর চেয়ে হঠাৎ অর্থ-বৃষ্টি অনেক বেশি চমকপ্রদ। কিন্তু তারা জানে না, এই টাকার ব্যবহার। এবং এই সব ধনী বিধবাদের প্রলুব্ধ করার জন্য কিছু কিছু রোমান্টিক প্রেমিকও উপস্থিত হয়েছে। শুনেছি, কয়েকটি মেয়ের ইতিমধ্যেই আবার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। অন্তত বাগদান সম্পন্ন হয়েছে। এটাও জীবনের নিয়ম।

আজকাল শ্রমিক ও কৃষকদের যথাক্রমে শ্রমিকভাই ও কৃষকভাই বলে ডাকার একটা রেওয়াজ চালু হয়েছে। এ আমাদের ভারতীয় চরিত্রের একটা দুর্মর ন্যাকামি। ওদের কাছাকাছি যাওয়ার, ওদের ভাই বলে গ্রহণ করার কোনো ক্ষমতাই আমাদের এখনো হয় নি। সেই জন্যই ওদের টাকা দেওয়া যত সহজ, ওদের সহানুভূতি জানানো তত সহজ নয়। সেই সহানুভূতির ভাষা আমাদের জানা নেই। তাই দলে দলে বিখ্যাত ব্যক্তি, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, বড় বড় কর্ণধার যখন শ্রমিক কলোনিতে সহানুভূতি জানাতে আসে নি, তখন ব্যাপারটা শুধু দৃষ্টিকটু নয়, বিরক্তিকর একঘেয়েমিতে এসে দাঁড়ায়। প্রত্যেকেই দুঃখিত, যথেষ্ট ব্যথিত, কেউ কেউ চোখের জল সামলাতে পারেন নি

—কিন্তু একই বাড়ির সামনে যদি পনেরো দিন ধরে এমন অনেক ব্যক্তি, অসংখ্য লোক ও পুলিশ পরিবৃত হয়ে দাঁড়ান, একই রকম কথা বলেন এবং ঐসব পরিবারগুলিকে একই বাড়ির সামনে যদি পনেরো দিন সেটার মধ্যে আর যাই থাক, শোকের কোনো চিহ্ন থাকে না। কোনো শিশু স্পোর্টসে ফার্স্ট হলে বিখ্যাত ব্যক্তিরা তার গাল টিপে আদর করে হাতে কমলালেবু তুলে দেন। কোনো শিশুর বাবা মারা গেলে তারও গাল টিপে হাতে কমলালেবু দেবার একই ব্যবস্থা।

খনি দুর্ঘটনার কথা শুনলে আমাদের শুধু শ্রমিকদের কথাই মনে পড়ে। দূর থেকে আমাদের চোখে ভাসে কয়লার গুঁড়ো লাগা পোশাকে কালো কালো মানুষ। কিন্তু প্রত্যেক খনিতেই থাকে কিছু বাবু, ইনজিনিয়ার, অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার, ম্যানেজার ইত্যাদি অর্থাৎ যাঁরা অফিসার। চাসনালার মতন একটি আধুনিক সরঞ্জাম-সম্পন্ন খনিতে এরকম অফিসারের সংখ্যাও কম নয়। দুর্ঘটনার একটু পরেই এখানে যে বাইরের কিছু লোক এসে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে, তাদের প্রধান আক্রোশ ছিল এই যে, বাবুশ্রেণীর কর্তব্যকর্মে অবহেলার জন্যই এতগুলি শ্রমিকের প্রাণ নষ্ট হলো! তাদের ইট-পাটকেল ছোঁড়া অনেকটা থেমে ছিল এই কথা শুনে যে, শুধু শ্রমিক নয়, অন্তত তিরিশজন অফিসারও জলে ডুবে আছে। আগেই উল্লেখ করেছি, দুর্ঘটনা ঠিক কোন কারণে ঘটেছিল, সম্পূর্ণ জল-কাদা পরিষ্কার হওয়ার আগে তা নির্ণয় করা শিবের বাবারও অসাধ্য। বিশেষজ্ঞরা খনিগর্ভে নেমে স্বচক্ষে দেখে তবেই বুঝতে পারবেন—এখন যে-যা বলছেন, সবই আন্দাজে ঢিল ছোঁড়া। এবং এ কথাও ঠিক, অন্তত তিনজন অফিসার সেদিন নোংরা জলে দমবন্ধ হয়ে মরেছেন, যাঁরা সেদিন ঐ সময়ে খনির মধ্যে না থাকতেও পারতেন। সেই রকমই এক অফিসারের একটি চার বছরের ছেলের ধারণা, তার ড্যাডি খুব ভালো সাঁতার জানে। সে শুনেছে, খনির ভেতরে জল ঢুকে গেছে। তার ধারণা তার ড্যাডি সেই জল সাঁতরে পার হচ্ছে। সে বারবার প্রশ্ন করে, এত দেরি হচ্ছে কেন? বাবার এত দেরি

হচ্ছে কেন, মা ? কে এই শিশুকে উত্তর দেবে ?

অনেককেই চোখ কুঁচকে প্রশ্ন করতে শুনি, সত্যিই কি ৩৭২, না—? যে-কোনো বড় দুর্ঘটনার পরই কর্তৃপক্ষের প্রচারিত সংখ্যা সম্পর্কে জনসাধারণের মনে একটা সন্দেহের ভাব থাকে। এটা চলে আসছে সেই ব্রিটিশ আমল থেকে। দাঙ্গা, বন্যা, পুলিশের গুলিচালনা কিংবা গ্রেফতার সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকার যে তথ্য দিতেন, সাধারণ মানুষ কোনোদিন তা বিশ্বাস করে নি। জালিয়ান-ওয়ালাবাগে নিহতের সংখ্যা সম্পর্কে নানা মতান্তর এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।

যে-কোনো দুর্ঘটনার পরই, এক ধরনের লোক নিহতের সংখ্যা খুব বাড়িয়ে বলতে, কিংবা ভাবতে, ভালোবাসে। যেন, চারশোর বদলে এক হাজার লোক মারা গেলে ট্রাজেডিটা আরও বিরাট হয়। কোনো কোনো বিদেশী রাষ্ট্র, যারা ভারতের প্রতি তেমন বন্ধুভাবাপন্ন নয়, নাকি বেতারে চাসনালায় ডুবে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা অনেক বাড়িয়ে বলেছে। তাদের কোনোই নির্ভরযোগ্য সূত্র নেই। আবার কোনো কোনো মহল থেকে যে প্রকৃত সংখ্যা থেকেও কিছু কমিয়ে বলার উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তাও অস্বীকার করা যায় না।

ঠিকঠাক সংখ্যাটা জানার উপায় কী ? প্রথম দিনের হাঙ্গামার পর হাজিরা খাতাটা কিছুক্ষণের জন্য উধাও হয়ে যায়। পরে পুলিশ শ্রমিক কলোনিতে খানাতল্লাস করে খাতাটি উদ্ধার করে। এর মধ্যে খাতাটি কোনোরকম জখম হয়েছে কিনা তা আমি জানি না। খাতাটি এখন কোনো গোপন সুদূর জায়গায় সরিয়ে রাখা হয়েছে।

প্রথম শিফট বা খনির ভাষায় 'এ' শিফটে চারশোর কিছু বেশী খনিশ্রমিক ও অফিসার নিচে নেমেছিল, এরকম জানানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় তিরিশ জন, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ওপরে উঠে আসে। সেই হিসেবে হতভাগ্যের সংখ্যা ৩৭২, এর মধ্যেও আবার জনৈক ভাগ্যবান কয়েকদিন পরে (কেন কয়েক দিন পরে কে জানে ?) এসে জানায় যে, সে বেঁচে আছে। নিয়মিত শ্রমিক

ছাড়াও ঠিকাদাররা কিছু কিছু ঠিকে শ্রমিক কখনো কখনো নামায়, সেদিন ঠিক কজন ছিল তা জানার ব্যবস্থা এখনো হয় নি। এ পর্যন্ত তিনজনের উল্লেখ পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষের দ্বারা প্রকাশিত সংখ্যার মধ্যেই একজন দুজনের গরমিল কেউ গায়েই মাখছে না যেন। এত ডামাডোলের মধ্যে আরও একটা দুটো লোক মরলো কি বাঁচলো, তাতে কী যায় আসে? যদিও বিশ্ববিখ্যাত ট্রাজিডিগুলি একজন বা দুজন লোককে নিয়েই।

খাতায় যতজন লোকের নাম থাকে, তারা সকলেই যে সত্যিই খনিতে নেমেছে, তা জোর দিয়ে কেউ বলতে পারেন না। মাথা গুণতি হয় টুপি আর লণ্ঠন দিয়ে। নিচে নামবার আগে খনি-শ্রমিকরা অফিস বাবুদের কাছ থেকে একটা করে টুপি আর লণ্ঠন নিয়ে যায়। সাধারণ বুদ্ধিতে মনে হয়, সেই টুপি আর লণ্ঠনের ঘরটি হবে শ্যাফটের মুখেই—যাতে সেই ঘরে ঢুকে মাথায় টুপি পরে হাতে লণ্ঠন ঝুলিয়ে শ্রমিকরা সরাসরি অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে যাবে। সেইরকমই বেরিয়ে আসবার সময় সেই ঘরে টুপি-লণ্ঠন জমা দিয়ে বেরিয়ে এলেই বোঝা যাবে, সেদিনের মতন লোকটি জীবিকা অর্জন করে বেঁচে ফিরে এলো।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি যে ব্যবস্থাটি মোটেই সেরকম নয়। টুপি-লণ্ঠন ঘরটি শ্যাফট থেকে বেশ দূরে। অনেক সময় একজন শ্রমিক গিয়ে তার গ্যাংয়ের অন্য সকলের টুপি-লণ্ঠন একসঙ্গে চেয়ে নিয়ে আসে এবং তারা সকলেই নিচে নামে কিনা, তা কে দেখছে? যে-কোনো খনিতেই মাটির ওপরে লণ্ঠন হাতে নিয়ে টুপি পরিহিত দু-চারজন শ্রমিককে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়, এমন কি দিনের বেলাতেও। মাটির অভ্যন্তরে যাদের ডিউটি, তাদের মধ্যে কারুকে কারুকে কখনো মাটির ওপরে অন্য কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায়, যা হয়তো ঠিক খনিসংক্রান্ত কাজই নয়। ম্যানেজারের বাড়ির ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর পচলে তৎক্ষণাৎ তা পরিষ্কার করার জন্য চার-পাঁচজন লোক জুটে যায় ঠিকই। জানি, এরকম ব্যাপার সব

জায়গাতেই, যে-কোনো চাকরির জগতেই একটু আধটু হয়—কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ কোনো দুর্ঘটনা ঢুকে পড়লেই হিসেবের গোলমাল হয়ে যায়। যদি চাসনালা দুর্ঘটনায় প্রথম ঘোষণা অনুযায়ী ডুবন্তের সংখ্যা ৩৭২-ই সত্যি বলে মেনে নিই, তবু স্বীকার করতে হবে, এই সংখ্যাটিকে শেষ পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার মতন সত্যের জোর কারুর নেই। আমি নিজেই একটু আগে লিখেছি ভেতরে নেমেছিল চারশোর কিছু বেশী, আধ ঘণ্টা আগে উঠে এসেছিল প্রায় ত্রিশ জন—এই 'কিছু বেশী' আর 'প্রায়ের' মধ্যেও টুপটাপ করে দুটো একটা প্রাণ খসে পড়তে পারে।

জল সেচে ফেলার পর ··সে কথা ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। এই রকম জলমগ্ন খনিতেই আগে ত্রাণকার্য করেছেন, এরকম কর্মীর বুক থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাই। এ পর্যন্ত কত মিলিয়ান গ্যালন জল তোলা হলো, তার একটা হিসেব আমরা ঠিকঠাক পেয়ে যাচ্ছি। রোমাঞ্চ-কাহিনীর শেষ অধ্যায়ের মতন, যেন ১০০ মিলিয়ান গ্যালন জল পাম্প করে বেরুবার পরই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে! কিন্তু, বিশেষজ্ঞদের মতে, আসল সমস্যা শুরু হবে তার পরই যে-প্রাণান্তকর পরিশ্রমে সমস্ত শ্রেণীর কর্মী জল তোলার কাজে ব্যস্ত, তাতে এক এক সময় ভয় হয়, এই অতিরিক্ত স্নায়ুর চাপে এদের মধ্যেই কেউ না মারা যায়। একটি ইনক্লাইনের প্রবেশ মুখের বাইরে একটি নোটিশ চোখে পড়ে। ত্রাণ-কর্মীদের কী সাবধানতা গ্রহণ করতে হবে, তার নির্দেশ। তার মধ্যে একটি এই, পাখির খাঁচা সঙ্গে নিয়ে যেতে যেন কেউ না ভোলে। সুড়ঙ্গ পথে যারা পায়ে হেঁটে নেমে গেছে, তাদের সঙ্গে আছে খাঁচায় ভর্তি মুনিয়া পাখি, বিষাক্ত কারবন মনোকসাইড-এর সামান্য চিহ্নেই ঐ পাখিগুলি ঢলে পড়বে। হঠাৎ মনে পড়ে যায়। মানুষের প্রাণকেও কেউ কেউ প্রাণপাখি বলেছে, এই দেহটা একটা খাঁচা। এইরকম অনেক পাখি অনেক বড় বড় খাঁচার মধ্যে ডুবে আছে ঐ জলের তলায়।

সেই খাঁচাগুলিকেও খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। জল নিঃশেষ হয়ে যাবার পরও থেকে যাবে বালি আর কয়লার গুঁড়ো মিশ্রিত গভীর নোংরা পাঁক। সেখানে কোন যন্ত্রের জারিজুরি চলবে না। সেই পাঁকের মধ্যে আবার নামিয়ে দিতে হবে কিছু জীবিত মানুষকে: তারা নিজের হাতে ঘেঁটে ঘেঁটে পচাগলা মাংসের মধ্য থেকে তুলে আনবে দু একটা হাড়।

খনি এলাকার মধ্যে এখন শিশু বা নারীদের দেখা যায় না। জল তোলা শেষ হয়ে যাবার পর হয়তো তারা দলে দলে ছুটে আসবে, যদি না রক্ষীরা তাদের আটকায়। তারা আসবে তাদের প্রিয়জনদের শেষবার এক ঝলক দেখবার জন্য, কিংবা শনাক্ত করার জন্য। তারা দেখবে কিছু মাথার খুলি কিছু ভাঙা হাড়—যেগুলি সবই একরকম দেখতে। প্রচুর আয়োজনে জল ছেঁচে ফেলার যে উত্তেজনা, তা এই মূল্যবান খনিটিকে আবার চালু করার জন্য যতখানি প্রয়োজনীয়, ততখানি নয়, ওই ৩৭২টি দেহ উদ্ধারের জন্য।

নানারকম পাম্প, হোস, লোহার পাইপ ইত্যাদি পেরিয়ে খনি এলাকা থেকে বেরিয়ে এলে, শ্রমিক কলোনির পাশ দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে, চোখে পড়ে, উঠোনে খাটিয়ায় বসে রোদ পোহাচ্ছে কোনো বৃদ্ধ, ঈষৎ ফোলা-চোখ কোনও রমণী হেঁটে যাচ্ছে এ বাড়ি থেকে অন্য বাড়ি, ধুলো-ওড়া মাঠে দাগ কেটে ছক্কা নওলা খেলছে কয়েকটি বালিকা। আরও একটু এগিয়ে এসে, বড় রাস্তায় পড়লে দেখা যায় চীনাবাদামওয়ালা বসে আছে, তার পাশেই একজন বিক্রি করছে গলাবি রেউড়ি, তাদের সামনে ভিড় করে আছে কয়েকটি শিশু। দূরে কোথায় যেন মাইক্রোফোনে কাওয়ালি গান ভাসছে।

জীবন থেমে থাকে না।

অবিনাশ আমাকে ওরকম অপমান করে গেল, আমি ওর ওপর ভয়ংকর প্রতিশোধ নেবো ঠিক করলুম। প্রতিশোধের কথা ভাবতে ভাবতে আমার এমন রাগ এলো শরীরে, যেন সমস্ত শরীরের বিষম জ্বর; কিন্তু আমাকে ঠাণ্ডা মাথায় কাজ করতে হবে। বেশী রাগ করলে আমারই ক্ষতি, তাহলে অবিনাশই জিতে যাবে—অবিনাশই প্রতিশোধ নেবে আমার ওপর।

মাথা ঠাণ্ডা করার জন্য আমি খবরের কাগজ পড়া শুরু করি। তখন আবার অবিনাশকে ছেড়ে পৃথিবীর আরও অনেকের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছে হয়। এত প্রতিশোধের চিন্তায় অবশ্য আমার সামান্য হাসিও পায়, তারপর চায়ের বদলে এক কাপ কফি খাবার শখ হলো হঠাৎ। গৌরীদের বাড়িতে গিয়ে একসময় কফি খেতাম। গৌরী, তুমি সাবধান, জানো না তোমার কি বিপদ ঘনিয়ে আসছে।

বাথরুমে দাড়ি কামাতে গিয়ে গলাটা খরখর করে, শীতের সময় সাবান লাগতে না লাগতে শুকিয়ে যায়। আসলে ব্লেডটা পুরোনো। এই একটাই শৌখিনতা আছে আমার, সস্তা ব্লেডে দাড়ি কামাতে পারি না। কয়েকদিন ধরেই ব্লেড কিনতে ভুলে যাচ্ছি। কিন্তু এখন এই অবস্থায়, মুখে সাবান-মাখা, জুলপির কাছে খানিকটা কামানো। আমি কি করবো? বেরিয়ে গিয়ে এখন তো আর ব্লেড কিনে আনা যায় না, অথচ সেফটি রেজারটা টানতে গেলেই গালে অসম্ভব জ্বালা করছে; প্রায় কান্না এসে যাবার মতো। আমারই ভুলের জন্য এই আমার কষ্ট, কিন্তু নিজের ওপর বেশীক্ষণ রাগ করা যায় না, তাই অবিনাশের প্রতি রাগটা আবার ফিরে এলো। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অবিনাশের কথা ভেবে আমার মুখে বেশ খানিকটা ক্রোধ ও হিংস্রতা জেগে উঠলো। আমি ভুরু দুটো কুঁকড়ে, বাঁ চোখটা

ছোট করে ঠোঁট কামড়ে ভয়ংকর মুখে খুনী সেজে তাকিয়ে রইলুম। হঠাৎ খেয়াল হলো, ছেলেমানুষের মতো আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভেংচি কাটছি দেখলে বড় বৌদি হয়তো হেসে উঠবেন। তাড়াতাড়ি দরজায় ছিটকিনি তুলে দিলাম। এইবার আমি আবার আয়নার কাছে, এই আয়নাটাই অবিনাশ, এর সামনে দাঁড়িয়ে আমি এখন প্রকৃত খুনী। নিজের মুখে যদিও এখন অর্ধেকটা সাবান লেগে আছে, কিন্তু আয়নার ওপাশে আমার মুখ পরিষ্কার এবং কঠিন। নিজের ওরকম চেহারা দেখে আমারই ভয় করতে থাকে, রাগের সময় আমার চোখ ওরকম ভয়ংকর ঠাণ্ডা ও মর্মভেদী হতে পারে, আগে তো জানতুম না। ডান হাতে সেফটি রেজারটা ছুরির মতো তুলে ধরা। এই রকমভাবে অবিনাশের সামনে দাঁড়াল…

হঠাৎ মনে পড়লো, দার্জিলিঙে গিয়ে আমি একবার একটা ভোজালি কিনেছিলাম। বেশ বড়ো সাইজের, সুন্দর চামড়ার খাপে মোড়া। কিছুদিন সেটাকে ঘর সাজাবার জন্য ঝুলিয়ে রেখেছিলাম দেয়ালে, তারপর ধুলোয় ওর খাপটা ময়লা হয়ে যেতে দেখে বাক্সে ভরে রেখেছি, ওটাকে তো কখনও ব্যবহার করাই হয়নি। কোনো রকমে দাড়ি কামানো শেষ করে বাক্স খুলে ভোজালিটা ধার করলুম। এখনো বেশ চকচকেই আছে, রাখার সময় বোধহয় বুদ্ধি করে ভেসলিন মাখিয়ে রেখেছিলাম। ফলাটার চারপাশে হাত দিলেই বোঝা যায় বেশ ধার। এরকম ধারালো জিনিসে হাত দিলেই শরীর কেমন শিরশির করে। ব্লেডে ধার না থাকলে বিরক্ত লাগে, কিন্তু ছুরিতে অতটা ধার থাকা যেন সহ্য হয় না। শুধু চকচকে এবং বাঁকানো ফলা থাকাই যথেষ্ট ছিল। সমস্ত শরীরে অসহ্য অপমানের রাগ, হাতে মারাত্মক ভোজালি—এ কি অন্যরকম চেহারা আমার আজ। এই অস্ত্রটা কিনেছিলাম ছ-সাত বছর আগে কোনো উদ্দেশ্য ছিল না—খাপ শুদ্ধ ছুরিটা দেখতে বেশ সুন্দর ছিল বলেই কিনেছিলাম? তখন কোনো সুন্দর জিনিস দেখলেই আত্মসাৎ করার ইচ্ছে হতো। গৌরীকে পাবার জন্য তখন যেমন উন্মুখ হয়েছিলাম। গৌরীকে ধরার

চেষ্টায় আমার হাত দুটো তখন কম ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে!

কিন্তু, এই ভোজালি দিয়ে অবিনাশকে কি আমি খুন করবো না কি? ঠিক অতখানি ধরা পড়ার অবশ্য ভয় নেই। জীবনে হাজার হাজার গোয়েন্দা-গল্প পড়েছি, ভালো ভালো বইতে দেখেছি,—খুনীর কাজ প্রায় নিখুঁত, শুধু সামান্য একটা ভুলের জন্য শেষ পর্যন্ত ধরা পড়েছে। আমি আগাগোড়া ওদের কারুকে অনুসরণ করে, সাবধানে শুধু সেই ভুলটা এড়িয়ে যাবো। তাহলে কে ধরবে? না, ওসব ধরা-টরা পড়ার কথা আমি ভাবি না। কাগজেও তো দেখছি, বাংলাদেশে বছরে গড়ে সাড়ে চারশো খুন হয়, তার মধ্যে মাত্র শ দেড়েক খুনী ধরা পড়ে। তাহলে আমাকে ধরা, আমি সব সময়েই সংখ্যাগরিষ্ঠদের দলে!...অবিনাশকে খুন করার অবশ্য অন্য একটা বিপদ আছে, যদি ওঁকে খুন করার পর আমার অনুতাপ আসে? সে এক ঝঞ্ঝাট! অনুতাপে আমি জ্বলে পুড়ে মরছি, প্রতিটি নিশ্বাস দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরুচ্ছে, কয়েক মন বোঝা করে বেড়াবার মতো বুকের মধ্যে গোপনতার দুঃখ, তাহলে অবিনাশই জিতে যাবে। অপমানের পর সেটা হবে আবার অবিনাশের নিজস্ব প্রতিশোধ।

তাছাড়া সত্যিকথা বলতে কি অবিনাশের সামনে আমি যখন ছুরি তুলে দাঁড়াবো—তখন যদি হঠাৎ গৌরী এসে পড়ে, নিশ্চয়ই গৌরী আমাকে দেখে হি-হি করে হেসে উঠবে। হাসতে হাসতে দুলে দুলে উঠবে, হাসির দমকে মুখচোখ লাল হয়ে যাবে, বলা যায় না—বোধহয় আমার আর অবিনাশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাসি কুলকুচো করে বলবে, ইস্ বীরপুরুষ, আমাকে মারো তো, দেখি কতখানি সাহস হয়েছে আজকাল! সেই বিশ্রী নাটকীয় পরিস্থিতিতে আমি কি করবো, ঠিক করাই মুশকিল! অবিনাশটা নিশ্চিত সেই সুযোগে মিটি-মিটি হাসবে। পেশাদারী খুনীদের মতো ধাক্কা মেরে আমি মাঝখান থেকে গৌরীকে সরিয়ে দিতেও পারবো না, কারণ গৌরীর শরীর আর আমি কখনো ছোঁবো না, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। না ছুঁয়েও, ছুরির এক খোঁচায় গৌরীকে সরিয়ে দেওয়া যায়, কিংবা ছুরির

ভোঁতা দিকটা দিয়ে ওর মাথায় মারলেই অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাবে! এমন আর শক্ত কি, এই তো আমি ভোজালিটা ধরে আছি, কব্জিটা ঘুরিয়ে নিলেই উল্‌টো হয়ে গেল, সঙ্গে সঙ্গে মারলুম গৌরীর মাথায়। আমার হাত তোমাকে আর কখনো ছোঁবে না, গৌরীকে বলেছিলাম, ছুরি দিয়ে ছুঁলে প্রতিজ্ঞা নষ্ট হয় না।

কিন্তু গৌরি যে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত হাসবে, সেইটাই সমস্যা। গৌরীর ওপর আমার কোনো রাগ নেই, তবে আমার শখ হয় গৌরীর মনে দুঃখ দিতে। কিন্তু কোনো অস্ত্র দিয়ে মনের মধ্যে দুঃখ দেওয়া যায়, তাও তো জানি না। শরীরে আঘাত করার ঠিক কোনো কারণ নেই। গৌরী শেষ মুহূর্তেও আমাকে বিশ্বাস করবে না, কারণ ও জানে আমি কাপুরুষ। ওর ধারণা, আমি জীবনে কখনো কোনো দুঃসাহসের কাজ করতে পারবো না। যে আমাকে হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত কাপুরুষ বলে জানে, তার সামনে কি আমি কখনো সাহসী হয়ে উঠতে পারবো?

ছেলেবেলায় একবার তখন দশ-এগারো বছর বয়েস আমার। খুব ঘুড়ি ওড়াবার শখ ছিল, ছোটমামার পকেট থেকে পয়সা চুরি করে-ছিলাম। না, একবার নয়, তার আগেও দু-তিনবার ছোটমামার পকেট থেকে সিকি তুলে নিয়েছি, তিনি একটু উদাসীন প্রকৃতির লোক বলে হয়তো খেয়াল করতেন না। একদিন সদ্য তাঁর পকেটে হাত ঢুকিয়েছি, তিনি এসে পড়ে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে ফেললেন। আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ছোটমামা আমার সামনে এসে দাঁড়ালেন। চড়-চাপড় বকুনি কিছুই দিলেন না, শুধু ঠাণ্ডা চোখ তুলে তাকিয়ে ভারী গলায় বললেন, এরকম কাজ জীবনে আর কখনো করো না।

মাঝে মাঝে আমার কাছে দু-এক আনা চেয়ে নিয়ে যেও—ছোট-মামা ঐ ঘটনা আর কারুকে বলেন নি, জীবনে আর কখনো উল্লেখও করেন নি। তারপর কুড়ি বছর কেটে গেছে সেই পকেট মারার পর থেকে আমি আর পকেট মারা শিখিনি, আমি বড় চোর

কিংবা ব্যাঙ্ক-ডাকাত কিংবা কালোবাজারি কিছুই হইনি। এখন অন্যদেরই মতো সাধারণ মানুষ, এমনকি দোতলা বাসে আমি একদিন একটা মানি ব্যাগ কুড়িয়ে পেয়েছিলাম, তার মধ্যে প্রায় তিনশো টাকা ছিল, এবং মালিকের নাম লেখা কার্ড ছিল বলে আমি টাকা-শুদ্ধ ব্যাগ ভদ্রলোকের বাড়িতে ফেরৎ দিয়ে প্রভূত কৃতজ্ঞতা এবং পুণ্য সঞ্চয় করেছি। ছোটমামার ছেলেটা একটু বখাটে ধরনের হয়েছে, সে আমার কাছ থেকে প্রায়ই দু-পাঁচ টাকা নিয়ে যায়, কিন্তু এত সবের পরেও, এখনও আমি যখন ছোটমামার ঠাণ্ডা চোখের সামনে দাঁড়াই, আমার ভঙ্গি অবিকল চোরের মতো সঙ্কুচিত, আমি ছোটমামার চোখের দিকে আজও তাকাতে পারি না।

আমি কখনো কোনো সাহসের কাজ করিনি তা নয়, কিন্তু গৌরীর কাছে কাপুরুষ বলে চিহ্নিত হয়ে আছি। একবার, সেই যখন গৌরীর ছোট বোন শান্তা জলে ডুবে যায়…। বারাসতে পিকনিকে গিয়েছিলাম, উনিশশো চুয়ান্নোর শীতে দলবল মিলে অনেকে। শান্তা বয়সে তখন সাত, শান্তাকে নিয়ে আমি আর গৌরী বাগানের অনেক ভেতরে চলে গেছি, একটা ছোট্ট পাড়-বাঁধানো টলটলে পুকুরের পাড়ে বসেছি,—আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, আমার আর গৌরীর বসে থাকা, গৌরী খুব চড়া হলুদ রঙের শাড়ী পড়ে ছিল, কমলা রঙের ব্লাউজ গৌরীর রং খুব ফর্সা বলে ও পোশাকের রং নিয়ে লণ্ডভণ্ড খেলা খেলতে ভালবাসে, আমি বোধহয় একটা কর্ডের প্যাণ্ট ও গেঞ্জি পড়েছি, গৌরী শাড়ী থেকে চোর কাটা তুলছে, আমি এক টুকরো নারকেল চিবিয়ে সাদা ছিবড়েগুলো ফু-র-র করে উড়িয়ে দিচ্ছিলাম। আমাদের সেই বসে থাকার দৃশ্যের মধ্যে শান্তাকে দেখতে পাচ্ছি না। শান্তা ছিল না, শান্তা টোপাকুল কুড়োতে কুড়োতে কখন জলে পড়ে গেছে। হঠাৎ শব্দ পেলাম, পাড়ে থেকে বেশ খানিকটা দূরে জলের আলোড়ন এবং শান্তার ক্ষীণমুষ্টি। তৎক্ষণাৎ দুজনে দাঁড়িয়ে উঠেছি, গৌরী হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে অন্যরকম গলায় তীক্ষ্ণভাবে ডেকে উঠলো, সুনীলদা!—মনস্থির করতে

আমার দেরী হয়নি। আমি এক ঝটকায় গৌরীকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে বাগানের মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে চিৎকার করছিলুম, অবিনাশ! তাপস! কেষ্টবাবু! কেষ্টবাবু! শিগগির—! আমার সেই চিৎকার এমন অসম্ভব উন্মত্ত ছিল যে, বোধহয় তিনশো মাইল দূর থেকেও শোনা গেছে।

এতক্ষণে গৌরী নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে, এবং কেষ্টবাবু এসে লাফিয়ে পড়ার মধ্যে শান্তাকে গৌরীই প্রায় নিয়ে এসেছে পারের কাছে। শান্তা মরেনি। অল্প চেষ্টাতেই ভালো হয়ে ওঠে। বিপদ কেটে যাবার পর আমরা যখন সবিস্তারে গল্প করছি, আমি খানিকটা কৃতিত্ব নেবারও চেষ্টা করছিলুম, আমি কি রকম মাথা ঠাণ্ডা রেখে মুহূর্তের মধ্যে দলবলকে ডেকে জড়ো করতে পেরেছি—হঠাৎ গৌরী আমাকে থামিয়ে দিয়ে শ্লেষের সঙ্গে বললো, থাক, থাক, বীরপুরুষ। খুব বোঝা গেছে গলার জোর ছাড়া আর কিছুই নেই! সকলে একথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। আমার মুখের ওপর সপাং করে চাবুকের আঘাত পড়লো যেন। এতক্ষণে আমি একবারও ভাবিনি, আমি কোন কাপুরুষতার কাজ করেছি! আমি যে সাঁতার জানি না—তা তো সবাই জানে? শান্তার জন্যে আমি নিজে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লে কী ভাল হতো? আরও কিছু বিপদ বাড়তো। সাঁতার না জানা দোষের হতে পারে, কিন্তু সাঁতার না-জেনেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়া কি খুব গৌরবের? সাঁতার জানি না বলেই আমি পুকুরে না নেমে ছুটে গেছি অন্যের সাহায্যের জন্য। আমার কাছে সেইটাই মনে হয়েছিল সবচেয়ে স্বাভাবিক। কিন্তু সকলেরই চোখে সেটা হাস্যকর ও কাপুরুষতা বলে মনে হয়েছে।

তারপর আমি গোপনে সাঁতার শিখে নিয়েছি। এখন আমি অনায়াসে যে-কোনো পুকুর এপার-ওপার হতে পারি, কিন্তু এ পর্যন্ত আর কাউকে জল থেকে উদ্ধার করার সুযোগ পাইনি। এমন কি গৌরীর সঙ্গেও আর কোনো নির্জন জলাশয়ের পাশ দিয়ে হেঁটে যাবার সুযোগ গৌরী আমাকে আর দেবে না যাতে আমি নিজেই

ওকে ধাক্কা দিয়ে জলে ফেলে পরে আবার উদ্ধার করে বারত্ব দেখাতে পারি।

শান্তা বেঁচে উঠেছিল বলেই, সে ঘটনা গৌরী বেশী দিন মনে রাখেনি। কিন্তু পরের আর একটি ঘটনায় গৌরীর বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে যায়। রাজা বসন্ত রায় রোডের এক গানের জলসা শুনে ফেরার পথে, তখন রাত দশটা, দোতলা বাস থেকে আমি আর গৌরী নেমে পড়েছিলাম এসপ্লানেডে। ইচ্ছে ছিল, গৌরীর সঙ্গে ময়দানের অন্ধকারে কিছুক্ষণ বসি। তখন আমি খুব বেশী অস্থির ধরনের ছিলাম। তখন আমার অদ্ভুত ধরনের বিশ্বাস ছিল, কোনো মেয়েকে কোনো আন্তরিক কথা বলতে গেলে সেই সময় তাকে জড়িয়ে ধরতে হয়। বুক স্পর্শ না করে বুকের মধ্যে ঢোকা যায় না। এতদিন ধরে গৌরীর সঙ্গে আমার চেনা, অথচ গৌরীকে কিছুই মনের কথা বলা হয়নি। কী আমার মনের কথা, জানি না। কিন্তু কিছু একটা যেন আমার বলার আছে। সেদিন আমার ইচ্ছে ছিল, ছু'হাত দিয়ে গৌরীর সারা শরীর জড়িয়ে ধরবো, যাতে এমন কোনো কথা আমার মুখে আসে, যা খুব আন্তরিক শোনাবে। এতদিন গৌরীকে তেমন ভাবে জড়িয়ে ধরিনি বলেই কোনো কথা মনে আসেনি। গৌরীর মুখও সেদিন খানিকটা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল, ওর বাবা তখনও গানের জলসা শুনছেন এমন সহজে রাজী হবার মেয়েও নয় গৌরী। সেদিন ওর মুখচ্ছবি অন্য রকম।

কিন্তু সেই বাইশ-তেইশ বছর বয়সে, আমার মনে হতো একটি মেয়েকে নিরালায় আলিঙ্গন করার মতো জায়গা সারা পৃথিবীতে কোথাও নেই। সব সময়েই এক হাজার চোখ চেয়ে আছে। কার্জন পার্ক ছাড়িয়ে এসে ছু'জনে শহীদ স্তম্ভের ওখানটায় এসে পৌঁছোলুম। সেখানেও চার-পাঁচজন লোক। আরও কিছুদূর এসে, বললুম, চলো গঙ্গার পাড়ে যাই।

না, অতদূর না। ফিরতে অনেক দেরী হয়ে যাবে যে।

ফিরে, রেড রোড ধরে হাঁটতে লাগলুম। কিছুটা এগিয়েই যেন গা

ছমছম করে, অল্প শীতে আকাশের নীচে ফাঁকা, কালো রাস্তা। কোথাও কোন মানুষজন নেই। এখানে প্রায়ই গুণ্ডা-বদমাসের উপদ্রব হয় শুনেছিলাম। আবার খানিকটা ফিরে এসে, র‍্যামপ্যার্টের মাঠের অন্ধকারে আমি গৌরীর হাত টেনে ঘাসের ওপর বসিয়ে দিলাম। বড় রাস্তা খুব বেশীদূর নয়, আমরা সেখানকার গাড়ী চলাচল দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু আমাদের কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আমি গৌরীর হাতটা তুলে নিয়েছি আমার দু'হাতের মুঠোয়। আহা, সেই, তেইশ বছর বয়সে যখন হাত ছুঁলেও বুক কেঁপে উঠত। গৌরী চুপ যেন আমার কাছ থেকে কিছু প্রতীক্ষা করছে। প্রচণ্ড অন্ধকারের মধ্যে শিরশিরে হাওয়া, আমি ওর হাতটা ধরে আলতো টান দিয়ে ডাকলুম গৌরী!

গৌরী খুব চটপট এবং সরু জিদের মেয়ে, জেদী ধরনের। অধিকাংশ সময়েই ওর খেয়াল অনুযায়ী আমাকে চলতে হয়, কিন্তু সেদিন ও কিছুই বলছিল না। আমার ডাকের উত্তরে শুধু বললো, উঁ? আমি গৌরীর সম্পূর্ণ দেহটা দু'হাতে ধরে আমার বুকের ওপর নিয়ে আসি, ও কিছুই বাধা দিল না, বরং ওর শরীর থেকে গরম হলকা যেন আমার চোখেমুখে লাগছিল। আমি গৌরীকে বুকে জড়িয়ে আছি, কিন্তু সেই যে কী যেন একটা আন্তরিক কথা ওকে বলবো, তার কিছুই মনে এলো না। কী কথা আমার বলা উচিত ছিল। গৌরীকে বুকের ওপরে পেয়েছি, আরও নিবিড়ভাবে, প্রবলভাবে ওকে জড়িয়ে ধরার কথাই শুধু মাথায় আসছিল। একটাও কথা বলছি না, একটা কিছু বলা উচিত, কিন্তু, গৌরী তোমাকে আরও জড়িয়ে ধরতে চাই, একথা মুখে বলা যায় না। তা ছাড়া তখনও আমি বুঝতেই পারিনি, গৌরী কতখানি আমাকে শুধু প্রশ্রয় দিচ্ছে, কতখানি নিজে থেকে চাইছে। আমার যে-কোনো কাজেই গৌরী কখনও না কখনও কিছুটা বাধা দিয়েছে, কিন্তু আগে কখনও ওকে ওভাবে আলিঙ্গন করিনি, অথচ সেদিন ক্ষীণতম বাধাও দেয়নি, তাতেই আমি বিচলিত হয়ে পড়েছিলুম। মনে হচ্ছিল, এর মধ্যে কিছু একটা যেন ধাঁধাঁ আছে।

গৌরীই প্রথম পায়ের শব্দ শুনতে পায়। একটা সাদা পোষাকপরা লোক মাঠের ভিতর দিক থেকে দৌড়ে আসছে। আমরা দুজন ছিটকে আবার পাশাপাশি বসলাম। লোকটা বললো, সাবধান, পালাবার চেষ্টা করলেই হুইস্‌ল বাজাবো।

আমরা তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়েছি। গৌরী আমার হাত ধরেছে। লোকটা এসে বললো, চলুন থানায়। খুব ফুর্তি হচ্ছে! অ্যাঁ?

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কে আপনি?

লোকটা বক্রভাবে হাসলো, হেসে পকেট থেকে কার্ড বার করলো। আমি গুণ্ডার ভয় করছিলুম, কিন্তু এযে দেখছি লালবাজারের পুলিস ইন্সপেক্টর। লোকটার মুখে তখনও হুইস্‌ল, হাতের ছোট টর্চ জ্বেলে আমায় কার্ডটা পড়ালো। তারপর বললো, অনেকক্ষণ থেকে আপনাদের ফলো করছি। ঐ মোড়ের কাছে ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে, চলুন।

আমি শুকনো গলায় জিজ্ঞেস করলুম, কেন, কী অন্যায় করেছি?

থানায় গিয়েই জিজ্ঞেস করবেন। লক্ষ্য করেছি তখন থেকে শহীদ স্তম্ভ, রেড রোড ঘুরে এখানে এসেছেন! এ জায়গাটাই বুঝি পছন্দ হলো? যত্তো সব—এক রাত্তির তো হাজতে থাকুন, তারপর কাল সকালে দুজনের বাবা-মাকে খবর পাঠাবো—

আমি শুনে শিউরে উঠেছিলাম। দৃশ্যটা কল্পনা করতেই মাথা ঘুরে যাচ্ছিল। থানার হাজতে দু'জনে আটকে থাকবো, সারা রাত গৌরীর বাবা পাগলের মতো কোথায় খুঁজবেন কে-জানে, পরদিন থানার লোকেরা যতদূর সম্ভব কুৎসিত কথা বলবে নিশ্চিত, হয়তো এ খবরের কাগজে ছাপা হবে—গৌরীর মতো অভিমানী মেয়ের কি যে অবস্থা হবে তখন···। আমি আড়চোখে তাকিয়ে দেখলুম, গৌরী মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। আমি পুলিশের লোকটির হাত জড়িয়ে ধরে বললুম, দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন। দয়া করে···। আমরা জানতুম না, এখানে বসা বে-আইনী।

—হুঁ শুধু বসা? বসে বসে ধর্ম আলোচনা, না? কলকাতা আজকাল

ভরে যাচ্ছে এই সবে। চলো থানায় তারপর—

লোকটা খপ করে গৌরীর একটা হাত চেপে ধরলো। লোমশ ধরনের বিশ্রী হাতে গৌরীকে চেপে ধরেছে, আমার রক্ত ছলাৎ করে উঠলো, কিন্তু আমার ধারণা ছিল, পুলিশকে মেরে কেউ কোনদিন নিস্তার পায় না। তা ছাড়া লোকটার মুখে তখনও হুইসেল, চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছিল। গৌরীর কথা ভেবে লজ্জায় অপমানে আমার মরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল, থানায় নিয়ে গেলে তার ফল যে কী হবে, ভাবতেও পারি না। আমি পকেট থেকে তাড়াতাড়ি আমার যথা সম্বল চারটে টাকা বার করে বললুম, এই নিয়ে দয়া করে আমাদের ছেড়ে দিন, আপনার কাছে চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকবো। নইলে আমাদের এমন বিপদ হবে, দয়া করুন—

পুলিসের লোকটি সেই রকম চিবিয়ে বললো, মোটে চাড্ডাকা? ঘড়ি-ফড়িও তো হাতে নেই দেখছি। ফুর্তি করা আজকালখুব সস্তা হয়েছে, না? গুঁতো না খেলে লাল গড়ানো বন্ধ হবে না—

গৌরী তখন এক ঝট্‌কায় হাত ছাড়িয়ে বললো, হাত ছেড়ে কথা বলুন!

ইস্! এখনও ফোঁস করা—

আমি চরম মিনতির ভঙ্গিতেই বললুম, আপনাকে দয়া করতেই হবে। আর কোনদিন আমরা—

লোকটা দু'হাতে গৌরীকে জড়িয়ে ধরলো। গৌরী পাগলের মতো চিৎকার করে উঠলো, ছেড়ে দিন, খবরদার ছেড়ে দিন!—ঝটাপটির মধ্যে লোকটা 'উঃ' করে চেঁচিয়ে উঠলো। গৌরী ওর হাতে দাঁত বসিয়ে দিয়েছে, দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়েছে আমি তখন দুর্নামের দারুণ ভয়ে, যেরকম ভয়-বাইশ-তেইশ বছরেই পাওয়া সম্ভব তখনও লোকটাকে তোষামোদ করার চেষ্টা করছি। দেখুন, আমাদের জীবনটা নষ্ট করে দেবেন না। লোকটা বললো, চুপ! কিন্তু সেই সময় অন্য শব্দ শোনা গেল। কোথা থেকে হুস্ করে একটা পুলিসের ভ্যান এসে দূরে রাস্তায় দাঁড়ালো, তিনজন পোষাক

পরা পুলিস দৌড়ে আসতে লাগলো এদিকে। আমি কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বিমূঢ় হয়েছিলুম, তা হলে সত্যি আর উপায় নেই? থানায় যেতেই হলো। গৌরী অমন ফুঁসে না উঠলে হয়তো ছাড়া পাওয়া যেতেও পারতো। হঠাৎ দেখি সেই লোকটা অন্ধকারের মধ্যে ছুটে পালাচ্ছে। সেই মুহূর্তে আমি ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। গৌরীকে ফেলে রেখেই আমি ছুটলাম লোকটার পিছনে, লোকটার জামাও ধরে ফেলেছিলাম কিন্তু সে আমাকে আচমকা একটা ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। লোকটার জামার খানিকটা অংশ ছিঁড়ে রয়ে গেল আমার হাতের মুঠোয়। আমি উঠে দাঁড়াবার মধ্যেই সে অদৃশ্য হয়ে গেছে। আমি ফিরে এলাম গৌরীর কাছে, একজন মধ্যবয়স্ক পুলিস ইন্সপেক্টর ও দুজন সেপাই দাঁড়িয়ে। পুরো ঘটনাট শুনে ইন্সপেক্টর একজন সিপাইয়ের দিকে ফিরে বললেন, এতো দেখছি রামেশ্বরের কাণ্ড! আবার শুরু করেছে। কবে ছাড়া পেল?

লাস্ট মানথ-এ স্যার।

ওটাকে আবার পুরে দিতে হবে। আপনারা বাড়ি যান—এদিকটায় রাত্রে বেশিক্ষণ থাকবেন না, এমনিতেই নানা উৎপাত হয়।

আমরা জানতুম না। আপনারা যে ঠিক সময় এসে পড়েছেন. সত্যিই লোকটাকে একটুও সন্দেহ করিনি।

যাক গে—। ডানদিক দিয়ে সোজা বড় রাস্তা দিয়ে চলে যান ওখান থেকে বাস ধরুন। আর কোনো ভয় নেই—। আচ্ছা, আপনাদের নাম-ঠিকানা দিয়ে যান। রামেশ্বর ধরা পড়বেই—ওর কেস উঠলে আপনাদের সাক্ষীর জন্য ডাকবো।

আমি তখন অম্লান মুখে ভুল নাম-ঠিকানা লিখে দিলাম। গৌরী কিন্তু নিজের নামই বললো।

অন্ধকার মাঠের মধ্যে একটু খুঁজতেই গৌরীর হাত-ব্যাগটা পাওয়া গেল। আমার চারটে টাকাও লোকটা নিয়ে যেতে পারেনি।

কয়েক মিনিট আগে কী বিরাট বিপদের মুখে পড়েছিলাম, হঠাৎ কী রকম সহজে মিটে গেল। দুজনে নিঃশব্দে হাঁটতে লাগলুম। আমার বুকের মধ্যে তখনও ধক্‌ধক্ করছে। প্রায় মিউজিয়ামের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি হাসিমুখে আলতো ভাবে গৌরীর কাঁধে আমার হাত রাখলাম। গৌরী সামান্য শরীর মুচড়ে আমার হাত সরিয়ে দিল। আমি ভেবেছিলাম, গৌরী তখনও উত্তেজনায় অভিভূত হয়ে আছে। আমি তখন ওর একটা হাত ধরতে যাই। গৌরী মৃদু অথচ দৃঢ় হেঁচকায় নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলেছিল না।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, কী গৌরী ?

নীলুদা, তুমি আমাকে ছেড়ে দাও।

আমি পথের মধ্যে দাঁড়িয়ে পড়লুম, তখনও কিছু বুঝতে পারিনি। বললুম, সত্যি কী বিশ্রী কাণ্ড। লোকটা এমনভাবে —

নীলুদা, তুমি আর কোনদিন আমাকে ছুঁয়ো না।

কেন ?

তোমার সামনে অন্য একজন লোক আমার গায়ে হাত দিয়েছে তবু তুমি সহ্য করেছো। তুমি আমাকে ছুঁয়ো না আর—

যেন আমি শান্ত ও নিশ্চিন্ত হয়ে পথে হাঁটছিলুম এমন সময় পিছন থেকে একটা বিষাক্ত তীর আমার পিঠে বিঁধে যায়। কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি মরে গিয়েছিলুম। আমি রক্তহীন বিহ্বল গলায় প্রেতের মতো বললুম, এই তোমার ধারণা হল ? লোকটা যে পুলিস নয়, আমি মুহূর্তেও বুঝতে পারিনি। আমি কি পুলিসের সঙ্গে মারামারি করবো, তুমি চেয়েছিলে ?

ও কথা থাক। আর না চলো, বাড়ি যাই।

প্রচণ্ড অভিমানে আমি আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলুম। গৌরী শেষ পর্যন্ত এইরকম অর্থ করলো ? লোকটা এমন কিছু শক্তিশালী ছিল না — ওর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে আমি একটুও ভয় পেতুম না। আমি তো আগাগোড়া শুধু গৌরীর কথাই ভাবছিলুম। থানা, গৌরীর বাবা,

খবরের কাগজ, পাড়ার ছেলেদের হাসি, কলেজ ইউনিয়নের সেক্রেটারী হিসেবে গৌরীর সম্মান। আমি ভেবেছিলাম বড় কেলেঙ্কারীর বদলে ছোট অপমান সহ্য করা অনেক ভালো। অন্ধকারে আর কেউ নেই—আমি লোকটার কাছে ওরকম দীন হয়েছিলাম, যাতে দিনের আলোয় হাজার লোকচক্ষুর সামনে অপমান থেকে বাঁচা যায়। অনুনয় করে বা ঘুস দিয়ে পুলিসের হাত থেকে বাঁচা যায়, কিন্তু মারামারি করলে···। আমার সেই মুহূর্তে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হলো ঈশ্বর নামে একজনের থাকা দরকার, যে-কিনা অন্তর্যামী সে এসে এখন বলুক, সাক্ষী দিক যে আমি শুধু গৌরীর সম্মানের কথাই ভাবছিলুম। লোকটা যখন গৌরীর গায়ে হাত দেয়, তখন আমার রাগে শরীর জ্বলছিল, কিন্তু ভেবেছিলুম সে আমার স্বার্থপরতা, গৌরীকে বাঁচাবার জন্যে আমাকে আরও ছোট হতে হবে, শুধু গৌরবের জন্যই আমাকে একা থানায় নিয়ে গেলে কিছুই আসতো যেতো না ; কিন্তু···

সারা রাস্তা গৌরী আর আমার সঙ্গে একটাও কথা বলেনি। গৌরীর মুখ কঠিন, চোখের দৃষ্টি দূরের দিকে স্থির। আমি পাংশু বিবর্ণ মুখে বসেছিলাম, তখন আমার মুখ রাগে জ্বলছিল, গৌরীকে আর কিছু বুঝিয়ে বলার ইচ্ছেও ছিল না। সেই রাগ ক্রমশঃ বাষ্প হয়ে পাতলা অভিমানের রঙ নিয়ে আমার বুকের কাছেই আটকে রইলো বহুদিন। সেই শেষ গৌরীর কাছে আমি কাপুরুষ রয়ে গেলাম। গৌরীর সঙ্গে আর কোনদিন আমার দেখা করতে ইচ্ছে হয়নি। মাঝে মাঝে এখানে নানা লোকের মধ্যে দেখা হয়েছে হয়তো, কিন্তু আমি ওর চোখের দিকে তাকাইনি আর আজ যদি আমি বিশ্ববিজয়ী হয়েও ওর সামনে দাঁড়াই, গৌরী ভাববে আমি কোনো নাটকে অভিনয় করছি। গৌরীর সামনে যদি আমি পৃথিবীর বৃহত্তম শত্রুকেও আঘাত করি—গৌরী ভাববে ও আমার নিজস্ব আঘাত নয়, কোনো দম দেওয়া স্প্রিংয়ের পুতুলের কাণ্ড।

যাক্। গৌরীর ওপর আমার আর কোনো রাগ নেই। গৌরীর

সামনে নিজের বীরত্ব প্রমাণ করার কোনো ইচ্ছেও নেই। গৌরীর সামনে কে বীরপুরুষ, কে কাপুরুষ হয়ে রইলো—তাতে আমার আর কিছু আসে যায় না। যে খেলা থেকে আমি আমার নাম তুলে নিয়েছি—সে খেলায় এখন কে জেতে কে হারে—তাতে আমার কোনো উৎসাহ নেই। অবিনাশের সঙ্গে গৌরীর যা ইচ্ছে সম্পর্ক থাক—কিন্তু অবিনাশ আমার বাড়িতে সকালে এসে কেন আমায় অপমান করে গেল? কেন আমার বাড়ীর সামনে অত বড়ো একটা মটরগাড়ি থামিয়ে সমস্ত পাড়া জানিয়ে ঢুকলো আমার ঘরে? অবিনাশ এসেছিল বলেই, হঠাৎ এখন গৌরীর কথা মনে পড়লো আবার। সেই সকাল থেকেই মুখের মধ্যে নিমপাতা। পৃথিবীতে অনেক অপমান সহ্য করা হলো, এবার একজন কারুর ওপরে প্রতিশোধ নিতেই হবে। অবিনাশ, অবিনাশই বারবার ভেসে উঠেছে চোখের সামনে। আজ আর ফিরে যাবো না।

স্নান করে চটপট খাওয়া সেরে নিলুম। তেমন শীত নেই, তবু কোটটা গায়ে চাপিয়ে ভোজালিটা খাপশুদ্ধ রাখলাম কোটের ভেতরের পকেটে। একটু উঁচু হয়ে রইলো, থাক্ কেউ বুঝবে না। ছুরি-ছোরা মেরে প্রতিশোধ নেওয়া ব্যাপারটা বড়ই স্থূল, নিজেই বুঝতে পারছি, কিন্তু আমার যে শুরু করতে অনেক দেরী হয়ে গেছে। প্রতিশোধ নেবার ইচ্ছে জাগতে আজ সকাল পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো কেন?

ভোজালিটা ব্যবহার করি আর না করি, সঙ্গে রাখা ভালো। একটা অস্ত্র শরীরে লুকানো থাকলে, সামান্য একটা চড়ও জোরালো হয়। তার প্রমাণও পেলুম সঙ্গে সঙ্গে। মোড়ের দোকানে গিয়ে দুটো সিগারেট চাইতেই, অন্য লোক দাঁড়িয়েছিল, আমাকেই আগে দিয়ে দিল। অন্যদিন দেখেছি, আমি এক প্যাকেট সিগারেট চাইলেও লোকটা অনেকক্ষণ ধরে অন্য লোকের জন্য পান সাজে। গ্রাহ্যই করতে চায় না। আজ হয়তো আমার গলার আওয়াজটাই বদলে গেছে। বাসে উঠেও আমি মনস্থির করে রেখেছিলাম। প্রায়ই

দেখে, আমি বাস থেকে নেমে আসার সময় কণ্ডাক্টার আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, টিকিট হয়েছে? আমি ঘাড় নাড়া সত্ত্বেও বলে, দেখি? রাগে আমার সমস্ত শরীর জ্বলে যায়! কত লোক ওঠে কত লোক নেমে যায় শুধু আমারই বেলা গাঢ় অবিশ্বাস নিয়ে কণ্ডাক্টররা জিজ্ঞেস করে, দেখি তো দেখান। আজ আমি প্রস্তুত হয়েছিলাম। প্রথমেই উঠে টিকিট কেটে, সারা রাস্তা প্রতীক্ষায় দাড় শক্ত করে ছিলাম। মাঝে মাঝে কোটের বুকের কাছে ঠেলে ওঠা ভোজালির বাঁটে হাত বুলিয়েছি। কেউ এলো না। নেমে আসার সময় বরং বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলো, স্যার, কটা বাজে? আমি গম্ভীরভাবে বললুম, জানি না। ঘড়ি নেই, ওরা বোধহয় ভাবে কোটপরা লোক মাত্রেরই হাত ঘড়ি।

এসপ্লানেড অঞ্চলের দুপুরে ফটফট করছে রোদ। কয়েক মিনিট দাঁড়িয়ে থাকার পরই আমি টের পেলুম, আমি অনেক বদলে গেছি। কত লক্ষবার এসেছি এখানে, তেতো মুখে, শুকনো ভয়ে ফুর্তির ঝোঁকে,—আজ আমি এখনো দাঁড়িয়ে আছি অতর্কিত আক্রমণকারীর ভঙ্গিতে। গাড়ি বারান্দার নিচে, থামের আড়ালে আমি দাঁড়িয়ে আছি কেউ হয়ত আমাকে লক্ষ্যই করছে না, কিন্তু আমি যেন একটা উঁচু মঞ্চে দাঁড়িয়ে, কৃপার চোখে দেখছি সকলকে। শরীরটা খুব হাল্কা লাগছে। প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বাধীন। আদর করে কোটের ওপর হাত বুলোচ্ছি ভোজালি ছুঁয়ে। কেউ জানে না, এখনও একবারও ব্যবহার করিনি, অথচ এমন সুখ। আশ্চর্য, এমন ভালো জিনিসটা আমি এতদিন বাক্সে ফেলে রেখেছিলাম! শুধু শুধু ভিড়ের মধ্যে সরু হয়ে ঘুরেছি। এখন বুঝতে পারছি, পৃথিবীর বিরুদ্ধে একটা অস্ত্র তুলে ধরা দরকার তাহলে পৃথিবীটা শাসনে থাকে। প্রতিশোধ কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করাই যথেষ্ট তাহলেই বুকের মধ্যে এমন অসম্ভব জোর এসে যায়। আমার মনে হল, এই মুহূর্তে আমি পথের মধ্যে নেমে দিনের রোদ্দুরে ভোজালিটা ঝলসে মাথার ওপর তুলে পৃথিবীকে বলতে পারি, সাবধান?

কিন্তু অবিনাশের সঙ্গে দেখা হবে সাতটার সময়। তার এখনও ঢের দেরী। এতক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না, এতক্ষণ খুনী সেজে থাকাও সম্ভব নয়, হয়তো এর মধ্যেই আমার মন নরম হয়ে যাবে। দু-একটি সুন্দরী মেয়ে এমন চোখে আটকে যাচ্ছে যে, বহু দূর পর্যন্ত তাদের চলে যাওয়া দেখতে ইচ্ছে করে—সেই সময়টা অবিনাশের কথা মনে থাকে না। অথচ কোনো চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলেও মুশকিল, হয়তো টানতে টানতে অন্য কোথাও নিয়ে যাবে। অফিসে একটা টেলিফোন করাও দরকার, টেবিলের ওপর একটা জরুরী ফাইল আছে। আমার উচিত ছিল ঐ ফাইলটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে নর্দমায় ফেলে আসা, অথবা আগুনে পোড়ানো। ও-সব জরুরী ফাইল ছিঁড়ে বা পুড়িয়ে ফেললে কিছুই হয় না, কিন্তু টেবিলের ওপর ফেলে রাখা অপরাধ। খুচরো পয়সা হাতে নিয়ে একটা টেলিফোন করতে ঢুকলুম চায়ের দোকানে।

গজেনবাবুও অফিসে আসেননি। তাহলে তো চুকেই গেল। সোমবার দেখা যাবে—সেদিন গজেনবাবু জিজ্ঞেস করে, আজ কেন অফিসে যাইনি, স্রেফ বলে দেবো, রেস খেলতে গিয়েছিলাম। দেখি, তারপর কী বলে। আজ শনিবার ঐ গজকচ্ছপটা নিজে নিশ্চয়ই অফিসে না এসে রেসের মাঠে গেছে, জানি।

রিসিভারটা রেখে দিয়েই পরমুহূর্তে আবার তুলে নিলাম। তৎক্ষণাৎ মনে হলো, গৌরীর সঙ্গে একবার কথা না বলে আমার উপায় নেই। অন্ততঃ চার পাঁচ বছরের মধ্যে গৌরীকে টেলিফোন করিনি, বছর দুয়েকের মধ্যে তো একবারও দেখা হয়নি, কিন্তু ওর টেলিফোন নাম্বার দেখলুম আমার স্পষ্ট মনে আছে। কোথায় থাকে এসব স্মৃতি? এতদিন একবারও মনে করিনি, কত জরুরী নম্বর ভুলে গেছি কিন্তু গৌরীর টেলিফোনের নম্বর ভুলিনি! ঝুঁকে ডায়াল করতে গিয়ে কোটের ফাঁক দিয়ে ভোজালির বাঁটটা প্রায় বেরিয়ে এসেছিল তাড়াতাড়ি সেটাকে আবার ঢুকিয়ে দিলাম। কাউন্টারের লোকটা দেখতে পায়নি বোধ হয়। একটুক্ষণ বেজে ওঠার পরই ওপাশ

থেকে অন্যরকম গলা। কে? না উনি তো এখন বাড়িতে নেই, কলেজে আছেন। আপনার নাম কী বলুন?
শান্তার গলা। শান্তা অনেক বড় হয়ে গেছে দেখছি। আমি তো জানতুমই গৌরী এখন কলেজে পড়ায়। শান্তাকে কিছু না বলে রেখে দিলাম। হয়তো কলেজে খোঁজ করলেও পাবো না। এক একদিন এই রকম হয় টেলিফোনে একবার একজনকে না পেলে তার পর পর প্রত্যেকটি ডাকেই আর কারুকে পাওয়া যায় না। চায়ের দোকানে টেলিফোন এতগুলো কল করাও বোধহয় নিয়ম নয়। লোকটি অসহিষ্ণুভাবে তাকাচ্ছিল, আমি পকেট থেকে একটা টাকা বার করে গম্ভীরভাবে বললুম এর থেকে তিনটে কলের চার্জ কেটে নিন। তারপর আবার ডায়াল ঘোরাতে শুরু করেছিলুম।
এবার একটু নার্ভাস লাগছে। বাড়িতে গৌরীকে পেয়ে গেলেই ভালো হতো। এখন হয়তো ও ক্লাস নিচ্ছে বা টেলিফোন থেকে অনেক দূরে আছে। কোনো কেরানী বা বেয়ারার মুখে আমার নাম শুনে যদি ভুরু কুঁচকে বলে, কে? আচ্ছা বলে দাও, এখন ব্যস্ত আছে! কিংবা কেরানীরাই যদি খবর পাঠাতে না চায়? কিন্তু সে রকম হতেই পারে না, আমি মিথ্যে ভয় পাচ্ছি, আজ আমার পকেটে ভোজালি আছে, আমাকে আজ সকলেই মানতে বাধ্য। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে পাওয়া গেল, আমার নাম শুনে সত্যিকারের খুশীর আশ্চর্য হয়ে বললো, এতদিন পরে মনে পড়লো আমাকে? তুমি এখন কোথায়?
গৌরী, তুমি যদি খুব ব্যস্ত না থাকো, একবার আমার সঙ্গে এসে দেখা করবে?
কোথায়? কতদূরে? আমি আসতে পারি?
আমি চৌরঙ্গীর এই চায়ের দোকানে আছি। ঢুকেই বাঁ দিকের ক্যাবিনে বসে থাকবো। তুমি পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যে—
আসছি। সত্যি, ভারী আশ্চর্য লাগছে—
আসলে অবিনাশের ওপর যদি আমি প্রতিশোধ নিতে চাই, তখন

মাঝপথে গৌরীর এসে পড়ার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। কিন্তু গৌরী থাকলে অবিনাশের অপমান সম্পূর্ণ হবে না, আমি বুঝতে পেরেছিলুম। যতই সময় যাচ্ছে, ততই আমার উত্তেজনা আসছে। এখন আর মনের মধ্যে কোথাও কোনো গ্লানি নেই, কুয়াশা নেই, সব স্পষ্ট। এতদিনে আমি অস্ত্র হাতে নিয়েছি। কিন্তু এতদিন পর, হয়তো অনেক দেরী হয়ে গেছে!

গৌরীর মুখের সেই ধার ধার ভাবটা আর নেই। অনেকটা কোমল এখন। চোখের পাশে খানিকটা ক্লান্তি ওকে আরও সুন্দরী করেছে। চেহারাও একটু ভারি, রেস্টুরেণ্টটায় ঢুকে মুহূর্ত দ্বিধা করে, তারপর আবার এগিয়ে এসে পরদা তুলে আমার কেবিনে ঢুকলো। ঢুকে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললো, বাবা, কী লোক! এতদিনে—

তুমি কেমন আছো, গৌরী?

ভালো নেই। তুমি কেমন আছো?

তুমি ভালো নেই কেন?

মরতে বসেছিলাম তো, খবর নিয়েছিলে? প্লুরিসিতে ভুগলাম এক-বছর। এখন আবার বুকে ব্যথা।

যাঃ, আমি শুনেছিলাম তোমার অসুখ হয়েছিল।

প্রথমে আমি ভেবেছিলাম টি. বি.। ভেবেছিলাম মরেই যাবো।

টি. বি. তে আজকাল কেউ মরে না।

পিঠে অসহ্য ব্যথা, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে যখন কান্না আসতো, তার চেয়ে মরে যাওয়া কম কী? আর দুধ, ডিম, আপেল, মসলা ছাড়া মাংস—যতসব অখাদ্য খাবার! খুব খিদে পেয়েছে আজ অনেক কিছু খাবো এখানে—পয়সা আছে তো তোমার কাছে?

প্রচুর টাকা আছে? অবিনাশ আজ সকালে বাড়িতে এসেছিল, ও নাকি কবে আমার কাছ থেকে সত্তর টাকা ধার নিয়েছিল আজ শোধ করে গেল!

ওর এসবও মনে থাকে বুঝি? আজকাল অনেক টাকা রোজগার করছে শুনেছি।

শুনেছি মানে? তুমি জানো না বুঝি? তোমার সঙ্গে দেখা হয় না?

হ্যাঁ, হয়। আচ্ছা, ওর কথা থাক্। তোমার কথা বলো, কতদিন পর দেখা, কী পাগল তুমি! এতো অভিমান—

গৌরী তোমাকে টেলিফোন করতে আমার ভয় করছিল। যদি আমার নাম শুনেই তুমি ফোন রেখে দাও! যদি গম্ভীর ভাবে বলতে কী চাই?

আমি এতই খারাপ বুঝি?

না, তা নয়, তবু কতদিন দেখা হয়নি, আমাদের আর কোনো সম্পর্ক নেই।

সম্পর্ক কথাটা কি খারাপ শুনতে!

না, সত্যি, এই ক'বছরে তোমার কথা একবারও মনে পড়েনি, হঠাৎ টেলিফোনে।

কি বিশ্রী স্বভাব হয়েছে তোমার! কোনো মেয়ের সামনে বুঝি বলতে হয়, আমি তোমাকে ভুলে গেছি! একটু খুশী করে বলতেও পারো না?

কিন্তু আমি তো সত্যিই তোমাকে মনে রাখিনি। তোমার কাছে হেরে গিয়ে আমি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। হাঁটতে হাঁটতে কতদূর চলে এসেছি, এখন চারদিকে তাকিয়ে গা ছম্‌ছম্ করে। যেন আমি আনমনে হঠাৎ কোনো উপত্যকার মধ্যে এসে পড়েছি, সামনেও পাহাড় পিছনেও পাহাড়। সামনেও দেখতে পাইনা, পেছনেও কিছু দেখতে পাই না।

থাক্ ও সব বাজে কথা। কিন্তু আজ হঠাৎ তবে টেলিফোন করার সাহস পেলে কোথা থেকে?

আজ সকালে আমি বদলে গেছি। আজ আমি প্রতিশোধ নিতে বেরিয়েছি।

প্রতিশোধ ? আমার ওপরে না কি ?

গৌরী কৃত্রিম হেসে উঠলো। আমি খুব লক্ষ্য করে ওর হাসির শব্দ শুনলুম। না, ওর হাসিতে আগেকার মতো শ্লেষ নেই। বরং বেশ মধুর। অসুখের পর গৌরী খানিকটা বদলে গেছে। অসুখ হয়েছিল বলেই তাহলে গৌরীর সঙ্গে এতদিন অবিনাশের বিয়ে হয়নি ? কিন্তু গৌরীকে দেখে আমার একবারও বুক টনটন করেনি। একটুও পুরোনো দুঃখ জাগেনি। গৌরীর জন্য আমার বুকের মধ্যে সত্যিই তা হলে কোনো দুঃখ ছিল না ! কিছু একটা থাকা যেন উচিত ছিল। লোভ কিংবা রাগ ! এতদিন আমি ভুল জানতাম। আমি বললুম না, তোমার ওপবে ঠিক কি জন্য প্রতিশোধ নিতে হবে আমি এখনও জানিনা। তবে আমি পৃথিবীর অনেকেরই ওপর 'প্রতিশোধ নেবো ! অবিনাশকে দিয়ে শুরু করতে চাই।

অবিনাশ ? কেন ?

অবিনাশ আজ আমার কাছে এসে বিষম অপমান করে গেছে। অবিনাশের কি ক্ষমতা আছে তোমাকে অপমান করার ? আমি ছাড়া আর তো কেউ পারে নি !

গৌরী, তুমি আমাকে ঘা দিয়ে বলছো।

না থাক, অবিনাশ কি করেছে ?

অবিনাশ এসেছিল আমার উপকার করতে। প্রায় বছর খানেক বাদে ওকে দেখলুম, দেখেই বুঝতে পারলুম অবিনাশের চেহারার মধ্যে একটা আভিজাত্যের ছাপ ফুটেছে। অবিনাশ বড়লোকও হয়েছে, চোরও হয়েছে। দেখলেই চেনা যায়। যেদিন থেকে ও ওর কাকার ইনজিনিয়ারিং ফার্মে পার্টনার হয়ে ঢুকেছে, সেদিন থেকেই জানি ও বদলে যাবে। তা যাক্। কিন্তু ও আমার উপকার করতে এসেছিল ও আমাকে চাকরি দিতে চায়।

এতে অপমানের কী আছে ?

সেইটাই তো কথা। ও এসে নানা কথা বললো। কাজের জন্য পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখাই করা হয় না ! ··এইসব···। আমাকে

জিজ্ঞেস করলো আমি কী করছি এখন। তারপর সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলো, আমি একটা ভালো চাকরি পেলে নেবো কিনা। ফরাক্কা বাঁধে স্টোন চিপ্ সাপ্লাই করছে এক মাড়োয়ারি কোম্পানী, তারা একজন বিশ্বস্ত লোক চায়। প্রত্যেকদিন দশ-ওয়াগন করে পাথর কুচি সাপ্লাই করে। এখন বিহারের বলভূমগড় কোয়ারি থেকে সাপ্লাই চলছে, কয়েক মাস বাদে যাবে বেথুয়াডিহি থেকে। একজন ম্যানেজার শ্রেণীর লোক চাই, ঠিক মতো চালান যাচ্ছে কিনা দেখবে, রেলওয়ের সঙ্গে কনট্যাক্ট রাখবে। অবিনাশ আমাকে ঐ চাকরিটা করে দিতে চায়। মাইনেই সাড়ে পাঁচ শো টাকার বেশি, ফ্রি কোয়ার্টার্স! ওখানে নাকি আমি লেখাটেখার অনেক সময় পাবো।

শুনতে তো খারাপ লাগছে না! এতে তুমি এত রেগে উঠছো কেন ?

সেইতো! কেন ? শুনতে একটুও খারাপ নয়! আমি এখানে ভালো চাকরি করিনা। অবিনাশ আমার উপকারই করেছে। বন্ধুর কাছে কেউ কখনো উপকার চায় না মুখ ফুটে, খাঁটি বন্ধুরাই নীরবে উপকারের সুযোগ এনে দেয়। সব ঠিক। কলকাতা শহর আমার ভালো লাগে না আর, আমি বাইরেই যেতে চাই। আমার কিছু বেশী টাকা দরকার। সব ঠিক, কিন্তু কেন ?

বাঃ, এর কোনো মানে নেই! এ তোমার—

অনেকগুলো কেন ছুঁড়ে দেওয়া যায়। এনজিনিয়ারের সঙ্গে কণ্ট্রাক্টারের কেন এত খাতির ? অবিনাশ মাইনে না বলে 'মাইনেই' বলে কেন একটা অতিরিক্ত ই-কার জুড়ে দিল ? এসবও সরল ব্যাপার সারা দেশেই চলছে। আমার কী আসে যায়, আমি শুধু আমার অংশটুকু খুঁটে নিতে পারলেই হলো। অবিনাশের প্রস্তাবে আমি প্রথমে কোনো উত্তর দিতে পারিনি। খুব লজ্জা করছিল, শুধু একবার চকিতে মনে হয়েছিল, ঐ চাকরিটা নেবার পর যদি কখনো আমি একটা দামী স্যুট পরি অবিনাশ যখন সেটার প্রশংসা করবে

তখন তার মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকবে, আমি চাকরিটা দিয়েছিলাম বলেই তো। সেটাও এমন কিছু না। প্রথমে আমার রাগ এলো আমার এখানকার অফিসের গজেনবাবুর ওপরে।

গৌরী হেসে উঠে বললো, অদ্ভুত নাম। তিনি আবার কী করলেন?

তিনি আমার চাকরিটা এখনও পাকা করেন নি। পাকা চাকরি থাকলে প্রথমেই না বলতে পারতুম। দেখো কেরানীর চাকরি করছি এতে কোনো লজ্জা নেই। আমি কেরানী বলে অন্য কোনো বুড়ো অফিসারকে ঈর্ষা করি না। কিন্তু টেমপোরারি চাকরি বড়ো অপমানজনক। কেউ চাকরির কথা জিজ্ঞেস করলেই ভয় ভয় করে। এসব অফিসে, বছরের শেষে সি-সি-আর বলে একটা ব্যাপার আছে। তাতে ঐ লোকটা মুচকি হেসে আমার নামে কী যেন লিখে রাখে। প্রোমোশন তো দূরের কথা, আমার চাকরিটাই এখনো পার্মানেন্ট করেনি, তা হলে আমি অনায়াসে ফুঁঃ করে অবিনাশের প্রস্তাব উড়িয়ে দিতে পারতুম। কারুর কাছ থেকে দয়া নেওয়ার চাইতে দয়া উপেক্ষা করায় আনন্দ বেশী না? গজেন আমাকে তা থেকে বঞ্চিত করেছে—

তুমি জিনিসটাকে এত ঘোরালো করছো কেন? কেউ কোনো ভালো চাকরির খোঁজ পেলে বন্ধু-টন্ধুদের বলে না?

এর নাম ভালো চাকরি? এঁদো গ্রামে গিয়ে কুলির সর্দারি? যাই হোক, আমার তুলনায় ভালো। আমার না-নেবার কোনো যুক্তি নেই! কিন্তু আর একটা কেন-র কথা বলি। এই চাকরির পুরো প্রস্তাবটাই কি রকম ফাঁকা ফাঁকা নয়? যেন, মনে হয় আমারই জন্য তৈরী করা? অবিনাশকে আমি অবিশ্বাস করিনা—কিন্তু প্রথম থেকে শুরু করি, অবিনাশ আজ সকালে আমার বাড়ি এলো কেন? তুমি এর উত্তর দিতে পারো? ও তো আমায় টেলিফোন করতে পারতো? তা ছাড়া, অবিনাশ আর আমি এখন সত্যিকারের বন্ধু নই, এ কথা আমরা দু'জনেই মনে মনে জানি। তবু এত গরজ কেন? একজন ব্যস্ত লোক, বড় চাকরি করছে, কোনো অফিসের

দিনে সকালে অতদূরে কোনো সাধারণ বন্ধুর বাড়িতে যায় ? তাও বহু বছর আগে ধার করা টাকা শোধ দেওয়ার ছুতো করে ? তার মানে অবিনাশ বেশ কয়েকদিন ধরে আমার কথা ভেবেছে। আমার চাকরির চেষ্টা করেছে। কেন ?

কেন ?

তার কারণ, গৌরী আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি, অবিনাশ চায় আমি কলকাতা থেকে দূরে থাকি। কোনো কারণে এখন অবিনাশ আমাকে কলকাতা থেকে সরিয়ে দিতে চায়। অবশ্য, ওর সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই, তবু কেন চাইছে জানি না। কিন্তু চাইছে ঠিকই। এই কথা বুঝতে পেরে আমার কান ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে অপমানে। তখন আমার মনে হয় অবিনাশের প্রস্তাবে প্রত্যাখ্যান করার জন্য আমার একটা প্রবল যুক্তি চাই। তা খুঁজে না পেয়ে আমার রাগ বাড়তে শুরু করে, অবিনাশের ওপর, গজেনের ওপর, দুনিয়ার যাবতীয় কণ্ট্রাকটার এবং ইঞ্জিনিয়ারদের উপর। আমি মাটির দিকে চেয়ে চুপ করে বসেছিলাম, কিন্তু আমার রাগ সারা ঘর ভরে হা-হা করছিল।

নিলুদা, তোমার মাথাটাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো ? তুমি তো ঠাণ্ডা ভাবে কথা বলছো, কিন্তু তোমার কথায় কি রকম পাগল পাগল যুক্তি আছে।

তা নয়, আসলে কোনো যুক্তিই নেই। এইটাই আজ সকালে আমি আবিষ্কার করলুম। আজ বুঝতে পারলুম, যে-কোনো যুক্তিই আসলে কাপুরুষতা। এ পৃথিবীর যে-কোনো সাহসিকতাই অযৌক্তিক। আমি যুক্তি মানার চেষ্টা করেছি এতকাল, আর প্রত্যেকটা লোক আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে গেছে। আমি মানুষের কাছে থেকে ভদ্রতা বিনয়, স্বাভাবিকতা চেয়ে নিজে ভদ্র, বিনয়ী স্বাভাবিক হয়ে থেকেছি, আর তারা ঠা-ঠা করে হেসে কাদা মাখা নোংরা পায়ে আমার সামনে দিয়ে এগিয়ে গেছে। পিছিয়ে যেতে যেতে আজ আমি কোথায় চলে এসেছি, একটা ঝাপসা অস্বস্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে

আছি, বত্রিশ বছর বয়েস—জুলপিতে সাদা ছোপ, এক একদিন বিকেলবেলায় পথে একা দাঁড়িয়ে মনে হয়, আমার কোথাও যাবার নেই। এরকমভাবে চললে আমি মাটির নীচে ঢুকে যাবো !···আজ সকালে আমি উঠে দাঁড়িয়েছি আজ থেকে আমি প্রতিশোধ নেবো। অবিনাশই প্রথম !

গৌরী টেবিলের ওপর দিয়ে ঝুঁকে আমার একটা হাত চেপে ধরে বললো, তুমি অবিনাশকে নিয়ে কি করতে চাও ?

আমি সামান্য হেসে বললুম, এখন জানি না। অবিনাশের জন্য ভয় পেয়ে তুমি আমাকে ছুঁয়ে দিলে ?

কেন, তোমাকে ছোঁয়া বারণ না কি ?

অন্য রকম কথা ছিল !

কী ছেলেমানুষ তুমি এখনও। আজও অভিমান গেল না ? নীলুদা, তোমার মুখের চেহারা কেমন রুক্ষ হয়ে গেছে, চোখ দুটো বড় বেশী জ্বলজ্বলে। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে খুব, তুমি অনেক বদলে গেছো।

কে না বদলেছে ? ঐ অবিনাশটাকে এক সময় গ্রাহ্যই করতুম না, আজ কি-রকম অহংকারীর মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে মাথা ঝাঁকিয়ে।

আমার সামনে অবিনাশের নিন্দে করা তোমার উচিত নয়। তোমাকে মানায় না। অবিনাশের সঙ্গে সামনের মাসে আমার বিয়ে হবার কথা।

তুমিও অনেক বদলে গেছো, গৌরী।

অনেক, অনেক ! এখন আমি জানি সারাজীবনে আর বৃষ্টিতে ভিজতে পারবো না, দু'বেলা ঠিক সময়ে খেতে হবে, বেশী চা খাওয়া চলবে না আমার···আমার একবার রিলাপ্‌স্‌ করেছিল, জ্যোৎস্না রাতে শখ করে হাঁটতে পারবো না।

হঠাৎ পুকুরে ঝাঁপিয়ে পরতে পারবো না।

গৌরী একটু থেমে কি যেন মনে করার চেষ্টা করলো। হয়তো কিছুই মনে পড়লো না। সব কিছু বুঝি আমারই একা মনে আছে !

গৌরীর সুন্দর মুখটা ম্লান হয়ে এলো, কি-রকম অসহায় কুয়াশা মাখা মুখ, আমার হাতটা চেপে ধরে থেকেই আস্তে আস্তে বললো, এসবই এখন আমাকে মানতে হয়। এই সবই আমার বেঁচে থাকার যুক্তি।. একটা না মানলেই একলা ঘরের বিছানা। তখন মাথার কাছে বসে যদি কেউ ভালোবাসার কথা বলে, একটুও ভালো লাগে না। ...এই দেখো না, এতক্ষণ যে চেয়ারে বসে আছি, পিঠ টন্‌টন্‌ করছে।

গৌরী, আমার কথা কি তোমার মনে পড়তো?

মনে পড়বে না কেন? তবে খুব একটা হা-হুতাশ বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে, তা যেন মনে করো না! এমনই। তবে মাঝে মাঝে মনে হতো, আমি তোমার প্রতি কোনো অন্যায় করেছি। মিথ্যে কষ্ট দিয়েছি।

না, না তা নয়। আমিও কখনও ভাবিনি। তোমার কথাও প্রথম কিছুদিন খুব মনে পড়তো। তারপর, দেখা না হতে হতে ভুলে গেছি। এখন কোনো দুঃখ নেই, রাগ নেই।

তুমি আমার ওপর কোনো প্রতিশোধ নেবে না?

না, না, কেন? কি জন্য? তা ছাড়া, তুমি তো আগে থেকেই হেরে বসে আছো দেখছি।

হয়তো, তুমি ভাবছো, অবিনাশের ওপর আঘাত করলেই আমাকে আঘাত করা হবে। অবিনাশই আমার এখন একমাত্র আশ্রয়। কিন্তু তা বলে আমি এখনও এত দুর্বল হয়ে পড়িনি যে তোমার কাছে অবিনাশের জন্য মিনতি করবো। তোমাকে বারণ করবো। ওসব তোমাদের পুরুষদের বোঝাপড়া আর পাগলামি।

অবিনাশের সঙ্গে সাতটার সময় আবার দেখা হবে। তুমি থাকবে আমাদের সঙ্গে?

কোথায়?

পার্ক স্ট্রীটের মুখে।

নাঃ! আমার ক্লান্ত লাগছে, বাড়ি যাই। অবিনাশের ওপর যদি

তুমি প্রতিশোধ নিতেও পারো, তারপর কিন্তু আবার আমাকে ডেকো না। আমি জুয়া খেলার বাজি নই। অবিনাশ তোমাকে কলকতো থেকে সরিয়ে দিতে চায়, এ কথা বলে তুমি এরকমই কিছু বোঝাতে চেয়েছিলে। কিন্তু, আমি তো তোমাকে সত্যিই ভালোবাসি না।

তা তো জানিই, গৌরী। আবার কেন বললে!

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলুম। অন্ধকার হয়ে এসেছে অনেকক্ষণ। গৌরী ওর ডান হাতটার মুঠো খুলে বললো, দেখো কি রকম হাত ঘেমেছে আমার। আজকাল এরকম হয়। আমি গৌরীর হাতটা তুলে নিলাম। নরম, বড় বেশী নরম, আগের মতন অমন তাপ নেই। আমার আঙুলের নোখ সিগারেটের ধোঁয়ায় হলুদ, গৌরীর সাদা হাতটা তুলে ধরার পর আমার মনে হলো গৌরীর হাতও আমার হাত, দুটোই যেন অন্য কোনো নারী-পুরুষের হাত। অথবা নিয়ন আলোতে অন্য রকম দেখায়।

যাস স্টপ পর্যন্ত হেঁটে গেলাম দু'জনে। একটা বিশ্রী চেহারার ছোক্‌রা গৌরীর গায়ে ইচ্ছে করে একটা ধাক্কা দিয়ে গেল। গৌরী তাতে ভ্রূক্ষেপ করলো না। আমি অজান্তে বুকের কাছে ভোজালিতে একবার হাত দিয়েছি। তারপর একটু এগিয়ে গিয়ে আমি সেই শৌখিন ছেলেটার পা মাড়িয়ে দিলাম আমার শক্ত জুতো দিয়ে। ছেলেটা রুখে দাঁড়ালো না, চট করে আমার দিকে ফিরে একস্‌কিউজ মি' বলে হন্‌ হন্‌ করে চলে গেল।

এই সময়টায় বাসে বিষম ভিড়। গৌরী উঠবে কী করে? হয়তো আমারই উচিত ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসা। থাক্‌ তার দরকার নেই। একটা ফাঁকা, লেডিস বাস এসে হাজির। বাস ছাড়ার পর ক্লান্ত মুখে ভারী মধুর করে হাসলো গৌরী আমার দিকে চেয়ে। আমি ফিরে এলাম। প্রায় সাতটা বাজে। এখান থেকে পার্ক স্ট্রীট পর্যন্ত হেঁটেই যাবো ঠিক করলাম। রাস্তায় এত ভিড়, অথচ আমি হেঁটে যাবার সময় আমার প্রত্যেকটি পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি।

আমার জুতোর টকটক শব্দ হচ্ছে। খুব বেশী তাড়া নেই, বহুদিন এমন খুশী বোধ করিনি, বেশ হাল্কা শরীরে চলে এলাম পার্ক ষ্ট্রীট পর্যন্ত। অবিনাশ তখনও আসেনি।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনা। অন্ততঃ এক ঘণ্টার কম নয়! অবিনাশ শেষ পর্যন্ত আসবে না, তা বিশ্বাসই হয় না। মহাত্মাজীর মূর্তির ওপর আলো পড়েছে, তার কাছেই ট্রাফিকের লাল আলোয় যখন অসংখ্য মোটর গাড়ি দাঁড়িয়ে যায়, তখন মনে হয়, গান্ধীজীই যেন ডান হাত তুলে এই গাড়িগুলোকে দাঁড়াতে বলেছেন। মোটর-গুলি, ভারী ভারী দোতলা বাস সেই হুকুম অমান্য করতে পারছে না, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুঁসছে, অপেক্ষা করছে, কখন তিনি আঙুলের ইশারা করে লালকে বলবেন সবুজ হতে, সকলকে বলবেন, যাও! বারবার এই জিনিস দেখতে আমার বেশ মজা লাগছিল মহাত্মাজীর হাতের সামনে এসে গাড়িগুলো থামছে; ভেতরে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসা নারী-পুরুষরা ঝট করে আলাদা হয়ে সরে বসেছে, কেউ একটাও কথা বললে না, আমি উদগ্রীব হয়ে দেখছি, কখন তাঁর আঙুল নড়ে ওঠে ঐ নড়ে উঠলো, তিনি বললেন, যাও!

এই রকম দেখতে দেখতেই অনেক সময় কেটে গিয়েছিল। এমন সময় অবিনাশ এলো, হালকা স্যুট পরেছে, টাই এর ফাঁস আলগা, মাথার চুলগুলো খাড়াখাড়া। এসে বলল, কি রে, এখনও দাঁড়িয়ে আছিস? ভেবেছিলুম চলে যাবি! তবে চাকরি এমন জিনিস ··হুঃ নিবি তা হলে?

অবিনাশ অনেকটা মদ খেয়ে এসেছে, সোজা হয়ে এখনও দাঁড়াতে পারলেও কথা বলছে গলা উঁচু করে। বাঁ হাত দিয়ে মাথার চুল, খিম-চোচ্ছে মাঝে মাঝে। আমি চোয়াল শক্ত করে বললুম, চল, রাস্তার ওপাশে গিয়ে মাঠে বসি।

মাঠে কেন, কোনো দোকানে চল না।

না, এতক্ষণ চায়ের দোকানেই বসেছিলাম! গৌরার সঙ্গে দেখা হলো।

গৌরী? কেন, আচ্ছা যাক্‌গে! গৌরীর সঙ্গে তোর দেখা হলো, বললি? কেন?

কেন মানে? দেখা হলো—চল্‌ মাঠে গিয়ে বসি কোথাও!

তারপর মাঠে বসে কী করবো?

অবিনাশ, তুই-ই আমাকে এখানে আসতে বলেছিস্‌ আজ। মাঠে গিয়ে ঘাস খাবার কথা বলিনি।

তুই এ-রকম বিশ্রীভাবে কথা শুরু করলে কোনো কথাই বলা যায় না।

বিশ্রী সুচ্ছিরির কী আছে বাবা। চল্‌ যাই মাঠেই—রাস্তা পার হবার জন্য আমি অবিনাশের একটা হাত ধরলুম। অবিনাশ হঠাৎ একটা হুঙ্কার দিয়ে বললো, হাত ছাড়। আমি হাঁটতে পারবো না ভেবেছিস? দু'চার পেগে কিস্সু হয় না অবিনাশ মিত্তিরের। ভেবেছিলুম, তোকেও এসে ডেকে নিয়ে যাবো, কিন্তু এমন জমে গেলুম। আজকাল এত খাওয়াবার লোক না চারিদিকে। ঝাঁকে ঝাঁকে, অনেক পাট্‌নার সব ব্ল্যাকমানি, বুঝেছিস্‌ তো! তুই তা হলে নিবি তো চাকরিটা।

মহাত্মাজীর মূর্তিটার পিছন দিক দিয়ে এসে, পুকুরের পাড় দিয়ে আমরা ওপাশের অন্ধকার মাঠে এলুম। অবিনাশকে বললুম, আয় বসি এখানে। তারপর কথা হবে! অবিনাশ শক্ত হয়ে, দাঁড়িয়ে বললো, না, সময় নেই। আমি আবার যাবো। কী রকম অ্যাপ, অ্যাপ, অ্যাপোয়েন্টমেন্ট ঠিক রেখেছি, বল্‌! তুই চাকরিটা নিয়ে নে। তারপর আমি তোকে আলাদা কণ্ট্রাক্টারি পাইয়ে দেবো। বহু টাকা, মাইরি, একবার ঢুকে ছাখ···চল্‌···এক্ষুণি দেখা করিয়ে দিচ্ছি!

নিজের চোখে নেশা না থাকলে মাতালদের সঙ্গে কথা বলতে আমার একেবারে ভালো লাগে না। এমন বাজে বকে যে কোনো উত্তরই দেওয়া যায় না। আমি এক ধমক দিয়ে বললুম একটু চুপ করে বসবি!

অবিনাশ চোখ পাকিয়ে বললো, অ্যা-ই! ধমকাচ্ছিস্ কি? ভেবেছিস্ বন্ধু বলে রেয়াৎ করবো? একখানা নাকে ঝাড়বো এমন, বিন্দাবন দেখিয়ে দেবো। হাতে জোড় আছে এখনও, শুধু সময় নষ্ট।

তুই আমাকে চাকরি দেবার জন্য ব্যস্ত কেন?

ব্যস্ত? কত লোক ফ্যা-ফ্যা করছে একবার ডাকলেই···তোকে ভালোবাসি বলে···তুই কষ্টে আছিস···নে না তোকে আমি দাঁড় করিয়ে দেবো।

অবিনাশ, তুই এই রকম ভাবে কথা বলা বন্ধ করবি কি না?

আবার চোখ রাঙানো। এই জন্যই তোকে আমি দেখতে পারি না। দু'চক্ষে দেখতে পারি না। একটু কৃতজ্ঞতা নেই! গৌরীর সঙ্গে তোর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল বুঝি? হঠাৎ? একবারে···ঐ যে কি বলে, লছমন প্রসাদ শূয়ারের বাচ্চাকে কত করে বুঝিয়ে তবে—আর, তুই শূয়ারের বাচ্চা।

অবিনাশ, আমার সঙ্গে এরকম ভাবে কথা বলার সাহস তোর হলো কী করে রে?

সাহস? তুই কে-রে? একটা যাকে বলে, ঐ যে কি যেন, আমাকে তুই সাহস দেখাতে এসেছিস্?

অবিনাশের মুখটা ঝুলে ঝুলে পড়ছিল। ক্রমেই ওর নেশা বেড়ে যাচ্ছে। যদি খুব বেশী খেয়ে থাকে, তবে এখন ঘণ্টাখানেক নেশা বেড়েই চলবে। আমি হাত দিয়ে ওর মুখটা উঁচু করে তুলে বললুম, কি ব্যাপার? তোর কি চাই?

আমার আবার কী চাই। তোকেই তো পাইয়ে দিচ্ছি!

গৌরীর সঙ্গে দেখা হয়েছে শুনেই।

চোপ!

আচমকা অবিনাশ আমার নাকে একটা ঘুষি মেরেছে। বেশ জোরেই, আমি হাত দিয়ে দেখলুম নাকের কাছটা ভিজে ভিজে, বোধহয় রক্ত বেরিয়েছে। রুমাল দিয়ে মুখটা মুছে নিলাম। অন্ধকারে

রক্ত দেখা গেলনা অবশ্য। মারের ঝোঁকে অবিনাশ নিজেও পড়ে গেছে মাটিতে।···আমি এক ঝলক সেদিকে তাকিয়ে দেখলুম ঘাসের ওপর অবিনাশ লম্বা হয়ে শুয়ে আছে উপুড় হয়ে ঘাড়ের কাছে একটা ভোজালি বিঁধে আছে আমূল, ভোজালির বাঁটটা শুধু বেরিয়ে আছে, জ্যোৎস্না লেগে চক্‌চক্ করছে সেটা। আমি হাঁটু গেড়ে বসলুম ওর পাশে।

আমি ধাক্কা দিয়ে ডাকলুম অবিনাশ, অবিনাশ! অবিনাশ চোখ খুলে বললো, সুনীল? আমি তোকে মারলুম? অ্যাঁ? আমি তোর জন্য, আমি তোকে, তুই জানিস না, তোর জন্য আমি কতখানি··· তোকে মারলুম?

অবিনাশ, তুই আমাকে কলকাতার বাইরে পাঠাতে চাস কেন?

কলকাতার বাইরে? কলকাতার বাইরে ভেতরে মাঝখানে যেখানে ইচ্ছা থাক না, আমার কি···আমি শুধু টাকার জন্য···এত চারদিকে—

তুই কি গৌরীর কথা ভেবে আমাকে···

গৌরী?

অবিনাশ হঠাৎ বিপন্ন মানুষের মতো ধড়মড় করে উঠে বসে আমার হাত জড়িয়ে ধরলো, তারপর ব্যাকুল ভাবে বলতে লাগলো, গৌরী? ঠিক বলেছিস্ এতক্ষণ এ কথাটাই আমার মনে পড়েনি। ঐ জন্যই তোকে খুঁজছিলাম। ঐ জন্যই তোর কাছে···আসল কথাটাই বলা হয়নি। গৌরীর সঙ্গে তুই আজ কি বলে দেখা করলি? মাঝে মাঝেই এখনও দেখা হয়? না-রে?

তিন বছর পর আজই প্রথম দেখা হলো।

যাঃ! বাজে কথা বলিস কেন? তুই তো গৌরীকে ভালোবেসে পাগল ছিলি না?

না। কোনোদিন না। এক সময় ভালোবাসার চেষ্টা করেছিলুম। এখন আর চেষ্টা করারও ইচ্ছে নেই। আমার দিক থেকে তোর কোনো ভয় নেই।

ভয়? আমার বড্ড ভয় রে—

অবিনাশ রুমাল বার করে নাক ঝেড়ে সুস্থ হবার চেষ্টা করলো। মাথার চুলগুলো খিমচে ধরে নিজেই মাথাটা তুলে মুখ আকাশের সমান্তরাল করে ফাঁকা ফাঁকা গলায় অবিনাশ বললো, আমার বড্ড ভয় করে রে! কোনোদিন গৌরীর কাছে ধরা পড়ে যাবো, আমি ওকে একটুও ভালোবাসিনা। একটুও না! তুই যদি ওকে ভালো-বাসতিস্, কি চমৎকারই না হতো। আমি বাঁচতুম মাইরী, আমি ওকে বিয়ে করতে চাই না, একদম চাই না।

সামনের মাসে নাকি তুই ওকে বিয়ে করছিস্?

কে জানে কাকে বিয়ে করবো! যদি শান্তার সঙ্গে!

শান্তা!

তুই জানিস্ না, উফ্ কল্পনা করতে পারবি না—একদিন শান্তাকে চুমু খেয়েছিলাম, উফ্ বুক জ্বলে গেছে, জ্বলে গেছে—ওসব গৌরী-ফৌরীকে আমি চাই বলার কোনো মানে হয় না! শখ করে না শান্তা—

অবিনাশ গুনগুন করে অবিশ্রান্ত কথা বলতে লাগলো। আমি ঠাণ্ডা হয়ে বসে রইলুম। শান্তা একদিন জলে ডুবে গিয়েছিল বারবার শান্তার সেই মুখটাই আমার মনে পড়ছে, জলে-ডোবা অসহায় শিশুর মুখ! কি জানি শান্তা এখন কত বড় হয়েছে! হঠাৎ মনে পড়লো বাস স্টপ পর্যন্ত গৌরীর সঙ্গে হেঁটে যাওয়া সব তেজী মুখের রেখা মিলিয়ে গিয়ে গৌরীর এখন শান্ত ভঙ্গি, বেশীক্ষণ বসে থাকলে ওর পিঠের শিরদাঁড়ায় ব্যথা করে!

অবিনাশ বললো, গৌরীকে এড়িয়ে কি করে শান্তাকে পাবো বলতো। শান্তাকে একদিন আদর করে জড়িয়ে ধরেছিলুম, ঠিক আমার বুকের মাপে মাপে বুঝলি, আমার বুকের মধ্যে ওর পুরো শরীরটা এখন খাপ খেয়ে গেল—কিন্তু গৌরীকে নিয়েই হয়েছে ঝঞ্ঝাট! কি ঝামেলার মধ্যে আছি, তুই যদি জানতিস্···গৌরীকে বিয়ে না করলে শান্তাও বোধ হয় আমার দিকে ফিরে তাকাবে না—পারে

কখনো, নিজের দিদিকে কেউ অপমান করলে···গৌরীটা মরেনা কেন? কিংবা আর কারুর সঙ্গে প্রেম ফ্রেম···

এসব কথা আমার সঙ্গে কেন? আমি তোকে সাহায্য করবো ভেবেছিস্?

মাইরী, তুই আমায় সাহায্য কর! আমি তোর কেনা হয়ে থাকবো! আমি তোর জুতো মুখে করে নিয়ে যাবো। অনেকদিন ভেবে তোর কথা মনে পড়লো। আহা,তুই গৌরীকে অত ভালোবাসতিস্? তোর মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। তোর মতো এমন ভালো ছেলে।

অবিনাশের পাশে থাকতে আমার বিষম বিরক্ত লাগছিল। ওর দিকে তাকাতেই ইচ্ছে করছে না। মাঝে মাঝে ও যে আমার গায়ে হাত দিচ্ছে, আমার অস্বস্তি লাগছে। ওর মুখ দিয়ে বিকট গন্ধ বেরুচ্ছে, এখন কথা জড়িয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই থুতু ফেলছে একবার করে, ফ্যাৎ-ফ্যাৎ করে নাক ঝেড়ে আবার সেই হাতে আমাকে ধরতে আসছে বলে আমি একটু সরে সরে বসছি। হঠাৎ গা গুলিয়ে উঠলো। আমি অবিনাশকে একটা ধাক্কা দিয়ে বললুম যা বাড়ী যা! আমার কাছে আর কোনোদিন আসিস্ না—

ওফ্ শান্তার জন্যে বুকটা জ্বলে গেল, এত টাকা রোজগার করছি, অথচ ইচ্ছে মতো কত বড়ো বড়ো পার্টিতে যাই, সেখানে শান্তা সঙ্গে থাকলে, ওফ, মক্কেলরা একেবারে সেঁটে থাকবে! মাথা ঘুরে যাবে মাইরী, তুই জানিস না, শান্তা···তা নয় গৌরীর জন্য আমার কেরিয়ারটা ডুম করা···একটা পোকায়-খাওয়া মেয়ের ভালোবাসা কে চায়?

আমি উঠে একা হাঁটতে আরম্ভ করতেই অবিনাশ চেঁচিয়ে বললো, এই কোথায় যাচ্ছিস্? আমাকে একটা ট্যাক্সী ডেকে দে··· চলে যাসনি! একটু ধর, উঠতে পারছি না!

অন্ধকারের মধ্যে আমি ফিরে তাকালুম। মাঠের মধ্যে এক স্তূপ আবর্জনার মতো অবিনাশ এলিয়ে পড়ে আছে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়েই

রইলুম। অবিনাশ অনবরত চেঁচাচ্ছে। শব্দ শুনে একটা চিনে-বাদামওলা এদিকে দেখতে এলো। আমি ফিরে গিয়ে হাত ধরে অবিনাশকে টেনে তুললাম। অবিনাশ বললো, পড়ে যাবার সময় হাতে বড্ড লেগেছে রে! দেখতো ভেঙেছে না কি? একটু ঝাঁকানি দিয়ে টিপে ফিপে দে না? অবিনাশের গা ছুঁতে আমার ইচ্ছে করলো না। আমি বললুম, কিছু হয় নি, যাঃ! অবিনাশ নাকি সুরে বললে, নারে, হাতের মুঠোয় খুব লেগেছে। উফ্। ঠাণ্ডা জল দিয়ে একটু রগড়ে দেনা। তোর লাগে নি?—আমি কোনো উত্তর দিলাম না। বিজ্ঞাপনের লাল আলোগুলোর দিকে চোখ রেখে এগিয়ে গেলাম রাস্তার দিকে। সহজেই একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। ট্যাক্সিতে ওঠার আগে ও বললো, তুই-ও আমার সঙ্গে চল না—

আমি নীরস গলায় বললুম, না।

চল্ না তুজনে মিলে গৌরীর কাছে যাই।

না। তুই আর আমার কাছে কোনোদিন আসিস না।

আঃ? যত তোর বাজে কথা। বেশ করবো আসবো। এখন চল্ না, তুজনে যাই—

না! আমি প্রায় জোর করেই অবিনাশকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম। সেটা চলে যেতেই কান তুটো বেশ ঠাণ্ডা লাগলো। এতক্ষণ ধরে অবিনাশের একঘেয়ে ঘ্যান-ঘ্যানানিতে কানের ফুটো তুটো যেন ভরে যাচ্ছিল। এখন ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকছে টের পাচ্ছি। পুকুরের পাড়ে রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়ালুম। এখানে কিছু কিছু লোক আছে। এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি, আজকের রাতটা বেশ চমৎকার, খুব শীত নেই—বরং মাঠভর্তি ঠাণ্ডা আলো ছায়া। এখানে কিছুক্ষণ একা দাঁড়িয়ে থাকতে খুব খারাপ লাগার কথা নয়। কোথা থেকে যে অবিনাশের মতন লোকেরা এসে হাজির হয়, একলা থাকতে দেয় না। এই রকম জলের ধারে তো একা দাঁড়ালেই ঠিক। আর কিছু তখন মনে পড়ে না। নিজেকে খুব ভালোবাসতে ইচ্ছে হয়।

বুকের কাছটা ভারী ভারী লাগছে। ও, ভোজালিটার জন্য। পকেটে নোট বই বা মানি ব্যাগ রাখার অভ্যেস নেই আমার, আর সারাদিন একটা ভারী জিনিস বয়ে বেড়াচ্ছি। ইচ্ছে হলো, ভোজালিটা গোপনে বার করে জলের মধ্যে ফেলে দিই। ঝুপ করে একটা শব্দ হবে শুধু। ডুবে যাবে না ভাসবে? খাপ শুদ্ধু ফেললে, ডুবে যাবে কিনা ঠিক বলা যায় না। ডুবুক আর ভাসুক, এটাকে ফেলার কোনো মানে হয় না, শখ করে কিনেছিলাম। বরং এটাকে দেয়ালেই ঝুলিয়ে রাখবো আবার। অবিনাশকে তো আমার ছুঁতেই ইচ্ছে করলো না। দেখা যাক, অন্য কারুকে বেছে নিয়ে আবার প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা শুরু করা যায় কিনা!

কাল ইন্দ্রজিৎ নতুন কলেজে ভর্তি হবে, থাকতে হবে কলকাতার বাইরে। আজ থেকেই তার শরীরে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা। সে সর্বক্ষণ ছটফট করছে, খালি মনে হচ্ছে, কিছু যেন ভুল হয়ে গেছে!

তার বাক্স গুছোনো হয়ে গেছে এরই মধ্যে। দু'জোড়া নতুন সার্ট প্যান্ট তৈরী করতে দেওয়া হয়েছিল, দর্জির কাছ থেকে ঠিক সময়ে পাওয়া গেছে। পোস্ট-অফিস থেকে তার নিজের জমানো দু'শ সাতচল্লিশ টাকাও তুলে এনেছে সে। দরকারি কাগজপত্র সব রেডি। তবু ইন্দ্রজিতের মনে হচ্ছে, শেষ মুহূর্তে বোধহয় একটা টেলিগ্রাম আসবে, তোমাকে যেতে হবে না।

ইন্দ্রজিতের ছটফটানি দেখে তার দাদা বললো, ইস, তুই এমন করছিস যেন মনে হচ্ছে বিলেত যাচ্ছিস। এই তো এইখান থেকে ট্রেনে মাত্র তিন ঘণ্টার রাস্তা··

ইন্দ্রজিৎ বললো, সে জন্য না কি!—হোস্টেলে থাকার জায়গা আছে কিনা সে সম্পর্কে এখনো কোনো চিঠি দেয়নি।

দূর বোকা ছেলে! এর আবার আলাদা চিঠি দেবার কি আছে? রেসিডেন্সিয়াল এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ—এখানে সবাই তো হস্টেলে থাকে।

ইন্দ্রজিতের দাদা আর্টসের ছাত্র কিন্তু ভাব দেখাচ্ছে এমন, যেন এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সম্পর্কে ও সব কিছু জানে।

বিকেলে ইন্দ্রজিতের বন্ধুরা কয়েকজন দেখা করতে এসেছে। এদের মধ্যে দু'জন ভর্তি হবার সুযোগ পেয়েছে শিবপুরে আর যাদবপুরে, তিনজন ডাক্তারিতে ঢুকেছে, আর তিনজন কোথাও সুযোগ পায়নি এবার। তারা বাধ্য হয়ে এম, এস-সি, পড়বে, তাই মুখ বিরস।

অলক ভর্তি হয়েছে শিবপুরে, সে ইন্দ্রজিতকে বললো, তুই শিবপুরে চান্স নিলি না কেন? শুধু শুধু অতদূরে যাচ্ছিস।

ইন্দ্রজিৎ বললো, আমি দূরে যেতে চেয়েছি ইচ্ছে করে।

কেন রে?

ইন্দ্রজিৎ দেখলো, তার বোন রূপা বসবার ঘরের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেল রাস্তায়। সেই জন্য ইন্দ্রজিৎ একটু ঢোক গিলে সময় নিল। তারপর গলা নামিয়ে বললো, আমার বহুকালের সখ স্বাধীন ভাবে হস্টেলে থাকা।

যাচ্ছেতাই খাবার দেয়।

দিগ গে! তবু তো সব সময় সেখানে বাবা-দাদার শাসন নেই। নিজের ঘরে ইচ্ছে মতন থাকবো, যখন যা খুশি বই পড়বো—

তোদের হস্টেলে তো গেস্ট হাউস আছে। আমরা মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবো, বুঝলি?

ঠিক আসবি তো?

বন্ধুরা বুঝতে পারছে না, ইন্দ্রজিং ভেতরে ভেতরে কতটা উতলা হয়ে আছে। যেন বন্ধুরা এক্ষুণি চলে গেলেই খুশী হয়। অথচ এই বন্ধুদের সঙ্গে রোজ দেখা না হলে তার ভাত হজম হতো না।

বন্ধুদের সবার ইচ্ছে সেদিন সন্ধ্যাবেলা একটা সিনেমা দেখার। ইন্দ্রজিতকেই দেখাতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, আজ বেরুনো অসম্ভব রে! আমার বড় মামার বাড়ীতে নেমন্তন্ন। একবার যেতেই হবে!

একটু বেশী রাত করে যাবি!

ইম্‌পশিবল! মাকে নিয়ে যেতে হবে, অনেক ঝামেলা আছে। আমি তো আড়াই মাস বাদেই পুজোর ছুটিতে আবার আসছি। তখন সিনেমা দেখাব, কথা দিলাম—

আড়াই মাস বাদে? এর মাঝখানে আসবি না? উইক এণ্ডেই চলে আসতে পারিস্!

দেখি!

বন্ধুদের রাস্তার মোড় পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ইন্দ্রজিৎ আবার ফিরে এলো বাড়িতে। বারবার হাতের ঘড়ি দেখছে।

ইন্দ্রজিতের ঘড়ি ছিল না। তার দাদা উদারতা দেখিয়ে নিজের ঘড়িটা আজ সকালেই দিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রজিতকে। দাদার বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে, তখনতো একটা ঘড়ি পাবেই। হাতে নতুন ঘড়ি পরলে বারবার সময় দেখতে ইচ্ছে করে।

বাড়ি ফিরে আসার পর মা বললে, এখন আর কোথাও বেরুসনি যেন। তোর বড় মামার বাড়িতে আজ নেমন্তন্ন, মনে আছে তো?

মায়ের কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে নিল। তার ভুরু দুটো একটু একটু কাঁপছে। মিথ্যে কথা বলার সময় এই রকম হয়। মায়ের সামনে মিথ্যে কথা বলতে এখনো সে ভয় পায়।

ইন্দ্রজিৎ বলল, আমার না গেলে হয় না?

মা বললেন, দূর পাগল! তোর জন্যই তো বিশেষ করে—

কিন্তু আমাকে যে একজায়গায় যেতে হবে একবার?

কোথায়?

দিব্যর ভীষণ অসুখ। ওর সঙ্গে একবার দেখা না করে গেলে খুব খারাপ দেখাবে। সেই ছোটবেলা থেকে ওর সঙ্গে পড়েছি।

ঠিক আছে, এখন তার সঙ্গে চট করে দেখা করে আয়। তারপর যাবি।

ওরা টালিগঞ্জে থাকে তো। যাতায়াতেই অনেকটা সময় লেগে যাবে। আমি ওখান থেকে সোজা বড় মামার বাড়িতে যাবো। তুমি দাদার সঙ্গে চলে যেও।

ইন্দ্রজিৎ ওপরে নিজের ঘরে গেল জামা-কাপড় বদলাতে। ঘরটা কি রকম খালি দেখাচ্ছে। তার নিজস্ব অনেক জিনিসপত্রই সে দিয়েছে তার ছোট ভাই রুনু আর বোন রূপাকে। যেন সে চিরকালের মতন চলে যাচ্ছে এখান থেকে। সেই রকমই অনেকটা মনে হয়। ইন্দ্রজিৎ তো এর আগে কখনো বাড়ির বাইরে থাকেনি।

সাদা প্যাণ্ট আর সাদা সার্ট পরলো ইন্দ্রজিৎ। তার অনেক রঙিন জামা আছে, তবু এক-একদিন সাদা পরতেই তার ভাল লাগে। জুতো জোড়া সকালেই পালিশ করেছে, তবু আর একবার বুরুশ বুলিয়ে নিল। তার জলতেষ্টা পেয়েছিল, চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে সে অভ্যেসবশতঃ চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছিল, মা, একগ্লাস জল দিয়ে যাও তো! কিন্তু বললো না। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, হস্টেলে গিয়ে তো নিজের সব কাজ নিজেকেই করতে হবে, আজ থেকেই অভ্যেস করা ভালো। নিজের জল গড়িয়ে খাবে সে।

চুল আঁচড়াবার পরও আয়নার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো ইন্দ্রজিৎ। সে নিজেকে দেখছে। এবং অন্য কার উদ্দেশ্যে যেন বললো, আমাকে মনে থাকবে তো?

আয়নার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তন্ময় হয়ে গেল। সে আর নিজেকে দেখছে না। অন্য কারুকে দেখতে পাচ্ছে। তার উদ্দেশ্যেই আবার বললো। মাত্র তো পাঁচ-ছ'টা বছর!

আয়নার কাছ থেকে সরে এসে সে স্যুটকেশ খুলে বেশ কয়েকখানা দশ টাকার নোট পকেটে ভরল। তারপর তরতর করে নেমে এলো সিঁড়ি দিয়ে।

মা বললেন, বেশী দেরী করিস না যেন!

ইন্দ্রজিৎ তখন বললো ,আচ্ছা, ততক্ষণে সে সদর দরজা পেরিয়ে এসেছে। জল খাবার কথা আর মনে পড়লো না তার।

খানিকটা দূর গিয়ে দেখলো তার বোন রূপা বাড়ির দিকে ফিরে আসছে। ইন্দ্রজিৎ একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস ফেললো।

রূপাকে জিজ্ঞেস করলো, কোথায় গিয়েছিলি?

নমিতাদের বাড়িতে।

এখন সেখানে গিয়েছিলি কেন?

এমনিই! কেন, কি হয়েছে?

বাড়িতে এখন সবাই ব্যস্ত হয়ে আছে।

তুমিই তো সবচেয়ে বেশী ব্যস্ত!

তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। বড় মামার বাড়িতে যেতে হবে না।
রূপা একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি এত আগে আগে কোথায় যাচ্ছ?
ইন্দ্রজিৎ বললো এই একটু ঘুরে আসছি। তোর এত কথার দরকার কি? রূপা মুচকি হাসলো। তারপর ধীরে পায়ে হাঁটলো বাড়ির দিকে।
বাসের জন্য পাঁচ মিনিটের বেশী অপেক্ষা করার ধৈর্য হলো না ইন্দ্রজিতের। প্রথম বাসটায় ভিড় দেখেই সে মেজাজের মাথায় একটা ট্যাক্সি নিয়ে ফেললো
ট্যাক্সিটা ময়দানে ঘুরে রেড রোড দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ মাঝপথে ইন্দ্রজিৎ বললো, রোককে, রোককে।
ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে ময়দানের পাশ দিয়ে খুব মন্থর ভাবে হাঁটতে লাগলো। ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে।
সওয়া ছ'টা বাজে। মাথার ওপরে ঝুঁকে আছে সন্ধ্যেবেলা, এখনো নীচে নামেনি। বিকেলের আলো সদ্য ম্লান হতে শুরু করেছে। দূরে চৌরঙ্গির বিজ্ঞাপনের আলোগুলোও সৃষ্টি করে লাল-নীল আভা। রেড রোড দিয়ে মোটর গাড়ি ছুটে যাচ্ছে সট্ সট্ করে।
ভিকটোরিয়া মেমোরিয়াল থেকে বেশ খানিকটা দূরে একটা গাছে ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো ইন্দ্রজিৎ। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করে একটা ধরালো কায়দা করে। তাকে দেখলেই বোঝা যায় সে সদ্য সিগারেট টানতে শিখেছে। তার উনিশ বছরের তাজা মুখে এখন উত্তেজনার আভাস।
ভিকটোরিয়ার সামনে প্রচুর নারী, পুরুষ ও শিশুর ভিড়। অনেক রকম খাবারওয়ালা। কয়েকজন আবার ট্রানজিস্টার বাজাচ্ছে। ইন্দ্রজিৎ একবার তাকাচ্ছে সেই ভিড়ের দিকে, আবার দেখলো ঘড়ি।
এত ব্যগ্রভাবে সে প্রতীক্ষা করছিল, এত তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিল, তবু চন্দনা কখন তার পাশে এসে দাঁড়ালো সে লক্ষ্যই করেনি।

চন্দনা বললো, এই।

ইন্দ্রজিৎ চমকে উঠলো একেবারে।

দু'জনে পরস্পরের দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো, ঠিক যেন চুম্বকে আকৃষ্ট। চুম্বকটা কার শরীরে রয়েছে, তা বোঝা যায় না।

আশেপাশে এত ভীড়, গাড়িঘোড়া, ফেরিওয়ালা—তবু এই সব কিছুর থেকে আলাদা হয়ে যেতে পারে এই ছেলেটি ও মেয়েটি। ওরা পরস্পরের দিকে যেমন গভীরভাবে তাকিয়ে আছে, তেমন গভীর ভাবে পৃথিবীতে আর কেউ তাকাতে পারে না।

তারপর চন্দনা বললো, তুমি কতক্ষণ এসেছো ?

অনেকক্ষণ।

আমি তো দেরি করিনি।

তবু আমার মনে হচ্ছিল, কত ঘণ্টা যেন দাঁড়িয়ে আছি এখানে ভাবছিলাম, তুমি বোধহয় আসবে না। একবার তো রূপাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দেখে ভয় পেয়েছিলাম। রূপা যদি তোমাদের বাড়িতে যেত—তা হলে তুমি বেরুতে না!

আচ্ছা রূপা কি আমাদের কথা জানে ?

কি জানি ! তুমি কিছু বলেছো ?

পাগল নাকি ! কিন্তু রূপা ভীষণ বুদ্ধিমতী।

আমি তাই ভাবছিলাম, হঠাৎ যদি রূপা তোমাদের বাড়ি যায় !

চন্দনা একটু হেসে বললে, তাও তো অনেক কষ্ট করে বেরুতে হলো। কত মিথ্যে যে বলতে হয় তোমার জন্যে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, আর বলতে হবে না। কাল থেকে তো আমি আর থাকবোই না।

মাসে একবার আসবে তো ?

তার কি কোন ঠিক আছে ? হস্টেলের নিয়মকানুন কিছুই জানি না।

ওসব জানি না. তোমাকে আসতেই হবে।

কথা বলতে বলতে দু'জন এগিয়ে গেল মাঠের মধ্যে। পুলিশ পোস্টের পাশ দিয়ে এগিয়ে গেল আর একটু দূরে একটা কালভার্ট খালি ছিল, সেখানে চন্দনা বসতে যাচ্ছে, ইন্দ্রজিৎ বললো, একটু দাঁড়াও! পকেট থেকে রুমাল বার করে জায়গাটা ঝেড়ে দিয়ে চন্দনাকে বললো, বসো?

চন্দনা বললো, রুমালটা পাতার দরকার নেই। কেন ময়লা করছো শুধু শুধু।

ইন্দ্রজিৎ বললো, কিছু হবে না। আমার ইচ্ছে করছে। তুমি বসো।

চন্দনা বললো, বেশীক্ষণ থাকতে পারবো না কিন্তু!

তুমি তো এসেই খালি যাবার কথা বলো। আজ আমি সহজে ছাড়ছি না।

না. লক্ষ্মীটি। এক ঘণ্টা থাকবো তার বেশী নয়। বাস থেকে নামছি, অমনি সুব্রতদার সঙ্গে দেখা। দু'জন বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, এদিকে কোথায় যাচ্ছিস? আমি তাড়াতাড়ি বানিয়ে বললাম, ব্রিটিশ কাউন্সিল থেকে বই নিতে এসেছি। সেইজন্যই তো ঐ দিক দিয়ে আমাকে ঘুরে আসতে হলো।

চন্দনাদের বাড়ির একতলার ফ্ল্যাটে থাকে সুব্রত। ইন্দ্রজিতের চেয়ে বছর আষ্টেকের বড়, ভালো ক্রিকেট খেলে, পঙ্কজ রায়ের প্রিয় শিষ্য।

ইন্দ্রজিৎ রেগে গিয়ে বললো, সুব্রতদা কি তোমার গার্জেন না কি?

চন্দনা বললে, না, তা নয়। সুব্রতদা কিছু বলেন না। বেশী দেরী করে ফিরলে,...ওদের ঘর থেকে দেখা যায় তো...ব্রিটিশ কাউন্সিল আবার ৮টায় বন্ধ হয়ে যায়।

সে জন্য সুব্রতদাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে?

বারে, একে কৈফিয়ৎ বলে নাকি? উনি এমনিই জিজ্ঞেস করলেন।

বলবে আমার যেখানে খুশী গিয়েছিলাম।

ওরকম ভাবে বুঝি বলা যায়?

নিশ্চয়ই বলা যায়। তোমার বাবা, দাদা আছেন তোমাকে শাসন করার জন্য।

একটু থেমে ইন্দ্রজিৎ আবার বললো, সুব্রতদার বেশ মজা। একই বাড়িতে থাকে—তোমাকে সারাদিন দেখতে পারে, যখন খুশি গল্প করতে পারে—তুমি সুব্রতদার ফ্ল্যাটে দিনে ক'বার যাও?

চন্দনা আরক্ত হয়ে বললো, এই ওরকম করে বলো না। উনি খুব ভালো লোক। কক্ষণো খারাপ কিছু বলেন না।

ওরকম অনেক ভালো লোক আমার দেখা আছে।

তুমি কাল চলে যাচ্ছো, আর আজ আমার সঙ্গে এই রকম বকে বকে কথা বলবে?

এদিক-ওদিক তাকিয়ে চন্দনা আস্তে আস্তে তার হাতটা ইন্দ্রজিতের হাতের ওপর রাখলো। তাতেই বুক জুড়িয়ে গেল ইন্দ্রজিতের সামান্য একটু সরে এলো চন্দনার দিকে।

আমি কাল চলে যাবো বলে তোমার মন খারাপ হচ্ছে?

ভীষণ।

পাঁচটা তো বছর মোটে। দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

তুমি মাসে একবার করে আসবে কথা দাও।

তা বলতে পারছি না। তবে পুজোর সময় তো আসবোই।

পুজোর সময় আবার আমি থাকবো না। আমাদের বাড়ির সকলের পুরী যাওয়ার কথা হচ্ছে। ভালো লাগে না।

সুব্রতদাও সঙ্গে যাচ্ছে না কি!

আবার একথা? আমি এক্ষুনি চলে যাবো তা হ'লে।

সুব্রতর ব্যাপারে ইন্দ্রজিতের হৃদয় অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বস্তুত অন্য কোনো ছেলে যদি চন্দনার সঙ্গে একটা কথা বলে, তাও ইন্দ্রজিৎ সহ্য

করতে পারে না। তার ধারণা চন্দনা তার একার নিজস্ব।

সে চন্দনার হাতে একটা চাপ দিল তারপর জিজ্ঞেস করলো, আমাকে চিঠি লিখবে তো? প্রত্যেক সপ্তাহে?

আর তুমি?

তোমাদের বাড়িতে চিঠি লেখা যাবে?

তুমি চিঠির তলায় একটা কোনো মেয়ের নাম দিও।

আর হাতের লেখা?

অত কেউ লক্ষ্য করবে না।

কোন্ মেয়ের নাম দেবো?

যে কোনো একটা। তোমার তো এত মেয়ে বন্ধু তাদের যে-কারুর নাম বসিয়ে দিও!

ইন্দ্রজিৎ এবার হেসে ফেললো। হাসতে হাসতে বললো, আমার অনেক মেয়ে বন্ধু বুঝি?

চন্দনা সূক্ষ্ম ঠাট্টার সুরে বললো, নেই? সেদিন রবীন্দ্রসদনে যে দেখলাম, তুমি ডান পাশে সিঁথি কাটা একটা মেয়ের সঙ্গে খুব হেসে হেসে কথা বলছো? কচি কলাপাতা রঙের শাড়ী পরা—

কবে? ও, সে তপনের বোন ঝুমা। বিয়ে হয়ে গেছে! বাবা, একজনের সঙ্গে একটু কথা বলেছি, তাতেই—

তুমি যে সুব্রতদার নামে এই রকম করে বলো?

ইন্দ্রজিৎ হো হো করে হেসে উঠলো। মনে আর গ্লানি নেই। এখন সুব্রতদার ব্যাপারে কাটাকাটি হয়ে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, শোনো আমি চিঠির তলায় নাম দেবো কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তো কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানের দারুণ ভক্ত।

হাসতে হাসতেই বললো, বাবা, তোমাদের কি রকম মনে থাকে! ডানপাশে সিঁথি—কচি কলাপাতা রঙের শাড়ী—অথচ প্রায় ছ'মাস আগের কথা।

থাকবেই তো। মেয়েদের সব মনে থাকে।

আমার ভালো লাগে সুচিত্রা মিত্রের।

যাই বলো, কতগুলো গান আছে, যা কণিকার গলায়—

এরপর কিছুক্ষণ ওরা দু'জনে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে তর্কাতর্কি করলো সেই তর্ক শেষ হলো চন্দনার গানে। চন্দনা গুনগুন করে গাইলো, সকরুণ বেণু বাজায়ে কে যায় বিদেশী নায়ে—

এক সময় ইন্দ্রজিতও আস্তে আস্তে গলা মেলালো। তারও গানের গলা মন্দ নয়।

দু'তিনটি ছেলে কাছ দিয়ে কয়েকবার ঘোরাঘুরি করছিল। তাদের দৃষ্টি ভালো নয়। তাঁরা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে খারাপ কথা বলছে, নিজেদের মধ্যেই অবশ্য।

ইন্দ্রজিৎ উঠে পড়ে বললো, চলো।

চন্দনা উঠে এলো। বেশ খানিকটা চলে আসার পর খেয়াল হলো রুমালটা নিয়ে আসা হয়নি। সেখানেই পড়ে আছে।

চন্দনা বললো, আমি এখানে দাঁড়াচ্ছি। যাও নিয়ে এসো।

চন্দনা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালো সেই ছেলেগুলোর দিকে। যারা রাস্তায়-পার্কে খারাপ খারাপ কথা বলে, তাদের সম্পর্কে চন্দনার খুব মায়া হয়। আহা, ওদের কেউ ভালোবাসে নি! কেউ ভালোবাসলে কি আর এরকম রুক্ষ গলায় কথা বলতো!

ইন্দ্রজিৎ দৌড়ে চলে গেল। ফিরে এলো খালি হাতে। এসে বললো, ওটা গেছে! হাওয়ায় উড়ে নিচের ময়লা জলে পড়েছে দেখলাম।

তোমার বড্ড ভুলো মন। রুমালটা নতুন ছিল না?

যাক গে। ভারি তো একটা রুমাল!

তুমি এরকম জিনিসপত্তর হারাও, হস্টেলে গিয়ে যে কি করবে? একা একা থাকতে হবে।

একা কোথায়? এবার তিনশো আটাত্তর জন সিলেকটেড হয়েছে।

তা হলেও, তোমার চেনা তো কেউ নেই। তোমার বন্ধুরা তো কেউ ওখানে ভর্তি হয়নি।

দুদিনেই অনেক বন্ধু হয়ে যাবে।

অনেক বন্ধু পেয়ে তারপর আমাকে ভুলে যাবে তো ?

ইন্দ্রজিৎ আবার সেই চুম্বক আকৃষ্ট চোখে তাকালো চন্দনার দিকে। তার হাসিমাখা ঠোঁটে বললো, হ্যাঁ ভুলে যাবো। তোমাকে একদম ভুলে যাবো। আর কোনদিনও মনে পড়বে না, তুমি খুশী হবে তো ?

এবার চন্দনার পালা। সেও একই রকম চোখে তাকিয়ে বললো সেদিন তুমি আমাকে ভুলে যাবে, সেই দিনই আমি মরে যাবো। দেখো, ঠিক সেই দিনই মরে যাবো।

আর যদি কোনদিন না ভুলি, তা হলে তুমি চিরকাল বেঁচে থাকবে ? বলো ?

ওরা সদ্য কৈশোর পেরিয়েছে, তাই অনায়াসেই এই রকম কথা বলতে পারে। পৃথিবীটা কত সুন্দর। ভবিষ্যত জীবনের কত সম্ভাবনা। সামান্য কথাতেই দুঃখ কিংবা আনন্দ। ওদের অভিমানও খুব তীব্র।

যার এই বয়সটা পেরিয়ে গেছে অনেক দিন, তাদের কাছে মনে হয়, এই সবই ছেলেমানুষী কিংবা বোকা-বোকা প্রেমের কথা। পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়, প্রেমও নয়। তবু ঐ কৈশোরের-যৌবনের দিনগুলিতে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে।

চন্দনার হলুদ সিল্কের শাড়ীটা মাঝে মাঝে বেসামাল হয়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। কলেজের ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হওয়ার পর থেকে চন্দনা নিয়মিত শাড়ী পড়তে শুরু করেছে, এর আগে শুধু বিয়ে বাড়ীতে শাড়ী পরে যেত। এখনও ভালো করে শাড়ী সামলাতে শেখেনি। আঁচলটা গা থেকে সরে গেলেই সে লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে। ইন্দ্রজিৎ তার দিকে তাকিয়ে হাসে। এক এক বার চোখ ফিরিয়ে নেয়, আবার তাকায়।

চন্দনা বললো, আমরা এদিকে কোথায় যাচ্ছি ?

ইন্দ্রজিৎ বললো, বাঃ মনে নেই। আজ আমি তোমাকে খাওয়াবো

বলেছিলাম।
চন্দনা ব্যস্ত হয়ে বললো, না, না, আজ থাক।
কেন?
অনেক দেরি হয়ে যাবে।
কিছু দেরি হবে না।
কেউ দেখে-টেখে ফেলবে।
কেউ দেখবে না। আমি ওয়াটগঞ্জে একটা খুব নিরিবিলি চীনে রেস্তোরাঁ দেখে এসেছি। সেখানে কেউ যাবে না।
আজ থাক না বাবা?
ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কড়া গলায় বললো, তুমি যাবে কি যাবে না? আমার সঙ্গে তোমার কোথাও যাবার ইচ্ছে নেই?
চন্দনাও দাঁড়িয়ে পড়ে তেজের সঙ্গে বললো, ঠিক আছে, আজ সারারাত ফিরবো না। রাজি?
তুমি পারবে?
তুমি পারবে কি না বলো?
আচ্ছা দেখা যাক্। আজ সারারাত রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো।
হাঁটতে হাঁটতেই ওরা চলে এলো একটা নিরিবিলি রেস্টুরেণ্টের কাছে। ওদের সৌভাগ্যবশতঃ একটা ক্যাবিন খালি ছিল।
সেখানে ঢুকে ইন্দ্রজিৎ একগাদা খাবারের অর্ডার দিল। চন্দনার কোনো আপত্তিই শুনলো না।
বেয়ারা অর্ডার নিয়ে চলে যাবার পর ইন্দ্রজিৎ টেবিলের উপর থেকে চন্দনার কোমল দক্ষিণ হাত তুলে নিল নিজের হাতে। তারপর বললো, তোমার হাতের পাতাটা ঠিক করমচার মত লাল।
হাত ছাড়িয়ে নিয়ে চন্দনা বললো, এই, আমাকে দশটা পয়সা দাও তো।
অবাক হয়ে ইন্দ্রজিৎ বললো, দশ পয়সা? কি হবে?
দাও না, দরকার আছে।

এখন ?

হঁ্যা।

ভ্যাবাচ্যাকা ইন্দ্রজিৎ পয়সাটা বার করে দিল। চন্দনা নিজের হাতে ব্যাগ খুলে বার করলো একটা রুমালের প্যাকেট।

সেটা ইন্দ্রজিতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, এতে ছ'খানা রুমাল আছে, আমি তোমাকে দশ পয়সায় বিক্রি করলাম।

তার মানে ?

রুমাল কারুকে এমনি এমনি দিতে নেই। জানো না ?

যত সব কুসংস্কার।

চন্দনা এক ধমক দিয়ে বললো, রুমালগুলো হাতে নিয়ে একবার দেখলেও না পর্যন্ত! পছন্দ হয়েছে কি-না বলো ?

প্যাকেটটা হাতে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ বললো, তুমি কেন শুধু শুধু এগুলো কিনতে গেলে। আমার তো রুমাল আছে অনেক—

যেরকম ভাবে হারাচ্ছো, দেখলাম তো।

খুব চমৎকার। যাক বাবা, খুব সস্তায় রুমাল পাওয়া গেল! মাঝে মাঝে এরকম বিক্রি করো আমাকে, কেমন ?

আ-হা-হা।

এই শোনো, সেই জিনিসটা এনেছো তো ?

এবার লজ্জায় একেবারে রক্তিম হয়ে গেল চন্দনার মুখ। সে মুখ নীচু করে বললো, না আনিনি।

কেন ?

ধ্যাৎ! কি হবে ?

ইন্দ্রজিৎ চটে উঠে বললো, তোমাকে এত করে বললাম—তবু তুমি আনলে না ? দেখি, তোমার ব্যাগ দেখি ?

না, না, ব্যাগে কিছু নেই।

আনো নি কেন ?

এমনিই।

দেখি, ব্যাগটা আমাকে দেখাও।

চন্দনা ব্যাগটা লুকোতে চায় ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়িয়ে—ঝুঁকে সেটা জোর করে কেড়ে নিল। ব্যাগটা খুলতেই দেখতে পেল চন্দনার একটা ছবি।

ছাদের ওপর কতকগুলো ফুল গাছের টবের পাশে চন্দনা দাঁড়িয়ে আছে। চিবুক উঁচু করে দেখছে আকাশ। আঁচলটা উড়ছে হাওয়ায়।

গাঢ় চোখে ছবিখানার দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ বললো, কে তুলেছিল ছবিটা ?

সুব্রতদা। আরো অনেকের তুলেছিল।

এবার সুব্রতদার নাম শুনেও রাগ করলো না ইন্দ্রজিৎ। খানিকটা উদার ভাবেই বললো, বেশ ভালো ছবি তোলেন তো। অবশ্য, ছবির সাবজেক্ট যদি ভালো হয়—

সুব্রতদা সত্যিই খুব ভালো ছবি তোলেন।

সুব্রতদা তো অনেক কিছুই ভালো পারেন।

তোমার সঙ্গে আলাপ হলে দেখবে।

খুব একটা ইচ্ছে নেই আলাপ করার। যাই হোক, ছবিটার জন্য ধন্যবাদ জানিও।

টপ করে ছবিতে একটা চুমু খেয়ে ফেললো ইন্দ্রজিৎ। চন্দনা বললো, খুব অসভ্য হয়েছো, না ?

তখন চন্দনার বাস্তব ঠোঁটে একটু ঠোঁট ছোঁয়াবার জন্য ইন্দ্রজিৎ ব্যাকুলতা বোধ করে। ক্যাবিনের পর্দার ফাঁক দিয়ে সে বাইরের দিকে তাকায়। আর কেউ তাদের লক্ষ্য করছে না তো ?

ইন্দ্রজিৎ বসেছিল টেবিলের বিপরীত দিকে। চন্দনার পাশে আর একটা চেয়ার খালি পড়ে আছে।

ইন্দ্রজিৎ মিনতি করে বললো, চন্দনা, আমি তোমার পাশে ঐখানটায় গিয়ে বসবো ?

চন্দনা চোখ পাকিয়ে বললো, না।

তবু ইন্দ্রজিৎ উঠতে যাচ্ছিল, এই সময় বেরসিকের মতন বেয়ারা

ঢুকলো খাবার নিয়ে। তখন ইন্দ্রজিৎ এমন একটা ভাব দেখালো যেন প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট-দেশলাই বার করার জন্য তাকে উঠে দাঁড়াতে হচ্ছে। আবার বসে পড়লো ধপ করে।

চন্দনা মুচকি হেসে বললো, ওসব চলবে না।

ইন্দ্রজিৎ বললো, তুমি বড্ড নিষ্ঠুর!

চন্দনা বললো, স্যুপ ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, খাও তো!

একটু বাদে চন্দনা দেখলো, ইন্দ্রজিৎ বিশেষ কিছু খাচ্ছে না। খাবার নিয়ে নাড়াচাড়া করছে শুধু।

চন্দনা আরও খাবার ইন্দ্রজিতের প্লেটে তুলে দিয়ে বললো, এই তুমি খাচ্ছো না যে?

আর কত খাবো?

বাঃ, এত খাবার নষ্ট হবে না কি?

ইন্দ্রজিত হাসতে হাসতে বললো, এরপর আমাকে কোথায় যেতে হবে জানো? বড়মামার বাড়িতে নেমন্তন্ন, সেখানে গিয়ে আবার খেতে হবে।

চন্দনা শিউরে উঠে বললো, এরপর তুমি আবার খাবে?

কি করবো? সেখানে গিয়ে তো বলতে পারবো না যে খেয়ে এসেছি!

তা হলে এখানে আজ এলে কেন? আমি বারণ করেছিলুম কত—

বেশ করেছি। আমার ইচ্ছে।

খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর ইন্দ্রজিৎ দাম মিটিয়ে দিয়েছে। বেয়ারাকে উদার হাতে দিয়েছে বখশিস। চন্দনা আর দেরি করতে পারবে না, তক্ষুণি উঠবে। ব্যাগটা তুলে নিয়ে সে সবেমাত্র মুখ তুলেছে, ইন্দ্রজিৎ ঝট করে তাকে জড়িয়ে ধরে টপ করে একটা চুমু খেয়ে ফেললো।

চন্দনা বাধা দেবার সময়ও পেল না। ইন্দ্রজিৎ তার পরেই দ্রুত সরে গিয়ে পর্দা তুলে বললো, এসো!

দোকান থেকে বাইরে বেরুবার পর বেশ কিছুক্ষণ পর্যন্ত কেউ একটাও

কথা বললো না। ইন্দ্রজিৎ ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে চন্দনার দিকে। চন্দনা একবারও ইন্দ্রজিতের দিকে তাকায়নি।

ইন্দ্রজিৎ চন্দনার বাহু আলতোভাবে ছুঁয়ে বললো, তুমি রাগ করেছো?

চন্দনা মুখ না তুলেই বললো, আমার কান্না পাচ্ছে।

কেন?

তুমি কেন এরকম করলে?

ইন্দ্রজিৎ এবার চন্দনার হাত শক্ত করে চেপে ধরে বললো, তুমি তো সম্পূর্ণ আমার। তুমি আমার না?

চন্দনা চুপ।

বলো, তুমি আমার না?

হ্যাঁ।

তাহলে? আমি তোমাকে একটু ইচ্ছে মতন আদর করতেও পারবো না? সেটা কি দোষ?

একটুক্ষণ থেমে চন্দনা বললো, এরকম ভাবে নয়। এইসব জায়গায় নয়। আমার ভীষণ লজ্জা করে।

চন্দনার গলায় এমন একটা ব্যাকুলতা ছিল যা ইন্দ্রজিতকে তৎক্ষণাৎ স্পর্শ করলো। সে অনুতপ্ত ভাবে বললো, আচ্ছা, কথা দিচ্ছি এরকম আর কক্ষণো করবো না। লোকজনের সামনে তোমাকে লজ্জায় ফেলবো না! তুমি শুধু গোপনে গোপনে আমার থাকবে।

।। দুই ।।

ইন্দ্রজিতের বাবা ওকে নিজে গিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবেন, ইন্দ্রজিতের এটা একেবারেই পছন্দ নয়। সে বড় হয়েছে, সে কি একা যেতে পারে না? অ্যাডমিশান টেস্টের সময় তো দাদাই গিয়েছিলই সঙ্গে। এখন তো আর কারুর যাবার দরকার নেই। ইন্দ্রজিৎ একথা মাকে কতবার বলেছে। কিন্তু বাবা যাবেনই।

বাবার মুখের ওপর কোন কথা বলার সাহস ইন্দ্রজিতের নেই। বাধ্য হয়ে তাকে মেনে নিতে হলো।

দুপুরে বাড়ি থেকে সকাল সকাল খেয়েই বেরিয়েছিল ওরা। ওখানকার স্টেশনে পৌছালো বিকেল চারটের সময়। বাবা স্টেশন থেকে একগাদা ফল ও কেক কিনে নিলেন। প্রথম দিনই হোস্টেলে কি খেতে দেয়, না দেয়, তার ঠিক কি।

তারপর একটা সাইকেল রিক্সা নিলেন। স্টেশন থেকে কলেজ বেশ দূরের রাস্তা। সুটকেশ বেডিং সমেত দু'জনে সেই একই রিক্সা চাপায় বেশ জবরজং অবস্থায় ইন্দ্রজিতকে পা গুটিয়ে বসতে হয়েছে।

খানিকটা পথ যাবার পর বাবা বললেন, খোকা তোকে একটা কথা বলবো, শুনবি ?

ইন্দ্রজিৎ বাবার মুখের দিকে তাকালো।

বাবা বললেন, সব সময় মনে রাখবি, তোকে ভালো রেজাল্ট করতে হবে, তোকে বড় ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে। অনেক কষ্ট করে তোকে লেখাপড়া শেখাচ্ছি।

ইন্দ্রজিতরা ধনী নয়, সাধারণ সংক্ষিপ্ত সংসার। তার বাবা একটি অফিসে মোটামুটি উঁচু পদে চাকরি করেন। রিটায়ার করার দিন এগিয়ে আসছে। ইন্দ্রজিতকে হস্টেলে রেখে পড়াবার বেশ খরচ— ইন্দ্রজিৎ তা বোঝে। সে চুপ করে রইলো।

বাবা আবার বললেন, ছোটবেলায় আমারও খুব ইচ্ছে ছিল ইঞ্জিনিয়ার হবার। আমার বাবা আমাকে পড়াতে পারেননি, সাধ্যে কুলোয়নি। তাই খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। ছোট ছিলাম তো, অত বুঝিনি। তারপর ভেবেছিলাম, আমার কোনো ছেলে হলে, তাকে আমি ইঞ্জিনিয়ার করবোই। তোর দাদা তো নিজে ইচ্ছে করেই আর্টস পড়লো—সায়েন্সে মাথা নেই। এখন তোর ওপর ভরসা

ইন্দ্রজিৎ মুখে কিছু বললো না। মনে মনে বললো, বাবা, আমি আপনার কথা রাখবো। আপনি দেখবেন, আমি একদিন খুব বড়

হবো।

হস্টেলে অনেক ছেলে ফাঁকি-টাকি দেয়। তাদের সঙ্গে মিশবি না। আবার ভালো ছেলেও আছে। যার ইচ্ছে থাকে, সে ঠিক পড়াশুনো করতে পারে। আর সব সময় শরীরের যত্ন নিবি।

আর একটা রিক্সা ঠিক ওদের পেছনে আসছিল। তাতেও একজন প্রৌঢ় লোকের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের বয়েসী একটি ছেলে। পায়ের কাছে বাক্সবিছানা, একই কলেজের ছেলে বলে মনে হলো।

কলেজের কম্পাউণ্ডের কাছে পৌঁছে রিক্সা থেকে নামার পর সেই ছেলেটি নিজে থেকেই আলাপ করতে এলো ইন্দ্রজিতের সঙ্গে। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনার কি সিভিল না ইলেকট্রিকাল ?

ইন্দ্রজিৎ বললো, সিভিল।

ছেলেটি বললো, আমারও তাই। ভালোই হলো, একই সঙ্গে থাকা যাবে। আমার নাম অরূপ বসু।

ইন্দ্রজিৎ নিজের নাম জানালো।

ইন্দ্রজিৎ লাজুক মুখে চুপ করে রইলো। বাবা তাকে উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু সে কি কখনো পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়েছে? সে তো নিজেই চায় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গিয়ে চাকরি নিতে। তারপর—

অরূপ ছেলেটি রোগা পাতলা, গায়ের রং অসম্ভব ফর্সা। মুখখানা দেখলে বেশ বুদ্ধিমান বলে মনে হয়। সে এসেছে বোলপুর থেকে. অল্পক্ষণের মধ্যেই ওদের দু'জনের বেশ ভাব হয়ে গেল।

এদিকে অরূপের বাবার সঙ্গেও আলাপ জমে উঠলো ইন্দ্রজিতের বাবার। এক ঘণ্টা পরে ট্রেন, ওরা একই সঙ্গে ফিরবেন।

একটু বাদেই কিন্তু জানা গেল যে অরূপ আর ইন্দ্রজিতের একই ওয়ার্ডে থাকবার জায়গা হয়নি। অরূপের ঘর আবুল কালাম আজাদ ওয়ার্ডে আর ইন্দ্রজিতের সর্দার বল্লবভাই প্যাটেল ওয়ার্ডে। সুপারিনটেণ্ডেণ্টের কাছে দুই পিতাই অনেক করে অনুরোধ করলেন, যাতে ওদের ঘরে না হোক এক বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়।

তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না, সব নতুন ছেলেদের এক সঙ্গে থাকতে দেওয়ার নিয়ম নেই। নতুন পুরোনোদের মিলে মিশে থাকাই নিয়ম।

বাবা বললেন, তবু যদি একটু দেখেন, মানে ও তো আগে কোথাও একা থাকেনি এর আগে, এই প্রথম...

সুপারিনটেণ্ডেণ্ট ভারিক্কী চালে জবাব দিলেন, জীবনের সব কাজই কোনো না কোনো সময়ে প্রথমবারই করতে হয়। অযথা চিন্তা করছেন কেন?

ইন্দ্রজিতের বাবা ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এলেন তার ঘর দেখতে। ঘর বেশ ভালোই, তিনতলার ওপরে, যথেষ্ট আলো হাওয়া--দক্ষিণ দিকে বিরাট জানলা।

কলেজ এখন ছুটি! দু'দিন পরে ক্লাস আরম্ভ হবে—তাই বাইরের ছেলেরা অনেকে আসেনি। হোস্টেলটা নিস্তব্ধ মনে হচ্ছিল।

সিঁড়ির কাছে দুটি ছেলেকে দেখে বাবা বললেন, বাবা, আমার ছেলেটাকে রেখে গেলাম, তোমরা একটু দেখো।

একথা শুনে এমন লজ্জা করলো ইন্দ্রজিতের। সে কি বাচ্চা ছেলে না কি! বাবাদের নিয়ে আর পারা যায় না।

ছেলে দুটি খুবই সম্ভ্রমের সঙ্গে বললো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই! আপনি কিছু চিন্তা করবেন না। ওর কোনো অসুবিধে হবে না।

বাবা বললেন, তোমরা সব রয়েছো, বড় ভাইয়ের মতন।

নিশ্চয়ই। কোনো অসুবিধে হলে আমরা তো আছিই।

এখানকার খাওয়া দাওয়া?

চমৎকার! বাড়ির চেয়ে ভালো।

ইন্দ্রজিৎ বাবাকে পৌছে দিয়ে এলো গেট পর্যন্ত। তিনি অরূপের বাবার সঙ্গে এক রিক্সায় চলে গেলেন।

ইন্দ্রজিৎ ফিরে এলো নিজের ঘরে। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে। বিকেলে আর কিছু খেতে দেবে না বোধহয়। সঙ্গে কিনে আনা কমলালেবু খেতে লাগলো খোসা ছাড়িয়ে।

ঘরটা তার খুব পছন্দ হয়েছে। বারান্দার এক কোণে, ছোট নিরিবিলি। ইন্দ্রজিৎ এর আগে কখনো একা ঘরে শোয়নি। তার বহুদিনের শখ একা থাকার। বাবার কথা রাখবে সে, এই ক'টা বছর খুব মন দিয়ে পড়াশুনো করবে।

জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেই একটু যেন মন খারাপ লাগে। বাবা বোধ হয় এখনো স্টেশনে পৌঁছোননি। বাবাকে রিক্সায় তুলে দেবার ঠিক আগের মুহূর্তে হঠাৎ চোখে জল এসে গিয়েছিল ইন্দ্রজিতের যদিও কোনো মানেই হয় না। কলকাতা এত কাছে। সাড়ে পাঁচ টাকার টিকিট কেটে যে কোনো দিনই যাওয়া যায়। তবু যেন মনে হচ্ছে বাড়ি থেকে কত দূরে একা, কেউ চেনে না—।

এই সব জায়গায় হঠাৎ যেন ঝুপ ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে। দরজার পাশে সুইচ, সে আগেই দেখে রেখেছিল। আলো জ্বালতে এসে সে দারুণ জোরে একটা ধাক্কা খেল। যেন ভূতে ঠ্যালা মারলো তাকে।

ইন্দ্রজিৎ চমকে গিয়ে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল, কোনোক্রমে সামলে নিল নিজেকে। ব্যাপারটা সে বুঝতে পেরেছে, ইলেকট্রিক শক। পকেট থেকে দেশলাই বার করে জ্বেলে দেখলো, সুইচের ওপরের ঢাকনাগুলো কে খুলে নিয়ে গেছে। একটু আগেও সে দেখেছিল না? কিংবা ভুল দেখেছে?

এরকম খোলা সুইচ রাখা খুব বিপজ্জনক। হোস্টেলের সুপার এ সব দেখেন না? প্রথম দিন এসেই কি ইন্দ্রজিৎ কমপ্লেন করবে?

কাঠের চেয়ারটা টেনে এনে ইন্দ্রজিৎ তার ওপর দাঁড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বাললো। তারপর দরজা বন্ধ করে পোষাক বদলাতে লাগলো সে।

তক্ষুণি দরজায় টক টক আওয়াজ। তাড়াতাড়ি প্যান্টের বোতাম আটকে ইন্দ্রজিৎ দরজা খুললো।

বাইরে সাত আটজন ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে একটু আগে সিঁড়িতে দেখা সেই দু'জনও রয়েছে।

সেই দু'জনেরই মধ্যে একজন বললো এই যে ভাই, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।

ইন্দ্রজিৎ বিনীতভাবে বললো, আসুন, আসুন।

ইন্দ্রজিৎ দেখলো, সেই ছেলের অনেকের হাতে একটি করে টর্চ দু' একজনের হাতে হকি ষ্টিক। বোধহয়, এখানে প্রায়ই আলো নিভে যায়।

লম্বা মতন একটি ছেলে বললো, তোমার বাবা বলে গেছেন শুনেছো তো, আমরা তোমার দাদা হই? এখন থেকে আমাদের সঙ্গে দাদার মতন ব্যবহার করবে। আমাদের নামগুলো বলছি, শুনে নাও! আমাদের নাম সত্যেন, এ ধনঞ্জয়, এ নায়ার, ঐ যে পৃথ্বীপাল, ওর নাম সুলেমান, ও ফিরদৌস, আর ঐ সুব্রত। এবার বলে যাও তো তুমি কার কি নাম—দেখি কি রকম মনে রাখতে পারো?

একবার মাত্র শুনেই এতগুলো নাম মনে রাখা শক্ত। তবু ইন্দ্রজিৎ খুব চেষ্টা করে বলবার চেষ্টা করলো। একটা ভুল হল তার।

সত্যেন নামের ছেলেটি বললো, এক পয়েণ্ট লস্। পৃথ্বীপাল, যার নাম ইন্দ্রজিৎ ঠিক বলতে পারেনি—সে বললো, আই হ্যাভ্ গেইনড ওয়ান পয়েণ্ট।

ইন্দ্রজিৎ ব্যাপারটা বুঝতে পারলো না।

সত্যেন বললো, শোনো, এখানে নতুন এসেছো, কয়েকটা নিয়ম-কানুন জানতে হবে। সকলের সঙ্গে মিশতে হবে, সকলের কথা শুনতে হবে। এখানে সারা ভারত থেকে ছাত্র আসে, এখানে কেউ একা একা থাকে না। আর একটা কথা, ভেতো বাঙালী হয়ে থাকলে কোনো দিন ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে না। অ্যাডমিশান টেস্টে পাস করলেও আরও কয়েকটা পরীক্ষা দিতে হবে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, নিশ্চয়ই। আপনারা যা যা বললেন, আমি তাই শুনবো।

ঠিক আছে। বসো, ঐ চেয়ারটায়।

ইন্দ্রজিৎ চেয়ারে বসা মাত্র একজন হকি ষ্টিকের খোঁচা দিয়ে নিভিয়ে

দিল আলো। সঙ্গে সঙ্গে সাত আটটা টর্চের আলো পড়লো তার চোখে।

ইন্দ্রজিৎ দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো।

একজন বজ্র গম্ভীর কণ্ঠে হুকুম দিল, চোখ খোল!

ইন্দ্রজিৎ হাত সরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারলো না। চোখ একেবারে ঝলসে যাচ্ছে যেন। বললো, পারছি, না!

একজন বললো এ কি, শুরুতেই কাৎ? চোখ খোল শালা?

ইন্দ্রজিৎ হাত সরিয়ে চোখ পিট পিট করতে লাগল।

নাম কি?

ইন্দ্রজিৎ সরকার।

বাবার নাম?

নিকুঞ্জলাল সরকার।

ঠাকুর্দার নাম?

গোকুলবিহারী সরকার।

ঠাকুর্দার বাবার নাম?

ইয়ে মানে—

এক পয়েন্ট। শালা, বাপের ঠাকুর্দার নাম আমরাও কেউ জানি না। তুই বানিয়ে বলতে পারলি না? আচ্ছা, এবার বল, এটু দা পাওয়ার এন × এটু দা পাওয়ার এন কত হয়?

জানি না!

কিছুই হয় না। সেটুকুও জানিস না। আর এক পয়েন্ট। আচ্ছা বল, ইনফ্রা স্টাকচার কাকে বলে?

কোনো কিছু প্রডাকশনের সঙ্গে যা যা দরকারী, যেমন ট্রান্সপোর্ট, ইলেকট্রিসিটি, রাস্তা।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। এবার বল, আমার বাবা একটা বাঞ্চোত?

কি?

কানে শুনতে পাস না?

আপনারা এই সব খারাপ কথা বলছেন কেন?

খারাপ কথা? হে হে হে হে। খারাপ কথার তুই কি বুঝিস? যা বলছি তাই বল্।

ও কথা আমি বলবো কেন?

আমরা হুকুম করছি, তাই বলবি।

না!

সবাই এক সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। টর্চ হাতে নিয়ে সবাই এগিয়ে আসতে লাগলো আরও কাছে। ইন্দ্রজিৎ ভয় পেয়ে চোখ ঢাকলো। ওরা কি তাকে মারবে নাকি! কিন্তু সে তো কোনো দোষ করে নি? মনে মনে তবু বললো, আমি ভয় পাবো না! আমি ভয় পাবো না কিছুতেই।

সত্যেন জোর করে ইন্দ্রজিতের চোখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে বললো, তুই প্যাঁচা না কি রে যে একটুকু আলো সইতে পারিস না! এবার পৃথ্বীপাল যা বলবে তোকে শুনতে হবে।

পৃথ্বীপাল ইন্দ্রজিতের চুলের মুঠি ধরে ইন্দ্রজিতকে দাঁড় করালো! তারপর চেয়ারটা একলাথি দিয়ে দূরে সরিয়ে দিয়ে বললো নাউ, সিট অন দা সিম্পসন্‌স চেয়ার!

এত শক্ত করে চুলের মুঠি ধরেছে যে ইন্দ্রজিতের মাথাটা টনটন করেছে! কিন্তু মাথাটা সরিয়ে নিতেও পারছে না। ছেলেগুলো তার চেয়ে বয়সে বড়ো, এদের সঙ্গে সে পারবে কি করে?

ইন্দ্রজিৎ সেই অবস্থায় জিজ্ঞাসা করলো, হোয়ার ইজ ইয়োর সিম্পসন্‌স চেয়ার?

পৃথ্বীপাল তার হাঁটুর পেছন দিকে একটা লাথি মেরে বললো আরে ইয়ার এই সা, এই সা—

ইন্দ্রজিতকে একটা অদৃশ্য চেয়ারের ওপর বসার ভঙ্গি করতে হলো কিন্তু এইভাবে বসে থাকা কি অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক, হাঁটু দুমড়ে সে এক একবার পড়ে যাচ্ছে আর দু'পাশ থেকে পৃথ্বীপাল আর সুলেমান তার কান ধরে টেনে তুলছে।

ইন্দ্রজিৎ একসময় চেঁচিয়ে বললো, আমি আর পারছি না।

চোপ! পারিব না এ কথাটি বলিও না আর?
একটু বাদে নায়ার এসে বললো এবার আমার টান। ছেড়ে দাও!
নায়ার দক্ষিণ ভারতীয় হলেও বাংলা জানে ভালো। সে ইন্দ্রজিতের নাকটা ধরে মুচড়ে দিয়ে বললে, বেশ লম্বা আছে তো! দেখি কি রকম নাক খৎ দিতে পারো? যাও, দরজার কাছে যাও। ঐখান থেকে আমার পা পর্যন্ত।
ইন্দ্রজিৎ বললো, কেন নাক খৎ কেন? ইঞ্জিনিয়ার হবার সঙ্গে নাক খৎ দেবার সম্পর্ক কি? সত্যেন দা, আপনি বলুন?
সত্যেন বললো, এখানে কোন প্রশ্ন চলবে না। যে-যা বলবে, করতে হবে।
কে একজন যেন জোরে এক লাথি কষালো ইন্দ্রজিতের পেছনে চেঁচিয়ে বললো, শালা, দেরি করছিস কেন?
ইন্দ্রজিৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললো, কেন, মারবে কেন আমাকে?
ফের অন্যদিক থেকে এক লাথি।
ইন্দ্রজিতের মাথার মধ্যে আগুন ধরে গেল। তার ইচ্ছে হলো, সেও এলোপাথারি হাত পা ছোঁড়ে। কিন্তু এতগুলো বড় বড় ছেলের সঙ্গে মারামারি করতে গেলে সে শুধু মারই খাবে।
বাধ্য হয়ে ইন্দ্রজিতকে নাকে খৎ দিতেই হলো। একবার না, পাঁচবার। দরজার কাছ থেকে নায়ারের পায়ের কাছ পর্যন্ত আসতে হবে। এর মধ্যে একবার মাথা তুলে ফেললেই আবার গোড়া থেকে। এই রকম আরও কতক্ষণ চলতো, তার ঠিক নেই। এক সময় খাবার ঘণ্টা বেজে উঠলো। নিষ্কৃতি পেয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ।
সবারই খিদে পেয়েছে! খাবারের ঘণ্টা বাজলে কেউ আর এক মিনিটও দেরি করতে চায় না!
সত্যেন জিজ্ঞেস করলো, এই তুমি খাবারের ঘর চেনো?
ইন্দ্রজিৎ চেনে না।
সত্যেন বললো, চলো, আমাদের সঙ্গে চলো।
ইন্দ্রজিতের খুব মন খারাপ হয়ে গেছে। খিদে পেলেও খেতে যাবার

ইচ্ছে নেই। এরা শুধু শুধু তার ওপর অত্যাচার করলো এতগুলো নিষ্ঠুর ছেলের সঙ্গে সে দিনের পর দিন কাটাবে কি করে? এখানে ভর্তি হবার আগে সে অস্পষ্ট ভাবে র‍্যাগিং কথাটি শুনেছিল। এই তার রূপ? তখনো ইন্দ্রজিৎ জানে না আর কত কিছু তাকে সইতে হবে।

খাবারের ঘরে বিরাট লম্বা টেবিল সবগুলো চেয়ার ভর্তি হয়নি। অনেক ছেলে এখনও বাড়ি থেকে ফেরেনি। নতুন ছেলেরাও আর কেউ আসেনি এই হলে। নতুনের মধ্যে ইন্দ্রজিৎ একা।

ইন্দ্রজিৎ চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে চাইছে, একজন মোটা মতন ছেলে তার কাঁধ ধরে বললো, এই দাঁড়াও।

তারপর সে অন্যদের জিজ্ঞেস করলো, এ কি আই-আই-টি মিক্সচার খেয়েছে?

সত্যেন, নায়ার, পৃথ্বীপাল এরা এক সঙ্গে বলে উঠলো, না, এখনো খায়নি।

মোটা ছেলেটি বললো, বাঃ, মিক্সচার খায়নি, তার আগেই খেতে বসলো যে। এই দাঁড়াও তুমি, আমি মিক্সচার বানিয়ে আনছি।

সে একটা গেলাস নিয়ে চলে গেল। একটু বাদেই ফিরে এলো ভর্তি গেলাস নিয়ে। কি দিয়ে মিক্সচার বানিয়েছে কে জানে, অদ্ভুত তার রং।

আর একজন তার হাত থেকে গেলাসটাকে নিয়ে খানিকটা নুন আর মরিচ মিশিয়ে দিল।

আর একজন নিজের চটি জুতোটা তুলে গেলাসের ধারে ঘষে মিশিয়ে দিল খানিকটা ধুলো।

এবার সেটা ইন্দ্রজিতকে খাওয়ানো হবে। আর একটি ছেলে লাফিয়ে উঠে বললো, দাঁড়া, আর একটু বাকি আছে।

গেলাসটা হাতে নিয়ে সে সকলের চোখের সামনে প্যান্টের বোতাম খুলে খানিকটা হিসি করে দিল গেলাসের মধ্যে সত্যিই। তারপর হাসতে হাসতে গেলাসটা ইন্দ্রজিতের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো,

নে শালা, খা!

সব দেখেশুনে ঘেন্নায় ইন্দ্রজিতের বমি আসছিল। সে কঠিন মুখ করে বললো, না। আপনারা কি ভদ্রলোকের ছেলে?

সবাই এক সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো। যেন একটা দারুণ মজার কথা।

মোটা মতন ছেলেটা বললো, ওরে বাবা! কত বড় ভদ্দর লোক এসেছে রে! এত বড় ভদ্দরলোক তো এখানে চলবে না। নাও ভাই, এটা খেয়ে জাতে ওঠো।

ইন্দ্রজিৎ মুখ ফিরিয়ে নিল।

ছেলেটি আবার বলল, এক থেকে দশ পর্যন্ত গুণছি। তার মধ্যে শেষ করতে হবে। ইন্দ্রজিৎ চুপ করে রইলো।

ছেলেটি গুণতে লাগলো এক, দুই, তিন, চার—দশ গোনা শেষ হতেই ইন্দ্রজিৎ বললো, আমি কিছুতেই খাবো না—

তখন তিন চারজন মিলে চেপে ধরলো তাকে। জোর করে খাওয়াবে। ইন্দ্রজিৎ ঠোঁটে তালা দিয়ে রেখেছে। ধস্তাধস্তি শুরু হয়ে গেল। ইন্দ্রজিতের গায়ে জোর আছে, কিন্তু অত জনের সঙ্গে পারবে কেন। ওরা তার ঠোঁটের কাছে গেলাসটা চেপে ধরে আছে। ঝটকা দিয়ে নিজেকে ছাড়াতে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ পড়ে গেল মাটিতে। আত্মরক্ষার জন্য ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লো টেবিলের নিচে। তার ফলে আরও বিপদে পড়লো, টেবিলের তলা থেকে সে আর বেরুতেই পারলো না। অন্য ছেলেরা যে-যার চেয়ারে বসে পড়েছে, ইন্দ্রজিৎ যে-দিক দিয়ে বেরোতে যায়, অমনি সেদিকে একজন তাকে লাথি মারে। খেলাচ্ছলে মারা নয়, রীতিমত জোরে, তার চোখে মুখে যেখানে সেখানে লাগতে পারে।

ইন্দ্রজিৎ একটা কুকুরের মতন টেবিলের তলায় এদিক ওদিক ঘুরতে লাগলো আর লাথি খেতে লাগলো। তার কান্না এসে যাচ্ছে। কিন্তু সে জানে, কেঁদে ফেললে এরা আরও পেয়ে বসবে।

একবার সে বললো, আমি ক্ষমা চাইছি। আমাকে এবার ছেড়ে

দিন।

দু'তিনটি ছেলে বললো যথেষ্ট হয়েছে। এই এবার ছেড়ে দে। একদিনে বেশী হয়ে যাচ্ছে।

মোটা ছেলেটি বললো, আচ্ছা ছেড়ে দিচ্ছি। এদিক দিয়ে বেরিয়ে এসো।

ইন্দ্রজিৎ একটু মুখ বের করতেই সে জিজ্ঞেস করলো, এবার মিক্সচার খাবে তো ?

আমি পারবো না, কিছুতেই পারবো না।

তবে খা শালা, লাথি খা।

মোটা ছেলেটি দারুণ জোরে মারলো ইন্দ্রজিতের মুখে। তার নাক দিয়ে ঝরে পড়লো কয়েক ফোঁটা রক্ত। তার ইচ্ছে হলো ঐ মোটা ছেলেটির পা কামড়ে দেয়।

সেরকম কিছু করলো না। সে টেবিলের নিচে শুয়ে রইলো চিৎ হয়ে। সে আর এখান থেকে বেরুবে না।

হঠাৎ ছেলেদের মধ্যে কি যেন একটা পরিবর্তন এসে গেল। সত্যেন নিচু হয়ে টেবিলের তলায়-মুখ ঝুঁকিয়ে বললো, কি হলো ? এসো ?

না। আমি এখানেই থাকবো।

সত্যেন হাত ধরে টেনে বের করলো ইন্দ্রজিতকে। নরম গলায় বললো, ছিঃ, এতে কি রাগ করতে আছে ? এমনি একটু ইয়ার্কি ঠাট্টা হচ্ছে।

সত্যেন নিজের পকেট থেকে রুমাল বের করে মুছে দিল ইন্দ্রজিতের মুখ। তাকে চেয়ারে বসানো হলো। অন্য ছেলেরা আগ্রহ করে তার প্লেটে তুলে দিল খাবার।

ইন্দ্রজিত খাবারে হাত না দিয়ে চুপ করে বসে রইলো। কে জানে এই খাবারের মধ্যে আবার কি সব মেশানো আছে।

অন্য সকলে চেয়ে আছে যে যার দিকে। দু' একজন বললো। চুপ করে বসে আছো কেন, খাও।

ইন্দ্রজিৎ বললো, আমি আজ কিছু খাবো না। আমার খিদে নেই।

মোটা ছেলেটি বললো, এখনো ভয় পাচ্ছো বুঝি? আরে, এগুলো ভালো খাবার—খাঁটি খাবার—এই ছাখো আমিও খাচ্ছি তোমার থালা থেকে!

সত্যিই সে ইন্দ্রজিতের প্লেট থেকে একটা আলু তুলে নিয়ে মুখে পুরলো।

সত্যেন বললো, ভালো করে পেট ভরে খাও। যা লাগবে, চেয়ে নেবে, লজ্জা করবে না। এখানে তো আর মা নেই যে সেধে খাওয়াবে! লজ্জা করলেই মরবে।

তারপর একটু নীচু গলায় খুব মিষ্টি করে সত্যেন বললে, এক্ষুণি স্থপারিনটেণ্ডেণ্ট আসছে। তাকে যদি কোনো নালিশ করো, তাহলে তোমার সারা গা ব্লেড দিয়ে চিরে সেখানে নুন ছিটিয়ে দেওয়া হবে, বুঝলে?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হোস্টেলের স্থপার এসে ঢুকলেন। বেশ হৃষ্টপুষ্ট সদাশয় চেহারা। নাকের নীচে মোটা গোঁফ।

স্থপার জিজ্ঞেস করলেন, নতুন ছেলেটি কোথায়?

কয়েকজন বললো, ঐ যে স্যার, ঐ যে!

স্থপার ইন্দ্রজিতকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার কোনো অস্থবিধে হচ্ছে না তো?

ইন্দ্রজিৎ একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। সে বুঝতে পারলো অন্যরা সকলেই তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে নিঃশ্বাস দমন করে বললো, না।

স্থপার বললেন, তোমার সব দাদারা রয়েছেন। কিছু অস্থবিধে হলে সিনিয়ার ছেলেদের বলবে, তারাই সব ব্যবস্থা করে দেবে।

সত্যেন এবং আরও কয়েকজন ছেলে বললো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, স্যার আমরা তো আছি। আমরাই সব দেখাশুনো করবো। আপনি চিন্তা করবেন না।

স্থপার যেটুকু সময় রইলেন, সে সময় সকলেই খাওয়ায় খুব ব্যস্ত হয়ে পড়লো। কোনো কথা নেই, শুধু খাওয়ার শব্দ।

সুপার চলে যাবার পর মোটা ছেলেটি উঠে গিয়ে দরজার কাছে দেখে এলো। বললো, এ ছেলেটা স্যারকে কিছু বলেনি, সেইজন্য একে একটা প্রাইজ দেওয়া উচিত।

তারপর ইন্দ্রজিতকে সাবধান হবার সুযোগ না দিয়ে সেই গেলাসের মিক্সচার ঢেলে দিল তার মাথায়। সেই নোংরা জল গড়িয়ে পড়লো ইন্দ্রজিতের খাবার প্লেটে। তার খাওয়া তখনো অর্ধেক শেষ হয়নি।

সকলে হেসে এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। দু'একজন শুধু বললো যাঃ, ছেলেটাকে খেতে পর্যন্ত দিলি না। কিন্তু তাদের কথা চাপা পড়ে গেল অন্যদের কথায়। যেন একটা হাসির ফোয়ারা বইছে ঘরে। এক এক জন হাসি থামালেই অন্য একজন হি-হি-হো-হো শুরু করে।

ইন্দ্রজিতের মনে হলো, সে একটা শত্রু পুরীতে বসে আছে। এরকম নিষ্ঠুর ছেলের দল সে আগে কখনো দেখেনি। সে অপমান আর অভিমান মেশানো গলায় বললো, আপনারা এতে কি আনন্দ পান? ঠিক আছে, আরও যা খুশি করুন আমাকে মারুন!

মোটা ছেলেটি বললো, পরের বছর তুমিও নতুন ছেলেদের নিয়ে আনন্দ করবে। চিন্তা কি?

একে আনন্দ বলে? আপনাদের লজ্জা হয় না?

না ভাই, আমাদের লজ্জা হয় না? ন্যাংটো হলেও আমাদের লজ্জা হয় না। তুমি ন্যাংটো হও, তাও আমরা লজ্জা পাবো না!

আপনাদের দিকে তাকাতেই ঘেন্না হচ্ছে আমার। আপনারা পড়াশুনো করতে এসেছেন, না—

ইন্দ্রজিতের কথা শেষ হলো না। একজন বলিষ্ঠ ছেলে এসে বাঁ হাতে তার কলার চেপে ধরে রুক্ষ গলায় বললো, এই খোকা, এখনো ম্যানার্স শেখোনি! জানো না, সিনিয়ারদের মুখে মুখে কথা বলতে নেই!

অন্য একটি ছেলে বললো, এখনো যে ব্রেন ওয়াশিং হয়নি। চল,

ব্রেন ওয়াশিং করিয়ে দিই।
তিন চারজন ইন্দ্রজিতকে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এলো বাথরুমে। তারপর ইন্দ্রজিৎ কিছু বুঝবার আগেই ওরা তার মাথাটা ঠুসে ধরলো কমোডের মধ্যে। ইন্দ্রজিৎ অনেক লড়াই করেও ছাড়া পেল না। একজন চেন টেনে দিতেই কমোডের নোংরা জলে ইন্দ্রজিতের মাথা ভিজে গেল।

সেই রাতে সাবান মেখে চান করেও ইন্দ্রজিতের ঘেন্না যায় না। সঙ্গে এক কৌটো পাউডার এনেছিল, সেই পাউডার শুধু গায়ে নয়, চুলের মধ্যেও ঢেলেছে। সাদা চুলে তাকে দেখাচ্ছে বুড়ো মানুষের মতন।
বিছানায় কাঠ হয়ে শুয়ে আছে ইন্দ্রজিৎ। ঘুম আসছে না। হোস্টেলে নতুন ছেলেদের ওপর র‍্যাগিং-এর কথা সে শুনেছিল। কিন্তু তা যে এত বীভৎস, সে কল্পনাও করেনি। রাগে তার গা জ্বলছে। ইচ্ছে করছে, কাল ভোর বেলায় এখান থেকে চলে যেতে। কিন্তু না, যাওয়া চলবে না। তাকে ইঞ্জিনিয়ার হতেই হবে। যত কষ্টই হোক। তার ওপর অনেকেই আশা করে আছে। ফিরে গিয়ে সে চন্দনাকে কি বলবে?
চন্দনার কথা ভাবতে ভাবতেই একটু বাদে তার ঘুম এসে গেল।
পরদিন সকালে উঠে ইন্দ্রজিৎ সুটকেশ খুলে তার সব বইপত্র বের করছে এমন সময় চার-পাঁচজন ছেলে এসে ঢুকলো তার ঘরে।
ওদের দেখেই ইন্দ্রজিত শঙ্কিত হয়ে উঠলো। আবার কি শুরু হবে কে জানে!
ওদের মধ্যে সত্যেন আর সেই মোটা মতন ছেলেটিও আছে।
সত্যেন জিজ্ঞেস করলো, কি কাল রাত্রে ঘুম হয়েছিল তো?
ইন্দ্রজিৎ মাথা নেড়ে বললো, হ্যাঁ।
এর মধ্যে একটা রাত না ঘুমিয়ে কাটাতে হবে। রেডি থেকো!
অন্য একজন বললো, সেটা যে কোনো রাত হতে পারে!

মোটা ছেলেটি বললো, দেখি কি কি জিনিসপত্র এনেছো ?

তারা ইন্দ্রজিতের কাছ থেকে সুটকেশটা কেড়ে নিয়ে গোল হয়ে বসলো মাটিতে। জামা-কাপড়গুলি টেনে টেনে বের করতে লাগলো।

সুটকেশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' ছিল একখণ্ড, সেটা তুলে নিয়ে একজন বললো, একি, কবিতা ?

আরেকজন বললো, খুব আঁতেল মনে হচ্ছে ?

সত্যেন বললো, তুমি কি শান্তিনিকেতনের বদলে ভুল করে এখানে চলে এসেছো ?

ইন্দ্রজিতের মনে হলো, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রের পক্ষে কবিতা পড়া বুঝি সত্যিই অন্যায়। সে লজ্জায় পড়ে গিয়ে হুম করে একটা মিথ্যে কথা বলে দিল, ওটা আমার দাদার বই, ভুল করে চলে এসেছে।

দাদার আর কি কি জিনিস গেঁড়িয়েছো ?

গেঁড়াবো কেন ? বইটা দাদা আমাকে দিয়েছিলেন।

দিয়েছিলেন বেশ করেছিলেন। কিন্তু খবর্দার, কোনদিন যদি কবিতা ফবিতা পড়তে দেখি এখানে···

ইন্দ্রজিত লজ্জিতভাবে বললো, না, আমি কবিতার কিছুই বুঝি না।

কিন্তু ইন্দ্রজিতের লজ্জা পাওয়ার এখনো অনেক বাকি ছিল।

ওরা ঘাঁটাঘাঁটি করে ইন্দ্রজিতের সব জিনিসপত্র বার করে ফেললো। ইন্দ্রজিৎ কখনো অন্যের জিনিসে এভাবে হাত দিত না। কিন্তু ওরা এসব মানে না।

সুটকেশের পকেট থেকে অন্য কাগজ-পত্রের সঙ্গে বেরিয়ে গেল চন্দনার ছবিটা।

একজন সেটা ছোঁ মেরে তুলে নিল। সঙ্গে সঙ্গে শিস দিয়ে বললো, আরে মাইরি, দারুণ জিনিস !

ইন্দ্রজিৎ লাফিয়ে উঠে বললো, দিন, ওটা শিগগির আমাকে দিন।

কিন্তু যে ছেলেটি ছবিটা নিয়েছে, সে ইন্দ্রজিতের চেয়ে অনেক লম্বা। সে হাতটা উঁচু করে বললো, দাঁড়াও, দাঁড়াও ! এটাও কি তোমার দাদার জিনিস না কি ! ভুল করে চলে এসেছে।

আপনারা পরের জিনিসে হাত দেন কেন ?
ইন্দ্রজিতের কথা কেউ গ্রাহ্যই করলো না। লম্বা ছেলেটি বললো দারুণ রে! অনেকটা তনুজার মতন দেখতে না ?
মোটা ছেলেটি বললো, না, বরং শাবানা আজমী'র টাইপ।
সত্যেন ইন্দ্রজিতকে জিজ্ঞেস করলো, মেয়েটার নাম কি ভাই! তোমার বন্ধুর বোন না বোনের বন্ধু ?
ইন্দ্রজিৎ আরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো, কোনো উত্তর দিল না।
লম্বা ছেলেটি সশব্দে ছবিটায় একটা চুমু খেয়ে বললো, আঃ!
মোটা ছেলেটি বললো, এই আমায় দে! আমায় দে একবার।
ইন্দ্রজিতের চোখ দিয়ে আগুন বেরুচ্ছে যেন। ওরা চন্দনাকে অপমান করছে! সে গোঁয়ারের মতন ছুটে গিয়ে এক ঘুঁষি মারলো লম্বা ছেলেটির নাকে। ঘুঁষিটা বেশ জোরেই হয়েছিল। ছেলেটা উঃ করে নাক চেপে ধরলো।
তারপর সে এক ল্যাং দিয়ে ইন্দ্রজিতকে ফেলে দিল মাটিতে। এবং ইন্দ্রজিতের পিঠের ওপর চেপে বসলো। মোটা ছেলেটিও বসলো আর একদিকে। তারপর বললো, দ্যাখ শালা, তোর মালকে নিয়ে আমরা এখন কি করি। একলা একলা মালবাজি করবি।
ওরা প্রত্যেকেই পর্যায়ক্রমে চুমু খেতে লাগলো, চন্দনার ছবিতে। এবং সেই সঙ্গে যে সব কথা উচ্চারণ করতে লাগলো, তা ছাপা চলে না।
ঠিক যেন বলাৎকার করছে একটি মেয়ের ওপরে, সেই ভাবে ছবিটা নিয়ে ওরা কাড়াকাড়ি করতে লাগলো। ইন্দ্রজিতেরই সামনে সরল নিষ্পাপ চন্দনা যেন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।
ইন্দ্রজিৎ প্রাণপনে চেষ্টা করতে লাগলো উঠে দাঁড়াবার। কিন্তু সে অসহায় ?
খানিকটা বাদে কে যেন সত্যেনের নাম ধরে ডাকতেই ওরা সবাই এক সঙ্গে চলে গেল ঘর ছেড়ে।
ইন্দ্রজিৎ আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালো। চন্দনার ছবিখানা দোমড়ানো

মোচড়ানো অবস্থায় পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে ইন্দ্রজিৎ ছবিটাকে সমান করার চেষ্টা করতে লাগলো। তারপর অনেকক্ষণ সেটার দিকে তাকিয়ে রইলো এক দৃষ্টে।

রাগ, দুঃখ, অভিমান এই সব মিশিয়ে ইন্দ্রজিতের মুখখানা অদ্ভুত থমথমে। তার চোখ দুটো শুকনো, খুব বেশী আঘাত পেলে যেমন কান্না আসে না।

ইন্দ্রজিতের পৌরুষ আছে, তেজ আছে, কিন্তু জীবনে কখনো এত অসহায় বোধ করে নি। এই ছেলেগুলো তাকে যখন যে-রকম খুশী, অপমান করে যাবে, আর তাকে সহ্য করতে হবে। ওদের দয়া নেই, মায়া নেই, রুচি বলতে কিছু নেই--অথচ সকলেই ভালো ছাত্র!

চন্দনার ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই তার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো।

ইন্দ্রজিৎ মনে মনে বলছে, তুমি আমার ওপর রাগ করেছো? কতকগুলো নোংরা হাত তোমাকে ছুঁয়েছে। ওরা তোমার সম্পর্কে নোংরা কথা বলেছে। আমি বাধা দিতে পারিনি। তুমি রাগ করেছো আমার ওপরে? তুমি সব বুঝতে পারবে না।

ইন্দ্রজিৎ দেখলো, ছবির মধ্যে চন্দনার মুখের হাসিটা একই রকম আছে। ছবিখানা হাতে নিয়ে সে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো। যেন এখান থেকেই কলকাতা পর্যন্ত দেখতে পাবে। ইন্দ্রজিৎ আবার মনে মনে বললো, তুমি কোনোদিন আমাকে ভুল বুঝো না।

যাতে ওরা আবার এই ছবিখানা নিয়ে কোনোরকম নোংরামি না করতে পারে, সেইজন্য সে ছবিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল বাইরের মাঠে। ছবির দরকার কি! চোখ বুজলেই তো সে চন্দনাকে দেখতে পায়।

এরপর আরও চার-পাঁচদিন ধরে ইন্দ্রজিতের ওপর এই রকম অত্যাচার হতে লাগলো। অত্যাচার কিংবা খেলা, একদিন সারারাত ধরে ওদের অনেক রকম হুকুম পালন করতে হলো। উচ্চারণ করতে হলো ওদের শেখানো অসভ্য কথা। ইন্দ্রজিৎ আর কিছুরই প্রতিবাদ

করে না। কলের পুতুলের মতন সব কিছু করে যায়।
দু'দিন বাদেই সে শুনলো এই রকম অত্যাচারের জন্য চারটি ছেলেকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে। কিন্তু আরও অত্যাচারের ভয়ে কেউ অভিযোগ করে না কর্তৃপক্ষের কাছে। প্রথমদিন এসেই যে ছেলেটির সঙ্গে ইন্দ্রজিতের আলাপ হয়েছিল, তার হিষ্টিরিয়ার মতন অসুখ দেখা দিল, সে পড়াশুনো ছেড়ে চলে গেল নিজের বাড়িতে।
ইন্দ্রজিৎ মনে মনে সব সময় বলে, আমি যাবো না। আমি কিছুতেই হেরে যাবো না। বাবা মা কিংবা চন্দনার কাছে আমি কোনোদিন এসব কথা বলতে পারবো না। আমাকে ভালো রেজাল্ট করতেই হবে।
ইন্দ্রজিৎ বাড়িতে চিঠি লিখলো, মা, আমি খুব ভালো আছি। আমার জন্য কোনো চিন্তা করো না। এখানকার পরিবেশ যেমন চমৎকার, তেমনি এখানকার অন্য ছাত্ররাও আমাকে সব ব্যাপারে সাহায্য করে। খাওয়া-দাওয়া এত চমৎকার যে কি বলবো তোমাকে—
দিন সাতেক বাদে ইন্দ্রজিতের মনে হলো হঠাৎ যেন একটা ঝড় নেমে গেল। সকাল থেকে একজনও তাকে বিরক্ত করতে আসেনি। গত কালও সত্যেনের সাইকেলটা তাকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হয়েছিল। আজ সত্যেন নিজে থেকেই তাকে ডেকে বললো, এই, আয় আমার পেছনে বোস। রোদ্দুরের মধ্যে হাঁটবি কেন।
এ কথা শুনেও ইন্দ্রজিৎ দাঁড়িয়ে ছিল, সত্যেন তার হাত ধরে টানলো। সহাস্যে বললো, মুখ গোমড়া করে আছিস কেন? মেয়েটার ছবি নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি হয়েছিল, ওসব মনে রাখতে নেই। ওরকম হয়েই থাকে।
কয়েকদিনের মধ্যে সত্যেন আর সেই মোটা ছেলেটি, যার নাম সুকুমার—এরাই ইন্দ্রজিতের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে গেল।
গেট দিয়ে ঢুকেই সামনে একফালি বাগান। খুব ছোট হলেও বাগানটি বেশ ছিমছাম পরিচ্ছন্ন ভাবে সাজানো। দরজার পাশেই

একটা ইউক্যালিপটাস গাছ, তার পাতা ঝরে ঝরে পড়ে বাইরের রাস্তায়। পাড়াব ছেলেরা অনেক সময় সেই পাতা কুড়িয়ে নেয়, হাতে মুড়ে নিয়ে গন্ধ শোকে। পথ চলতি মানুষ হঠাৎ সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে, এটা সত্যিই একটা ইলক্যালিপটাস গাছ দেখছি! কলকাতায় ক'টা বাড়ির সামনেই বা বাগান আছে এখন! তাও তো এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি।

এককালে বসতবাড়িই ছিল। এখন তিনটে ফ্ল্যাট করে ভাড়া দেওয়া হয়েছে। বাড়ির মালিক একজন বৃদ্ধা রমণী। তিনি তিন-তলায় দু'খানা ঘর আর নিজের ঠাকুর পুজো নিয়েই থাকেন। দু'জন ঝি-চাকর আর একজন দূর সম্পর্কিত বর্ষিয়সী আত্মীয়া তাঁর দেখা শুনো করে। বৃদ্ধার একমাত্র ছেলে সাত বছর ধরে বিলেতে আছে, মেয়ে-জামাই থাকে দেরাদুনে।

একতলার ফ্ল্যাটটা সুব্রতদের। বাগান পেরিয়েই প্রথম ঘরখানা সুব্রতর নিজস্ব। অধিকাংশ সময়েই তার ঘরে বন্ধু বান্ধবদের আড্ডা। ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে সুব্রতর নাম আছে বলে পাড়ার ছেলেরাও তার ভক্ত। তার ডাক নাম রতন। অনেকেই তাকে রতনদা বলে ডাকে। সে রাজনীতি করে না। রাজনীতির ছেলেরাও তাকে ঘাঁটায় না।

বাড়িতে যখন কেউ ঢোকে বা বেরোয়, সুব্রতর ঠিক চোখে পড়ে। এ ছাড়া, তার ঘর থেকে রাস্তাও দেখা যায়।

দোতালার একটি ফ্ল্যাটে থাকে একটি পাঞ্জাবী পরিবার। কর্তা-গিন্নী ও দুটি বাচ্চা ছেলে। কর্তা-গিন্নী এক বর্ণ বাংলা জানেন না। বাচ্চা দুটি বরং আধো আধো বাংলা বলে। এদের জীবন যাত্রার ধরণ বাঙালীদের থেকে একটু আলাদা। প্রায়ই কর্তা-গিন্নী বাচ্চা দুটিকে বাড়িতে রেখে পার্টিতে যান রাত্তিরবেলা। বাচ্চা দুটি এক এক সময় খুব কান্নাকাটি করে—কিন্তু প্রতিবেশীরা কোনো রকম সাহায্য করতে পারে না। কারণ, কর্তা-গিন্নী ফ্ল্যাটের দরজায় তালা দিয়ে যান বাইরে থেকে। বাচ্চাদের কান্না শুনলে অসহ্য লাগে—

তাদের বাবা মায়ের হৃদয়হীনতার কথা ভেবে প্রতিবেশীরা এদের ওপর খুব বিরক্ত। পাঞ্জাবী ভদ্রলোক কিন্তু এমনিতে খুবই বিনীত ও নম্রভাষী। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দেখা হলেই হেসে ইংরেজীতে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। আর যেদিন ওঁদের ফ্ল্যাটে পার্টি হয়, মাসে একদিন, সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত চ্যাঁচামেচি ও হৈ-হল্লায় কান পাতা যায় না। সেদিন সন্ধেবেলা ঐ ফ্ল্যাটে ডজন-ডজন সোডা আসে।

অন্য ফ্ল্যাটটি চন্দনাদের। সে এবং বাবা, মা, বড় দাদা ও ছোটবোন। চন্দনার দিদির বিয়ে হয়ে গেছে। চন্দনা সবে মাত্র ফার্ষ্ট ইয়ারে ভর্তি হয়েছে।

আগে চন্দনারা থাকতো ভবানীপুরে। ওর বাবার পদোন্নতি হওয়ায় কম্পানী থেকে এই ফ্ল্যাট দিয়েছে। মাত্র দু'মাস আগে উঠে এসেছে ওরা। এখানে বড় বড় তিনখানা ঘর, সাদা টাইলে বাঁধানো বাথরুম, মস্ত বড় ডাইনিং স্পেস। এখানে এসে চন্দনা নিজের জন্য আলাদা একটা ঘর পেয়েছে।

চন্দনাদের সংসারে নিয়ম কানুন খুব কড়া? শুধু কলেজে যাওয়া ছাড়া চন্দনা আর বাড়ি থেকে বেরুতে পারে না সাধারণত। কলেজ থেকে কোনোদিন ফিরতে একটু দেরী হলে মা ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তার বান্ধবীরা তার বাড়িতে আসে। ছেলেবন্ধুদের বাড়িতে আসা নিষেধ। একবার একটি কলেজের ছেলে চন্দনাকে বাড়িতে চিঠি লিখেছিল, প্রায় নির্দোষ চিঠি, কিন্তু চন্দনার মা সে চিঠি প্রথমে খোলেন। এবং পড়েন। তারপর তাঁর প্রায় হৃদকম্পন দেখা দেয়। তাঁর ধারণা, অন্য জাতের কোনো ছেলে যদি তাঁর মেয়ের মাথাটা একবার ঘুরিয়ে দেয়—তা হলেই মহা সর্বনাশ। অবশ্য ইন্দ্রজিতদের বাড়ির সঙ্গে ওদের পরিবারের খুব ঘনিষ্ঠতা।

পাশের ফ্ল্যাটের পাঞ্জাবী দম্পতির সঙ্গে চন্দনাদের ভাব জমেনি। একতলার সুব্রতদের সঙ্গে খুব ভাব। সুব্রতর মা আর চন্দনার মা প্রায়ই এক সঙ্গে ম্যাটেনি শোয়ে সিনেমা দেখতে যান রিক্সা চেপে।

সুব্রত আর চন্দনার দাদা প্রশান্ত ইতিমধ্যেই দারুণ বন্ধু হয়ে গেছে। প্রশান্ত জীবনে কখনো ক্রিকেট খেলেনি যদিও, কিন্তু ক্রিকেট সাহিত্য তার মুখস্ত। উনিশশো চৌত্রিশ সালে ইংল্যাণ্ড টিমে চার নম্বর খেলোয়াড় কে ছিল তা সে চোখের নিমেষে বলে দিতে পারে। প্রায়ই ক্রিকেট নিয়ে তার সঙ্গে সুব্রতর তর্কাতর্কি হয়।

সুব্রতর বাবা মা ছাড়া আর তিন বোন এক দিদি। ওর দিদি পড়াশুনোয় দারুণ ভালো। এম. এ. পাশ করে রিসার্চ করছেন এবং বাড়িতে বলেই দিয়েছেন যে, তিনি কখনো বিয়ে করবেন না। এই তপতীদিকে শ্রাবণী খুব শ্রদ্ধা করে। তপতীদি কিন্তু একটুও গুরুগম্ভীর স্বভাবের নয়, খুব হাসি খুশী।

চন্দনা একতলার ফ্ল্যাটে প্রায়ই তপতীদি আর তাঁর বোনেদের সঙ্গে গল্প করতে যায়। এ ছাড়া চন্দনার একটা বেড়াবার জায়গা আছে। তাদের বাড়ির ছাদ।

ছাদটা বিরাট চওড়া। অনেকগুলি ফুল গাছের টব আছে। কবে কে না জানি রেখেছিল, তারপর কেউ আর যত্ন নেয়নি। অনেক গাছ গিয়েছিল শুকিয়ে। কোন কোন টব ভর্তি হয়েছিল আগাছায়। চন্দনা নিজে একাই এই টবে নতুন ফুল গাছ বসিয়েছে, নিয়মিত এসে জল দেয়।

তা ছাড়াও অনেকদিন রাত আটটা নটা'য় পড়াশুনোয় মন না বসলে, চন্দনা চলে আসে ছাদে। আপন মনে ঘুরে বেড়ায়। সেখানে সে সম্পূর্ণ একলা আর স্বাধীন। অন্ধকারের মধ্যে এক একদিন আপন খেয়ালে নাচে চন্দনা।

একতলার তপতীদের ছাদে আসার দরকার হয় না। ওদের ফ্ল্যাটের পেছন দিকে একটা উঠোন আছে। দোতলার পাঞ্জাবী দম্পতিও ছাদে আসে না। সুতরাং বলতে গেলে ছাদটা চন্দনারই নিজস্ব। ছাদের সিঁড়িটা অন্ধকার। তিনতলা দিয়ে ওঠবার সময় প্রায় দিনই বাড়ির মালিক বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করেন, কে রে?

চন্দনা উত্তর দেয়, আমি মাসীমা।

বৃদ্ধা চোখে খুব কম দেখেন। হাসিটি খুব মধুর। চন্দনার গলার স্বর শুনে বলেন, আয় মা। এদিকে একটু আয়, তোর সঙ্গে গল্প করি।

এই বৃদ্ধার টাকা পয়সার অভাব নেই, তবু এঁর এই একাকীত্ব দেখে কষ্ট হয়। এঁর ছেলে কতদিন ধরে বিলেতে পড়ে আছে। মায়ের কথা ভাবে না। মেয়ে জামাই কলকাতায় আসে কদাচিৎ। এসব নিয়ে বৃদ্ধা অবশ্য কখনো কোনো অভিযোগ করেন না।

তিনতলায় অনেকগুলো ঘর। দু'খানা মাত্র ব্যবহার করা হয়। বাকিগুলো জিনিসপত্রে ঠাসা। তালা বন্ধই থাকে। বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে এখানে।

খানিকক্ষণ গল্প করার পর চন্দনা বলে, যাই মাসীমা আমি একটু ছাদে যাই।

বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করেন, তুই যে একা একা চলে যাস, তোর ভয় করে না?

চন্দনা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, ভয় করবে কেন?

বৃদ্ধা হেসে বলেন, আমাদের কালে সন্ধ্যের পর একা একা ছাদে যেতে ভয় ভয় করতো। তোরা একালের মেয়ে, তোদের ভয় ডর কম। তা ছাড়া আগে কলকাতা শহরটা ছিল ভূত পেত্নীতে ভরা— রিফিউজি আসবার পর তারা সব পালিয়েছে।

চন্দনা কথা শুনে হাসে।

বৃদ্ধা বলেন, তুই বিশ্বাস করিস না? এই বাড়িতেই আমি ভূত দেখেছিলাম। একটা পেত্নী প্রায়ই এসে ছাদের কার্নিসে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতো। আমরা সবাই দেখেছি। একদিন আমার কর্তা সাহস করে দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে ছাদে গিয়ে সেই পেত্নীকে বললেন, আপনি আমাদের ভয় দেখাতে আসেন কেন? তা শুনে পেত্নী বললো, তোমরা ভয় পাও, সেকি আমার দোষ? আমি এখানে হাওয়া খেতে আসি।

চন্দনার খুব ইচ্ছে একদিন কোনো ভূত বা পেত্নীকে নিজের চোখে

দেখে। এত গল্প পড়েছে, কোনো দিন দেখেনি। অনেক রাত পর্যন্ত চন্দনা একা ছাদে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু কোনদিন কারুর দেখা পায়নি।

এ রকম এক রাতে চন্দনা কার্নিসে ভর দিয়ে রাস্তা দেখছে, এমন সময় কাছে হঠাৎ পায়ের শব্দ শুনলো।

চমকে ফিরে তাকিয়ে চন্দনা দেখলো একজন দীর্ঘকায় পুরুষ তার দিকে এগিয়ে আসছে।

চন্দনার বুকের মধ্যে ধড়াস ধড়াস করতে লাগলো। কোনো রকমে জিজ্ঞেস করলো, কে?

পুরুষটি থমকে দাঁড়ালো! সেও বোধহয় চন্দনাকে আগে লক্ষ্য করেনি। সে জিজ্ঞেস করলো, কে? চন্দনা নাকি?

চন্দনা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো। রতনদা! তবু তার বিস্ময় কাটেনি।

রতনদা! আপনি এখানে যে? কোনদিন তো আসেন না।

রতনের হাতে একটা দূরবীণ। সে বললো, আজ অ্যাপোলো সেভেনটিন দেখা যাবে কলকাতার আকাশে। ঠিক নটা বেজে বাইশ মিনিটে।

তাই নাকি? আমিও দেখবো কিন্তু।

রতন চন্দনার কাছে সরে আসে। তারপর বললো, এখনো সময় হয়নি। সাত মিনিট বাকি আছে।

রতন একটা সিগারেট ধরালো।

আকাশ আজ বেশ অন্ধকার। কৃষ্ণপক্ষ! রতনের শরীরের রেখা আর সিগারেটের আগুনটা শুধু দেখা যায়।

প্রশান্তর দেখাদেখি রতনও চন্দনাকে তুই তুই বলে। ছোটবোনের মতই সম্পর্ক।

রতস জিজ্ঞেস করলো, তুই এই সময় ছাদে কি করছিস?

আমি তো প্রায়ই আসি।

একা?

হ্যাঁ, আমার একাই আসতে ভালো লাগে। কতদিন ভাবি যদি দু'একটা ভূত-টুতের সঙ্গে দেখা হয়। খানিকটা দূরেই তো একটা কবরখানা আছে।

রতন হেসে বললো, অত ভূত দেখার সখ কেন রে? রাস্তা-ঘাটে অনেক জ্যান্ত ভূত দেখিস নি?

রতনদা, তুমি কি করে ছাদে এলে? তিনতলার মাসীমা তোমাকে কিছু জিজ্ঞেস করেন নি।

না তো!

উনি তো যে ছাদে আসে, তার সঙ্গেই ডেকে কথা বলেন। তোমাকে কিছু বললেন না?

দেখতে পেলাম না তো আমি। কেন, দেখতে পেলে আমাকে আসতে বারণ করতেন?

না, তা করতেন না বোধহয়।

রতন দূরবীণটা চোখে লাগিয়ে ফোকাস ঠিক করতে লাগলো। চন্দনা তার পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো, এই অন্ধকারে কিছু দেখতে পাবে? জোৎস্না থাকলে বেশ হতো।

না রে। অন্ধকারেই ভালো দেখা যায়। অ্যাপোলো তো ঠিক তারার মতন জ্বলজ্বল করবে। সেণ্টজেভিয়ার্স কলেজের একজন প্রফেসারের কাছে একটা মস্ত বড় টেলিস্কোপ আছে। তাতে অনেক কিছু ভালো দেখা যায়। অনেকে আজ সেখানে গেছে। আমিও সেখানে যেতে পারতাম—কিন্তু নিজে নিজে দেখার আনন্দ বেশী না।

এটা দিয়ে দেখা যাবে?

আজ তো খালি চোখেও দেখতে পাওয়ার কথা! এই, প্রশান্ত কোথায় গেলো রে?

দাদা? কি জানি, জানি না তো? ঘরে নেই?

না, আসবার সময় খোঁজ নিয়ে এলাম। ওরও তো অ্যাপোলোর ব্যাপারে খুব আগ্রহ ছিল।

রতনদা, আমাকে একটু দুরবীণটা দাও ?

রতন দুরবীণটা চন্দনার চোখের ওপর ধরলো। তারপর বললো, এই যে এই জিনিসটা ঘুরিয়ে অ্যাপারচারটা ঠিক করে নে।

চন্দনা নিজে খানিকটা চেষ্টা করে বললো, কই কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না। সব কি রকম ধেঁায়া।

রতন বললো, দাঁড়া, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। এত নড়াচড়া করছিস কেন ?

রতন চন্দনার কাঁধে একটা হাত দিয়ে দাঁড়ালো পেছনে।

অ্যাপারচারটা একটু একটু এদিকে ওদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগলো, এবার দেখতে পাচ্ছিস ?

না তো !

এবার ?

শুধু দেখছি, মস্ত বড় একটা জন্তু নড়াচড়া করছে।

কি !

হ্যাঁ, মস্ত বড় কি যেন একটা লম্বা মতন জন্তু ! খুব কাছে।

রতন অবাক হয়ে গেল। চন্দনার থেকে সে অনেকটা লম্বা। আঙ্গুলে ভর দিয়ে ডিঙ্গি মেরে উঁচু হয়ে দেখে হেসে ফেলল হো হো করে। চন্দনার কাঁধের ওপর একটা চাপড় মেরে বললো, বোকা রাম, লেন্সের ওপর আঙ্গুল দিয়ে আছিস কেন ? তুই যেটা জন্তু ভাবছিস, সেটা তোর আঙ্গুল। হাত সরা—

নিজেই সরিয়ে দিল চন্দনার হাত। তারপর বললো, এবার ঠিক দেখতে পাচ্ছিস ?

হঠাৎ চন্দনার চোখে ঝলমল করে উঠলো আলো। অন্ধকার আকাশে জ্বলজ্বল করছে অনেক তারা। এত কাছাকাছি এত বেশী উজ্জ্বল নক্ষত্র সে কখনো দেখেনি। শক্তিশালী দুরবীণে যেন উদ্ভাসিত হয়ে গেছে আকাশ। অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য।

চন্দনার পিঠে রতনের হাত, তার পিঠে লেগেছে রতনের বুক। চন্দনার শরীরটা শিরশির করছে। ভেতরে যেন ঝনঝন শব্দ লাগছে।

রতনদা তার দাদার মতন, তবু এই অনুভূতিটা সে অস্বীকার করতে পারে না। ট্রাম-বাসে কিংবা অন্য কোথাও যে কোনো পুরুষের ছোঁয়া লাগলেই, তার এই রকম হয়। অথচ সে শুধু একজনেরই স্পর্শ চায়।

অস্ফুট স্বরে চন্দনা বললো, ভাবাই যায় না যে কত দূরে ঐ চাঁদ—সেখানে আমাদের মতন দু'জন মানুষ নামবে। চাঁদের ওপর হেঁটে বেড়াবে!

রতন বললো, চাঁদে মানুষ যাওয়ার ব্যাপারটা তো এখন পুরোনো হয়ে গেছে।

তবু ভাবতে কি রকম অবাক লাগে না।

তা লাগবেই। যতদিন না আমি নিজে যাচ্ছি।

তুমি যাবে?

চান্স পেলেই যাবো। চাঁদে যেদিন থেকে এরোপ্লেন চলবে, সেই দিনই আমি টিকিট কাটাবো, এখন থেকে টাকা জমাচ্ছি।

মেয়েদের বোধহয় যেতে দেবে না, না?

কেন দেবে না!

মেয়ে অ্যাস্ট্রোনাট কেউ যাচ্ছে না কেন তা হলে?

অ্যামেরিকানদের কেউ যায়নি—রাশিয়ান মেয়েরা রকেট চালিয়ে স্পেশে ঘুরে এসেছে।

চাঁদে তো নামে নি।

রতন বললো, দে এবার আমার হাতে দে। সময় হয়ে গেছে। চন্দনা বললো, আমাকে একটু দেখতে দিও।

রতন বাইনোকুলারটা নিয়ে সারা আকাশ তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলো। কোথায় সেই ভ্রাম্যমান তারা। মাত্র চল্লিশ সেকেণ্ড থাকবে কলকাতার আকাশে।

খুঁজে না পেয়ে ভুরু কুঁচকে গেল রতনের। ইস দেখা হবে না! কত লোক কলকাতার আকাশে আজ তাকিয়ে আছে।

হঠাৎ এক সময় উত্তেজিত ভাবে সে বলে উঠলো, ঐ যে, ঐ যে,

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

চন্দনা বললো, কই-কই আমাকে একটু দেখতে দাও—

এদিকে আয় শিগগির!

চন্দনা দৌড়ে চলে এলো রতনের বুকের কাছে। রতন দূরবীণটা চেপে ধরলো চন্দনার চোখে। চন্দনা বললো দেখতে পাচ্ছি না।

চন্দনার থুতনিটা উঁচু করে ধরে রতন বললো, এই দিকে ছাখ এক্ষুনি চলে যাবে।

চন্দনা তিন চার মুহূর্তের জন্য মাত্র দেখতে পেল। এবারও তার শরীর দিয়ে একটা শিহরণ বয়ে যাচ্ছে। শুধু অ্যাপোলো দেখার জন্যই নয়, রতনের শরীরের সঙ্গে তার সম্পূর্ণ শরীর লেগে আছে।

চন্দনা আস্তে আস্তে সরে গিয়ে বললো, চলে গেছে।

দেখা হলো তো?

দারুণ, না? কলকাতায় কত লোক দেখেনি। শুধু আমরা দু'জনে দেখলাম।

অনেকেই দেখেছে। দেখিস, কাল কাগজে বেরুবে।

আচ্ছা, রতনদা খড়্গপুর আই আই টিতে কি অবজারভেটরি আছে? ওখানকার ছেলেরাও দেখছে?

হঠাৎ খড়্গপুরের কথা কেন?

ওখানে আমার চেনা একজন থাকে। ভাবছি সেও এই সময় দেখছে কিনা!

ওখানে কি অ্যাস্ট্রোনমি পড়ানো হয় যে অবজারভেটরি থাকবে? তবে, দূরবীণ দিয়ে কেউ কেউ দেখতে পারে আমাদের মতন। খড়্গপুরে কে আছে!

আছে একজন, তুমি চিনবে না!

রতন চন্দনার থুতনি ধরে নেড়ে দিয়ে বললো, আমি খুব ভালো ভাবেই চিনি।

চন্দনা লজ্জা পেয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল।

রতন আর একটা সিগারেট ধরালো। তারপর বললো, সপ্তর্ষি, কালপুরুষ এইসব জিনিস? কোনটা শুক্রগ্রহ বলতো!

চন্দনা বললো, ওসব আমি চিনি। রোজই তো আকাশ দেখি। তোমার মতন তো শুধু এই একদিনই আকাশ দেখলুম না। মাঝে মাঝে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে বেশ লাগে। এরপর ভাবছি আসবো মাঝে মাঝে।

তোমার সময় কোথায়? তোমার কত বন্ধুবান্ধব!

অনেক জিনিস মনে মনে ভাবলেও ঠিক করা যায় না। তুই যে রাত্তিরে এরকম ছাদে চলে আসিস, তোর পড়াশুনোয় ক্ষতি হয় না?

কত পড়াশুনো করবো! আকাশের দিকে তাকালে আমার মন ভালো হয়ে যায়। মনে হয়, আকাশটা কত বড় আর আমরা কত ছোট। আমার সবচেয়ে ভালো লাগে কালপুরুষকে দেখতে উনি যে সমস্ত গ্রহ নক্ষত্রকে হুকুম দিচ্ছেন।

ইস, খুব যে কবিত্ব করছিস রে? তোর ইয়ে মানে খড়্গপুরের বন্ধু কবিতাও লেখে নাকি?

এই রতনদা. ভালো হবে না বলছি।

রতন বায়নোকুলারটা খাপে ভরে বললো, আমি এবারে নিচে যাবো। তুই থাকবি এখানে?

চন্দনা বললো, না, চলো, আমিও যাই।

রতনের হাতে তখনও জ্বলন্ত সিগারেট, চন্দনা বললো, ওটা ফেলে দাও!

কেন?

তিনতলার মাসীমার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। ওর সামনে তুমি সিগারেট খাবে?

তা কি হয়েছে? আমি ওসব মানি-টানি না।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো ওরা। তিনতলার বারান্দাতেই বাড়িওলী মাসীমা আর একজন বৃদ্ধা বসে আছেন।

মাসীমা জিজ্ঞেস করলেন চন্দনা নাকি?

হ্যাঁ মাসীমা আমি।

কি রে, আজ ভূত দেখতে পেলি?

না, মাসীমা, রোজই তো চেষ্টা করছি।

হঠাৎ মাসীমা গম্ভীর হয়ে প্রশ্ন করলেন, তোর সঙ্গে কে?

চন্দনা বললো, ইনি, রতনদা, একতলায় থাকেন।

বৃদ্ধা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, তোমরা দু'জনে ছাদে কি করছিলে?

রতন হাতের সিগারেটটা সিঁড়ি দিয়ে দোতালার দিকে ছুঁড়ে, ফেলে দিল।

চন্দনা বলল, আমরা তারা দেখছিলাম। আজ ঐ যে অ্যাপোলো উঠছে না আকাশে।

অন্ধকারের মধ্যে তোমরা তারা দেখছিলে? এ আবার কি রকম কথা? আমাকে বলে যাওয়া উচিত ছিল।

রতন এ পর্যন্ত কোনো কথা বলেনি। এবার সে একটু কড়া গলায় বললো. কেন, ছাদে ওঠা কি বারণ নাকি?

মাসীমা তাঁর ঘোলাটে চোখ রতনের দিকে তুলে ধরে বললেন, আমি বাছা, এসব পছন্দ করি না। তুমি কখন চুপি চুপি ছাদে উঠে গেলে?

চুপি চুপি উঠবো কেন? আমার ইচ্ছে হয়েছে, আমি গেছি।

রতন আর দাঁড়ালো না। তরতর করে নেমে গেল নিচে। চন্দনা একটু দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাবলো, মাসীমা তাকে আরও কিছু বলবেন।

কিন্তু বৃদ্ধা নিজেদের মধ্যে ফিসফাস করে কি সব আলোচনা করতে লাগলেন, চন্দনার দিকে তাকালেন না। চন্দনা নিজে কিছু বলবে কি বলবে না ভেবে পেল না। একটুক্ষণ বোকার মতন দাঁড়িয়ে থেকে নেমে এলো পায়ে পায়ে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল চন্দনার।

মাসীমা এমনিতে কত ভালো। কত সুন্দর গল্প বলেছিলেন চন্দনাকে। আজ এ রকম একটা বিশ্রী সুরে কথা বললেন কেন? আগেকার

লোকদের এই একটা দোষ। কোনো ছেলের সঙ্গে কোনো মেয়ের মেলামেশা দেখলেই মেজাজ তিরিক্ষে হয়ে যায়। নিজেরা এই রকম মেলামেশার সুযোগ পায়নি কি না? রতনদা যে কত ভালো লোক, তা জানেন না, শুধু শুধু বিশ্রী কথা বললেন।

মেজাজ খারাপ হয়ে থাকার জন্যই চন্দনা অ্যাপোলো দেখার রোমাঞ্চকর গল্প বলার কথা ভুলে গেল। কারুকে কিছু বললো না। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়লো তাড়াতাড়ি।

মাঝ রাত্তিরে সবাই ঘুমিয়ে পড়ার পর চন্দনা আবার জেগে উঠলো। কাগজ পেন্সিল নিয়ে বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে চিঠি লিখতে আরম্ভ করলো, একজনকে। বিশেষ একজনকে।

চন্দনা লিখলো, আজ রাত্রে, আমি কলকাতার আকাশে অ্যাপোলো দেখলাম। খড়্গপুরের আকাশে দেখা গেছে? তুমি তখন কি করছিলে? আমার মনে হচ্ছিল, সত্যি মনে হচ্ছিল, তুমি আর আমি দু'জনে একই আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে, দু'জনেই চাঁদ, তারা, কালপুরুষ সব দেখতে পাচ্ছি। আমরা দু'জনের দু'জনকে দেখতে পাচ্ছি না—

পরদিন বিকেলবেলা চন্দনা সবে মাত্র কলেজ থেকে ফিরেছে, তার মা নিজের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, এই টুকু, শুনে যা!

মায়ের মুখখানা থমথমে। গলার স্বর শুনেই চন্দনা বুঝতে পারলো, আজ কিছু একটা হয়েছে।

চন্দনা বললো, মুখ হাত ধুয়ে আসছি!

মা ঝাঁঝালো গলায় বললেন, না, এক্ষুনি আয়!

চন্দনা বই খাতা নিজের ঘরে রেখে আসতেই মা তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেলেন নিজের ঘরে। দরজা বন্ধ করে দিয়ে বিনা ভূমিকায় জিজ্ঞেস করলেন, তুই রোজ সন্ধ্যেবেলা ছাদে যাস কেন?

চন্দনা মুখ চোখে সত্যিকারের বিস্ময় ফুটিয়ে বললো, কেন, কি হয়েছে তাতে?

কেন যাস্‌, আগে বল।

বাঃ, এমনিই যাই, আমার ভালো লাগে বলে যাই।

এমনিই যাস। তোর পেটে পেটে এই বুদ্ধি। ছি ছি ছি আজ বাড়িউলি গিন্নি আমাকে ডেকে যা নয় তাই শোনালেন। তোর জন্য আমাদের মাথা কাটা যাবে?

চন্দনা গুম হয়ে গেল! কান্না এসে গেল তার! যখন কেউ কোনো মিথ্যে অভিযোগ করে তখন তার উত্তর দিতেও ইচ্ছে করে না।

কি, উত্তর দিচ্ছিস না যে?

কি উত্তর দেবো বলো?

লাজ-লজ্জার মাথা একেবারে খুইয়েছিস? রতনের সঙ্গে তুই রোজ রোজ লুকিয়ে ছাদে দেখা করিস।

রতনদার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে যাবো কেন? ওদের ফ্ল্যাটেই তো আমি যখন তখন যাই।

সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি। লুকিয়ে দেখা করতে যাস কেন?

কোনোদিন লুকিয়ে দেখা করি না। কাল রতনদা ছাদে গিয়েছিলেন অ্যাপোলো দেখতে।

বাড়িউলি গিন্নী বললো আমাকে, রতন প্রায়ই গোপনে ছাদে যায়—কালকেও যাবার সময় দেখতে পান নি, ফেরার সময় ধরা পড়ে গেছে। একটুও লজ্জা নেই ছেলেটার, বয়সে তোর থেকে কত বড়—

অন্য যে যা বলবে অমনি তুমি তাই বিশ্বাস করবে? আমার কথা কিছু শুনবে না।

অ্যাপোলো না ম্যাপোলো দেখবার জন্য রতন শুধু তোকেই ডাকতে যায় কেন? নিজের বোনদের ডাকতে পারেনি?

রতনদা আমাকে ডাকেন নি।

এক ঘণ্টা ধরে ছাদে কি করছিলি? লোকে শুনলে কি বলবে? আর লোকে শুনবেই, এসব কথা চাপা থাকে না। তোর বাবা শুনলে কি যে হবে।

চন্দনা ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো। সে আর কথা বলতে পারছে না। তার এখন শুধু মনে পড়ছে একজনের কথা। যে আছে খড়্গপুরে। একমাত্র সেই এসব শুনলে একটুও বিশ্বাস করতো না।
মা আবার বললেন, রতনের মা তো আমাকেই দোষ দেবে। সবাই মেয়েরই দোষ দেখে। ওরা তো ভট্টাচার্যি, ওদের সঙ্গে কি আমাদের মেলে? একতলার গিন্নী রোজই আমার কাছে দেমাক করে বলে, ছেলের বউ হবে পটের বিবির মতন, বড়লোকের ঘর ছাড়া মেয়ে আনবে না।
চন্দনা মাকে জড়িয়ে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললো, মা, তুমি এসব কি বলছো? রতনদা সত্যিই আমার দাদার মতন।
তখন থেকে হুকুম হয়ে গেল, চন্দনা আর কখনো ছাদে যেতে পারবে না। একতলার ফ্ল্যাটে সে যেন কখনো না যায়। শুধু কলেজ আর বাড়ি—এর বাইরে তার আর কোনো জীবন থাকবে না।
মাধ্যাকর্ষণের বন্ধন ছাড়িয়ে অ্যাপোলো ছুটে গিয়েছিল মহাশূন্যে। সেই অ্যাপোলো দেখার কারণে কলকাতার একটি মেয়ের জীবনে বন্দীদশা নেমে এলো।
চন্দনার বাবার কানে যেন কথাটা না যায়, এই রকম সাবধানতা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মা নিজে এক সময় বলে ফেললেন তাঁকে। চন্দনার বাবা রাশভারী ধরনের মানুষ। সংসারের কথা নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। অফিস থেকে ফেরেন বেশ দেরি করে, ঘুমোবার আগে বাকি সময়টা বই পত্র পড়ে কাটান। এ ছাড়া প্রায়ই তাঁকে অফিসের কাজে টুরে যেতে হয়।
তিনি সব শুনে চন্দনাকে ডাকলেন। শান্ত ভাবে জিজ্ঞেস করলেন, তুই রোজ ছাদে যাস কেন মা?
চন্দনা উত্তর দিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নোখ খুঁটতে লাগলো। বাবার সঙ্গে কথা বলতে সে এমনিতেই ভয় পায়।
বাবা নিজেই আবার বললেন, ছাদে যেতে তোমার ভালো লাগে?
চন্দনা প্রায় অস্ফুট গলায় বললো, হ্যাঁ।

হুতন গিয়েছিল কেন ? সে প্রায়ই যায় ?

না, মাত্র একদিন গিয়েছিলো।

কেন ?

অ্যাপেলো সেভেনটিন দেখবর জন্য। ওর দূরবীণ আছে।

বাবা আগ্রহের সঙ্গে বিছানার উপর উঠে বসলেন। তারপর বললেন, দেখতে পেয়েছিলি ? কি রে, দেখতে পেয়েছিলি ?

হ্যাঁ।

কি রকম দেখতে ?

চলন্ত তারার মতন। একটু লম্বা ধরনের।

কোন দিক থেকে কোন দিকে গেল ?

উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড।

ঠিক। ঠিকই তো দেখেছিস।

বাবা চশমা খুলে মায়ের দিকে বিস্মিত ভাবে তাকালেন। তারপর বললেন, এতে দোষের কি আছে ? অ্যাঁ ?

মা চোখ দিয়ে বকতে চাইলেন বাবাকে।

বাবা তবু বললেন, তোমরা বড্ড বাড়াবাড়ি করো। মেয়ে হয়ে জন্মে কি অপরাধ করেছে নাকি। নিজে ইচ্ছে মতন কিছুই করতে পারবে না ? নারে, টুকু, তোর যখন খুশী ছাঁদে যাবি। পড়াশুনো কিন্তু মন দিয়ে করতে হবে। যা, এখন পড়তে যা।

চন্দনা ঘর থেকে বেরোবার সময় দরজাটা ভেজিয়ে দিল। তারপর সেখানে একটু দাঁড়ালো। সে শুনতে পেল মা আর বাবাতে ঝগড়া লেগে গেছে। মা বললেন, তোমার একটু কাণ্ডজ্ঞান নেই। তুমি তো গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াও—

নিরীহ বাবাকে এখন অনেক বকুনিই সইতে হবে। চন্দনা বুঝতে পারলো, বাবা মাকে একরকম মুক্তির আদেশ দিলেও তার বন্দীদশা আসলে ঘুচবে না। সংসারের ভার মায়ের হাতে। মা দুদিনেই বাবার মত পাল্টে নিতে বাধ্য করবেন।

চন্দনা নিজের ঘরে গিয়ে উদাসীন মুখে বসে রইলো। খুব ইচ্ছে

করছে তাকে একবার দেখতে। সে যদি থাকতো চন্দনার সব দুঃখ দূর করে দিত।

একতলার ফ্ল্যাটে যাওয়াও চন্দনার নিষেধ হয়ে গেছে। কলেজে যাবার সময় সে সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে খুব সতর্কভাবে তাকায়। ওদের কাউকে দেখা না গেলে সে নেমে যায় তরতর করে, রতনের ঘরের দিকে একবার তাকায়ও না। ফেরার সময়েও সেই রকম।

তবু কারুর না কারুর সঙ্গে এক সময়ে দেখা হয়ে যায়ই।

চন্দনা বাস থেকে নেমেছে, তপতী সেই বাসেই উঠতে যাচ্ছিল একেবারে মুখোমুখি পড়ে গেল। সেই বাসটা ছেড়ে দিল তপতী। চন্দনাকে জিজ্ঞেস করলো, এই তোমাকে কয়েকদিন দেখি না যে? আসোনা কেন আমাদের ওখানে?

চন্দনা টপ করে উত্তর দিল, তপতীদি আপনিও তো আমাদের ফ্ল্যাটে আসেন না।

তপতী এক গাল হেসে ফেললো, তারপর বললো, ও, আমি না গেলে বুঝি তুমি আসবে না? আমার তো যাওয়াই হয় না সত্যি কিন্তু তুমি তো আগে প্রায়ই আসতে।

আমার পড়াশুনোর বেশী চাপ পড়ে গেছে।

পড়াশুনোর চাপ না অন্য কিছু, সত্যি করে বলো তো!

অন্য আবার কি?

তপতী একদৃষ্টে তাকালো চন্দনার দিকে। তপতীর চোখে মোটা কাচের চশমা। রোদ পড়ে ঝিলিক দিচ্ছে।

এরকম দৃষ্টির সামনে কি রকম যেন অস্বস্তি লাগে। চন্দনা বললো কি দেখলেন তপতীদি!

তোমাকে দেখছি। দিন দিন বেশ সুন্দর হয়ে উঠছো তুমি। মেয়েরা কখন এরকম সুন্দর হয় জানো তো? প্রেমে পড়লে!

তোমাকে দেখেই তা বোঝা যাচ্ছে।

তপতী বিজ্ঞানের রসকষহীন বিষয় নিয়ে গবেষণা করলেও বেশ মজার কথা বলতে পারে। চন্দনা দারুণ লজ্জিত হয়ে পড়লো।

তাকে কেউ সুন্দর বললেই তার লজ্জা করে। একমাত্র ও ছাড়া।
তপতী চন্দনার কানের কাছে মুখ এনে বললো, এই, তুমি নাকি আমার দাদার সঙ্গে প্রেম করছো! দাদা তো আগে মেয়েদের নিয়ে মাথা ঘামাতো না।
চন্দনা বিস্ফারিত ভারে তাকালো। তার একটু আগেকার ভালোলাগা ও লজ্জার শিহরণ সব নষ্ট হয়ে গেল যেন।
তপতী আবার হাসি মুখে বললো, আমি ভাবছি, আমার বোনেরা যখন তোমাকে বৌদি বলে ডাকবে! আমি কিন্তু ভাই তোমাকে টুকু বলেই ডাকবো।
চন্দনা ব্যাকুল ভাবে বললো, তপতীদি, আপনিও এ কথা বিশ্বাস করেন? আমি তা হলে মরে যাবো। রতনদা আমার নিজের দাদার মতন। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করুন—
তপতী বললো, ওকি? তুমি এত ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছ কেন? আমার কানে এলো কথাটা, আমি ভাবলাম, ভালোই তো হবে।
পাঁচটা দশটা মেয়ে দেখে দেখে পছন্দ করার চেয়ে চেনাশুনো কোন মেয়েকে বিয়ে করাই তো ভালো। তা ছাড়া, এমন সুন্দর, লক্ষ্মী স্বভাবের মেয়ে—
তপতীদি, এটা অসম্ভব! রতনদাকে আমি যে ও চোখে দেখি না। আমি ওঁকে ভক্তি করি, নিজের দাদার চেয়ে বেশী। সবাই বানিয়ে বানিয়ে বলছে।
তোরা নাকি ছাদে অভিসার করিস?
মোটেই না। মিথ্যে কথা!
হলে কিন্তু বেশ ভালো হতো। আমার বাস এসে গেছে, আমি চলি।
চন্দনা মন্থর পায়ে হাঁটতে লাগলো বাড়ির দিকে! সবাই মিলে কি শুরু করেছে তাকে নিয়ে? কেউ তার কথা বিশ্বাস করে না। সে থাকলে ঠিক বিশ্বাস করতো।

অন্ধকার ছাদে দু'জন ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে থাকলেই লোকে খারাপ ভাববে? রতনদা তো কোনো রকম অসভ্যতা করেননি। একটা খারাপ কথা বলেননি। তার গায়ে হাত দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে তো নিজের দাদার মতন। যারা ভালোবাসে, তারা শুধু ঐ রকমভাবে গায়ে হাত দেয় না। রতনদার বদলে যদি ছাদে সে থাকতো? চন্দনার আর একটা পরীক্ষা বাকি ছিল। এতদিনে একবারও রতনদার সঙ্গে আর দেখা করেনি। সে ভেবেছিল, আর কোনদিন রতনদার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা বলবে না। কিন্তু একই বাড়িতে বাস, তা কখনও হয়?

চন্দনাকে রতনের সামনে দাঁড়াতে হলো না, রতন নিজেই ডাকলো। সেই দুপুরবেলা চন্দনা কলেজ থেকে একটু তাড়াতাড়িই ফিরেছে। বাইরের ঘরে বসেছিল রতন একা।

চন্দনা একবার আড়চোখে বাইরের ঘরের দিকে তাকিয়ে রতনকে দেখতে পেল না। নিশ্চিন্ত হয়ে সে বাগানে ঢুকে ইউক্যালিপটাসের কয়েকটা পাতা কুড়োতে লাগলো। বইয়ের ফাঁকে সে সব সময় এই পাতা ভরে রাখে। অনেক সময় কলেজের মেয়েদের দেয়, তারা খুশী হয়।

রতন ঘরের জানালার কাছে এসে দাঁড়িয়ে গম্ভীর ভাবে ডাকলো, এই চন্দনা!

চন্দনা অমনি চমকে উঠলো। ফ্যাকাসে হয়ে গিয়ে তাকালো রতনের দিকে। রতন ভুরু কুঁচকে বললো, ক'দিন তোকে দেখতে পাইনি কেন? শুনে যা—

চন্দনা বললো, বলুন।

ঘরের ভেতর আয়।

চন্দনা পায়ে পায়ে এগিয়ে গেল দরজার কাছে। সেখান থেকেই বললে, বলুন না।

ভেতরে আসতে পারছিস না? ভয় পাচ্ছিস?

চন্দনা ঢুকলো ঘরের মধ্যে। রতন আঙ্গুল দিয়ে চেয়ার দেখিয়ে

দিয়ে বললো, বোস ওখানে।

ও বসে মুখ নীচু করে রইলো।

তুই ভয় পাস আমাকে?

না।

লোকে বলাবলি করছে, সব আমি শুনেছি। আমরা কোনো অন্যায় করেছি?

আপনি তা ভালো করেই জানেন।

তাকা আমার মুখের দিকে। আমরা কোনো অন্যায় করিনি, সুতরাং কারুকে আমাদের ভয় পাবার দরকার নেই। তিনতলার ঐ বুড়িটা যা তা বলবে, আর তাই আমাদের মেনে নিতে হবে? কক্ষনো না। তুই আগে যেরকম আসতিস, এখনও সেই রকম আসবি।

চন্দনা চেয়ার থেকে উঠবার চেষ্টা বললো—আমি এখন যাই?

না, আর একটু বোস। নির্জন দুপুর, তুই আমার ঘরে এসে বসে আছিস, এটা কেউ দেখুক, আরও অনেক কিছু বানাক তবে তো মজা হবে। লোকের তো খেয়ে দেয়ে আর কাজ নেই। কেউ কিছু বললে, মুখের ওপর উত্তর দিয়ে দিবি, বেশ করেছি।

রতনদা পুরুষ হয়ে একথা বলতে পারেন। তিনি মেয়েদের কথা বুঝবেন কি করে? চন্দনা কি তার মাকে ঐ কথা বলতে পারে!

রতন এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে। তার দৃষ্টির ধরন একটু বদলে গেছে। দুর্নামেরও একটা মধুর সৌরভ আছে। রতন এর আগে খেলাধুলোর জগৎ ও বন্ধুবান্ধব নিয়েই মগ্ন ছিল, মেয়েদের কথা বিশেষ চিন্তাই করেনি। তার একমাত্র ইচ্ছে কোনোক্রমে একবার বিলেত যাওয়া এবং লর্ডসের মাঠে খেলা দেখা।

কিন্তু কয়েকদিন ধরে এই মেয়েটির সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে যে কথা বলা হচ্ছে, তার মধ্যে একটা রোমাঞ্চ আছে।

হঠাৎ রতনের মাথা গুলিয়ে গেলো। সেদিন অন্ধকার ছাদেও সে যা করেনি, আজ এই দুপুরবেলা, লোকজনের যাতায়াতের পথের ধারে

দরজা জানালা খোলা ঘরে সে একটা কাণ্ড করে বসলো।

হঠাৎ উঠে এসে দাঁড়ালো চন্দনার পাশে। তার দাদা সুলভ গাম্ভীর্য আর একটুও নেই।

আবেগ জড়ানো গলায় বললো, তুই যে মানে, ইয়ে তুমি এত সুন্দর, আগে কখনো লক্ষ্যই করিনি। কি সুন্দর ফুলের মতন মুখ, টানা চোখ।

তাড়া খাওয়া পাখির মতন চন্দনা ছটফট করে উঠলো। উঠে দাঁড়িয়ে পড়তেই রতন বাহুতে জড়িয়ে ধরলো তাকে। সামনেই দরজা।

রতনদা, একি করছেন!

তোমার কোন ভয় নেই। তুমি এত সুন্দর।

ছাড়ুন, শিগ্‌গিরি ছাড়ুন।

কোন ভয় নেই। আমি মাকে বলে···

রতন তখন অন্ধের মতন চন্দনার ঠোঁট খুঁজছে। চন্দনা সরসর করে বসে পড়লো রতনের পায়ের কাছে! তার পা দুটি চেপে ধরে বললো, রতনদা, আমার উপায় নেই, আমাকে ক্ষমা করুন। না হলে আপনার পায়ে আমি মাথা ঠুকবো।

রতন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। নিজেকে সামলে নিয়ে আড়ষ্ট গলায় বললো, কি হয়েছে? তুমি ভয় পেয়েছো!

অশ্রু সজল মুখ তুলে চন্দনা বললো, আমার উপায় নেই।

রতন হাত ধরে চন্দনাকে তুলে দাঁড় করালো। বললো, বুঝতে পেরেছি, আমারই দোষ। আমার মাথার গোলমাল হয়ে গিয়েছিল। চন্দনা, লক্ষ্মী শোন, আমায় ক্ষমা করিস ভাই।

চন্দনা, আর এক মুহূর্ত দেরী করলো না। বই খাতা তুলে নিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে গেল। ওপরে পৌঁছে দেখলো মা বিছানায় শুয়ে আছেন! কাল থেকে মায়ের একটু জ্বর। চন্দনা তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল, মা জিজ্ঞেস করলেন, জানলা দিয়ে দেখলাম, তুই গেট দিয়ে ঢুকছিস, তারপর ওপরে আসতে এত দেরী

হলো কেন রে ?

চন্দনা আগেই চোখ-মুখ মুছে নিয়েছে। হাসিমুখে বললো, সিঁড়ির কাছে তপতীদির সঙ্গে দেখা হলো তাই একটুখানি···

কি বলছিল তপতী ?

তোমার অসুখের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।

একটু না চিন্তা করে কি চমৎকার মিথ্যে কথা বলে গেল চন্দনা। কারণ সত্যি কথা বললেও তো মা বিশ্বাস করতেন না। মার সঙ্গে তার একটা দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে ইতিমধ্যেই।

মা চন্দনার কথা শুনে কি বুঝলেন কে জানে। দু'দিন পরে জ্বর থেকে সেরে উঠেই নানান আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে ঘোরাঘুরি করতে লাগলেন। চন্দনাকেও কয়েক জায়গায় নিয়ে গেলেন সঙ্গে করে, এবং প্রত্যেকদিন অনেক রাত পর্যন্ত বাবার সঙ্গে মায়ের কি আলোচনা আর ঝগড়া হয়।

একদিন সকালে চায়ের টেবিলেই মা বললেন, আজ আর তোকে কলেজে যেতে হবে না।

চন্দনা জিজ্ঞেস করলো কেন ?

আজ দরকার নেই কলেজে গিয়ে। আর তো পুজোর ছুটি এসেই যাচ্ছে, এখন আর কলেজে কি-ই বা পড়াশুনো হয়। আজ দুপুরে ভালো করে ঘুমোবি।

কেন বলো তো! কি ব্যাপার ?

আজ কয়েকজন ভদ্রলোক আসবেন তোকে দেখতে।

চন্দনার রক্ত চলাচল বন্ধ হয়ে গেল শরীরের। সে এক মিনিট চুপ করে বসে রইলো। মা আরও কি বললেন, তার কানে গেল না। আর একটাও শব্দ উচ্চারণ না করে সে খাওয়া ফেলে চলে গেল নিজের ঘরে। ঝপাং করে শুয়ে পড়লো বিছানায়।

মাও উঠে এলেন সঙ্গে সঙ্গে। খাটে বসে মেয়ের চুলে হাত দিয়ে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলেন, এইটুকু, কি হলো ? উঠে এলিযে ?

চন্দনা মুখ ফেরালো। সে কাঁদছে না, শুকনো চোখ, শান্ত কঠিন গলায় বললো, মা, আমাকে যদি কেউ দেখতে আসে, তা হলে আমি ঠিক আত্মহত্যা করবো!

একি বলছিস তুই? ছেলেটি খুব ভালো, রাজপুত্রের মতন চেহারা, বংশও সেরকম উঁচু।

তোমরা আমাকে তা হলে আর পাবে না। আমি এই এক কথা বলে দিলাম—শুধু শুধু লোকজনকে ডেকে এনে তোমরাই অপমানিত হবে।

সারাদিন ধরে বোঝানো হলো চন্দনাকে! বাবাও সেদিন অফিস গেলেন না। তিনিও এখন মায়ের দলে। তিনি বললেন, সম্বন্ধটা হয়ে যাক। বিয়ে না হয় পরীক্ষার পরে হবে।

তার সেই এক কথা। কোনো লোক তাকে দেখতে এলেই সে আত্মহত্যা করবে।

শেষকালে এমন হলো, চন্দনা হিষ্টিরিয়া রোগীর মতন ছটফট করতে লাগলো। কথা বলতে গেলেই তার হেঁচকি আসে অনবরত।

বাবা-মা দু'জনেই চিন্তিত হয়ে পড়লেন তার জন্য। বাবা পাঞ্জাবী দম্পতির ফ্ল্যাট থেকে টেলিফোন করে পাত্রপক্ষকে আসতে বারণ করে দিলেন। রাগের বদলে বহুদিনের পুরোনো স্নেহ আপ্লুত করে ফেললো ওঁদের! ওঁরাই যেন অপরাধী, এইভাবে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন মেয়েকে। বাবা প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি কক্ষনো আর পাত্রপক্ষের সামনে মেয়ে দেখাবেন না গরু-ছাগলের মতন।

কিন্তু বিয়ে তো দিতে হবে। মা তাই শেষ পর্যন্ত নরম হয়ে বললেন. তাহলে কি রতনকেই তোর পছন্দ? ওর মায়ের সঙ্গে কথা বলবো? হোক ভট্টাচার্যি—

চন্দনা বললো, রতনদা আমার নিজের দাদার মতন। তোমাকে আমি অনেকবার বলেছি।

তা হলে কি চাস তুই? বল, কোনো ভয় নেই—

চন্দনা আবার চুপ করে গেল। না, সে বলতে পারবে না, কিছুতেই

বলতে পারবে না। সে যে অনেক দূরে আছে।
তাছাড়া, সে তো শুধু ভালোবাসার কথা বলেছে, এখনো তো বিয়ের কথা কিছু বলে নি। চন্দনা নিজে থেকেই কি করে বিয়ের কথা বলবে!
মা-বাবাকে তো ভালোবাসার কথা বলা যায় না। এখন শুধু চোখের জল ঝরানো যায়।
বাস থেকে সামান্য একটু হাঁটতে হয়। কাঁধে ঝোলানো চামড়ার ব্যাগটা হাতে নিয়ে দোলাতে দোলাতে দ্রুত পায়ে হাঁটতে লাগলো ইন্দ্রজিৎ। দূর থেকে একবার তাকিয়ে দেখলো তাদের বাড়ির দিকে, বারান্দায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে কিনা। কেউ নেই।
সদর দরজা খোলাই ছিল, ভেতরে ঢুকে ইন্দ্রজিৎ দেখলো, রান্নাঘরের সামনে বারান্দায় মা একজন অচেনা বিধবা মহিলার সঙ্গে কথা বলছেন।
ইন্দ্রজিৎ পায়ের কোনো শব্দ করলো না। চুপি চুপি মায়ের পেছনে গিয়ে মায়ের ঘাড়ে ফুঁ দিল খুব জোরে। মা দারুণ চমকে ফিরে তাকালেন। তাঁর চোখে ভয় ছিল। সেই জন্য বোধহয় নিজের সন্তানকেও প্রথমে চিনতে পারলেন না।
দু'এক মুহূর্ত দেরী করে তিনি বললেন, এ কি? তুই কখন এলি?
ইন্দ্রজিৎ বললো, এই মাত্র!
হঠাৎ চলে এলি যে?
এমনি চলে এলাম।
মা আর কোনো প্রশ্ন করলেন না। ছেলে কলকাতার বাইরের কলেজ হস্টেলে থেকে পড়ে। আজ বৃহস্পতিবার, কোনো ছুটির দিন নয়। এই সময় তার হঠাৎ চলে আসার কোনো কারণই নেই। তবু মা অত কথা ভাবলেন না। প্রবাসী ছেলেকে দেখে একটা খুশীর ঝাপটা লাগলো তাঁর মুখে। তিনি বললেন, যা হাত মুখ ধুয়ে জামা কাপড় ছেড়ে নে। খেয়ে আসিসনি তো?
ইন্দ্রজিৎ বললো না। দারুণ খিদে পেয়েছে।

এমনি কিছু জল খাবার খাবি এখন? না একেবারে ভাত খেয়ে নিবি?

ভাত খাবো। কি রান্না করেছো আজ?

মা একটু বিব্রত বোধ করলেন। মাসের শেষ। বাজার আগুন, এখন প্রত্যেকদিন মাছ আসে না। আজ অবশ্য এসেছে বাজারের সবচেয়ে সস্তা তেলাপিয়া মাছ। ইন্দ্রজিৎ তেলাপিয়া মাছ দু'চক্ষে দেখতে পারে না—খাওয়া সম্পর্কে ওর বড্ড বাছবিচার।

এমন অনেক কথা থাকে যা মা তাঁর নিজের ছেলের কাছেও বলতে লজ্জা পান। যেমন আজকে রান্নাঘরের কৃশ অবস্থার কথা।

তবু তিনি ঈষৎ সত্য গোপন করে বললেন, ছোট মাছ আছে। খুব মুচমুচে করে ভেজে দেবো এখন। তুই তো ভাজা খেতে ভালোবাসিস।

কি মাছ?

এবার আর লুকোনো যায় না। অপরাধীর মতো লাজুক ভাবে হেসে মা বললেন, তেলাপিয়া। ভালো করে ভাজলে গন্ধ থাকে না—

ইন্দ্রজিতের বয়স কম, সে নিজের খেয়াল খুশীতে মজে আছে। সংসারের কথা ভাবে না। কয়েক মাস বাইরে রয়েছে বলে মাসের শেষে হিসেব করা বাজারের কথা মনে থাকবার কথাও নয় তার।

ইন্দ্রজিৎ বললো, ধুৎ। ওসব বাজে মাছ। আজ মাংস করো। এতদূর থেকে এলাম।

মা বললেন, এত বেলায় কে আবার মাংস আনতে যাবে। তোর দাদা, বাবা কেউ বাড়ি নেই।

আমি নিয়ে আসছি।

এত দূর থেকে এলি, আবার বেরুবি?

তা কি হয়েছে।

মা দ্রুত চিন্তা করলেন। লক্ষ্মী ঠাকুরের সামনে রাখা একটা কৌটোর মধ্যে তিনি মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই সংসারের টাকা থেকে এক টাকা দু'টাকা সরিয়ে রাখেন। অন্তত পঁচিশ তিরিশ টাকা জমেছে।

তার থেকে কিছু বার করে দিলেই চলবে।

তিনি বললেন, থাক, তোকে আর যেতে হবে না। আমি হারুর মাকে পাঠাচ্ছি। এখন মাংস এনে রান্না করতে অনেক দেরি হয়ে যাবে কিন্তু!

হোক দেরি।

হ্যাঁরে। হস্টেলে ভালো খেতে-টেতে দেয় তো?

ইন্দ্রজিৎ হো-হো করে হেসে উঠলো। হাতের ব্যাগটা মাটিতে ধপ করে ফেলে দিয়ে বললো, তুমি কি ভাবছো, আমি ওখানে না খেতে পেয়ে এখানে খাবার জন্য ছুটে এসেছি? ওখানে খুব ভালো খাবার দেয়। সকালে দুটো ডিম, কলা, টোস্ট, দুধ। তারপর দুপুরে কোনোদিন মাংস, মাছ হলে বড় বড় দু'পীস—কিন্তু ওদের রান্না আর তোমার হাতের রান্না কি এক?

মা বললেন, ওখানে রান্না খুব খারাপ বুঝি? সেই জন্যই রোগা রোগা দেখছি একটু।

কোথায় রোগা হয়েছি। আমার দু'পাউণ্ড ওজন বেড়েছে।

মা তবু ইন্দ্রজিতের হাতটা ধরে বললেন, হ্যাঁ। এই তো রোগা হয়েছিস। আমি ঠিক বুঝতে পারি!

ইন্দ্রজিৎ বললো, তুমি সবই বুঝতে পারো, শুধু নিজের কথাটাই বুঝতে পারো না! তুমি নিজে এত রোগা হয়ে যাচ্ছো কেন দিনদিন।

মা বললেন, কোথায়? আমি আবার রোগা হলুম কবে? এতেই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে নামতে দম ধরে যায়।

বিধবা ভদ্রমহিলা বললেন, না গো দিদি, ইদানীং তোমার চেহারাটা একটু খারাপই দেখাচ্ছে। নিজের শরীরটারও তো যত্ন নিতে হবে।

মা তাড়াতাড়ি কথা ঘোরাবার জন্য বললেন, খোকন, ইনি সম্পর্কে তোর পিসিমা হন, ছেলেবেলায় দেখেছিলি, মনে নেই বোধহয় তোর—

ইন্দ্রজিৎ বাধ্য ছেলের মতন বিধবা মহিলাটিকে টিপ করে একটা

প্রণাম করলো। সম্পর্কে যদি পিসীমাই হবেন, তবে মাকে উনি দিদি'বলে ডাকছেন কেন?

একটু বাদেই মহিলা উঠে পড়লেন। মা আঁচলের গিঁট খুলে একটা আধুলি দিলেন তাঁকে।

ইন্দ্রজিৎ একটু অবাক হয়ে গেল। উনি চলে যাবার পর ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস বরলো, মা, উনি এসেছিলেন কেন?

মা একটু বিরক্তির ভঙ্গী করে বললেন, কি জানি! আজকাল ঘন ঘন আসছেন। অভাবী মানুষ, কিছু সাহায্য-টাহায্য চায়। এদিকে আমাদেরই সংসার চলে না।

ইন্দ্রজিৎ একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল হস্টেলে নানারকম আনন্দ আর হৈচৈ-এর মধ্যে যাকে বলে দারিদ্র জিনিসটা সে এখন টের পায় না। কিন্তু আজ যেন মনে হচ্ছে, তাদের সংসারটাও তলে তলে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

মা আবার বললেন, ওনার আবার ঘটকালির পেশা আছে। কদিন ধরে বায়না ধরেছেন তোর দাদার বিয়ে দেবার জন্য। হাতে নাকি ভালো পাত্রী আছে। শোনো কথা! আমি কি আর সেরকম সাধ-আহ্লাদ করার ভাগ্য করে এসেছি। এত বড় ছেলে পড়াশুনো করেছে কিন্তু একটা চাকরি-বাকরি আজও জোটাতে পারে নি। সে বিয়ে করবে কোন্ মুখে? আমরাই বা ঘরে বউ এনে তাকে খাওয়াবো কি?

ইন্দ্রজিৎ হেসে বললো, দাদার বিয়ে? আজকাল কি আবার ঘটকালি করে পাত্রী দেখে বিয়ে হয় নাকি? বিয়ে করার যখন ইচ্ছে হবে দাদার, তখন ঠিকই—

মা বললেন, পাত্রী না দেখলে বিয়ে কি করে হবে শুনি? আকাশ থেকে মেয়ে আসবে?

দাদার জন্য তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। দাদা এসব কথা শুনলে খুব রাগ করবে কিন্তু!

ঐ রাগটাই তো আছে। যা, তুই জামা-কাপড় ছেড়ে নে।

ইন্দ্রজিৎ সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল দোতালায়। বেলা পৌনে এগারোটা। বাড়ি এখন ফাঁকা। বাবা অফিসে গেছেন। তার দাদা বেকার হলেও এই সময় বাড়ি থাকে না। ছোট ভাই তপু ইস্কুলে। একমাত্র তার বোন রূপা আছে বাড়িতে।

রূপার আগে নিজস্ব ঘর ছিল না আলাদা। তপু আর রূপা এক ঘরে থাকতো। এখন রূপা ইন্দ্রজিতের ঘরটা দখল করে নিয়েছে। এত বেলাতেও রূপা বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল, চুল আঁচড়ায়নি, রাত্রির শাড়ি পাল্টায়নি। রূপার স্বভাব উপুড় হয়ে শুয়ে বই পড়া আর পা দুটোকে উঁচু করে অনবরত দোলানো। শাড়ি নেমে এসেছে হাঁটুর কাছে।

ইন্দ্রজিৎ এ ঘরে ঢুকে একটু অবাক হলো। তার ঘরখানা একদম বদলে গেছে। এর মধ্যেই একটা মেয়েলি ছাপ পড়ে গেছে। মাত্র তিন মাস আগেও ইন্দ্রজিৎ এখানে ছিল, কত বিনিদ্র রজনীতে কত রকম স্বপ্ন দেখেছে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, এই রূপা, এখানে শুয়ে আছিস যে!

রূপা ধড়মড় করে উঠে বসে বললো, ছোড়দা? কখন এলি?

তিন বছরের বয়েসের তফাৎ, তবু রূপা কিছুতেই তার ছোড়দাকে তুমি বলবে না। অনেক বকাবকি করা হয়েছে, তবু শুনবে না কিছুতেই।

ইন্দ্রজিৎ বললো, আজ কলেজ নেই?

বারোটার সময় ক্লাস।

এখন তো এগারোটা বাজে।

ঠিক ম্যানেজ হয়ে যাবে। তুই হঠাৎ আজ চলে এলি কেন? আজ তো বেস্পতিবার।

এমনি ইচ্ছে হলো, চলে এলাম। কি বই পড়ছিস?

রূপা বইখানা লুকিয়ে বালিশের তলায় চাপা দেবার চেষ্টা করছিল। দাদাকে দেখাতে চায় না।

ইন্দ্রজিৎ খাটের উপরে বসে পড়ে ঝুঁকে বইখানা তুলে নিল। একটা

সস্তা ইংরেজী উপন্যাস, মলাটের ছবিটা ভালো নয়। অশোভন ভঙ্গিতে দু'জন নারী পুরুষ।

ইন্দ্রজিৎ চোখ পাকিয়ে বললো, এই সব বাজে বই পড়া হচ্ছে?

রূপা বললো, মোটেই বাজে বই নয়। মলাট দেখেই সব কিছু বোঝা যায় না।

ইন্দ্রজিৎ তার ছোট বোনের পিঠে একটা কিল মেরে বলল, নিজের পড়াশুনোর নাম নেই, কলেজ ফাঁকি দিয়ে এই সব বই পড়া হচ্ছে।

রূপা দু'হাত ছড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙলো। তারপর অবহেলার সঙ্গে উত্তর দিল, স্কুল ফাইনালে যে সেভেন্থ স্ট্যাণ্ড করে, তার সঙ্গে এরকম ভাবে কথা বলতে নেই বুঝলি ছোড়দা?

ইস। খুব গর্ব হয়েছে বুঝি তোর? এবার আর ওরকম রেজাল্ট করতে হচ্ছে না।

দেখিস, দেখিস!

তুই যে দিব্যি আমার ঘরটা দখল করে নিয়েছিস? আমি থাকবো কোথায়?

তুই তো একদিন দু'দিন থাকবি। দাদার সঙ্গে শুবি।

ভাগ! তুই যা তপুর ঘরে!

আমার সব জিনিসপত্তর এখানে।

ওসব জানি না। এঘর আমার আমারই থাকবে।

তুই বড্ড হিংসুটে। পাঁচ বছর হস্টেলে থাকতে হবে, তাও নিজের ঘর দখলে রাখা চাই, না?

রূপা বিছানা ছেড়ে উঠলো। আলনা থেকে নিজের শাড়ি জামা নিয়ে হাত বাড়িয়ে বললো, দে, বইটা দে।

থাক আমার কাছে পড়ে দেখি।

রূপা মুচকি হেসে বললো, পড়িস না। খারাপ হয়ে যাবি।

তুই বড় ফাজিল হয়েছিস তো!

যাঃ, বইটা দে। আজকেই ফেরৎ দিতে হবে। ওটা চন্দনার বই।

নামটা শুনে ইন্দ্রজিৎ যে চমকে উঠেছে, তা লুকোতে পারলো না।

তবু সে কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক করে নিয়ে বললো, চন্দনার সঙ্গে এখনো দেখা হয়?

রূপা মুচকি হেসে বললো, দেখা হবে না কেন? ওর কলেজ তো আমাদের কলেজের কাছেই। তা ছাড়া কফি হাউসে—

চন্দনার সঙ্গে তোর না ঝগড়া হয়ে গিয়েছিল—

একবার ঝগড়া হলেই তো পরে বেশী করে ভাব হয়।

ইন্দ্রজিৎ বইখানা এগিয়ে দিল। যেন চন্দনা সম্পর্কে তার আর কোনো উৎসাহই নেই।

রূপা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় আচমকা বলে গেল, চন্দনার শিগগিরই বিয়ে হবে শুনছি!

ইন্দ্রজিৎ তাড়াতাড়ি উঠে রূপাকে আবার ডাকতে গেল। কিন্তু রূপা ততক্ষণে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছে।

ইন্দ্রজিৎ ফিরে এসে খাটে বসলো। একটা সিগারেট ধরিয়ে তাকিয়ে রইলো দেওয়ালের দিকে। সাদা দেওয়াল তবু যেন সেখানে সে চলচ্চিত্র দেখছে।

চন্দনার যদি সত্যিই বিয়ে হয়ে যায়? সে কি আটকাতে পারবে? কিসের জোর আছে তার। সে সামান্য একটা ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্র—এখনো বহু দেরী তার পাস করে বেরুবার! তারপর পাশ করার পরও যদি একটা চাকরি পাওয়া যায় ভালো মতন তার কথার একটা দাম হবে। যার টাকা নেই, তার কথারও কোনো গুরুত্ব নেই, এই সমাজে তার কোনো জোর নেই।

কিন্তু অতদিন চন্দনা যদি অপেক্ষা না করে? লাল বেনারসী শাড়ী পরে চন্দনা বসে বিয়ের আসরে, উল্টো দিকে আর একজন লোক টোপর মাথায়—অনেকটা যেন সুব্রতদার মতন। এই দৃশ্যটা কি রকম! চন্দনার মুখ দেখা যাচ্ছে না সে মুখটা ফিরিয়ে আছে অন্যদিকে। সে কি কাঁদছে? চন্দনার ইচ্ছের বিরুদ্ধেও কেউ যদি এইভাবে জোর করে বিয়ে দেয় চন্দনার। হয়তো ইন্দ্রজিৎ খবরই পাবে না। কিংবা খবর পেলেও—সে কি করবে; একটা তলোয়ার

হাতে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে চন্দনার হাত ধরে নিয়ে আসবে বাইরে। সেখানে অপেক্ষা করবে সাদা ঘোড়া—সেই ঘোড়ার পিঠে চেপে দু'জনে……

ইন্দ্রজিতের ঠোঁটে একটা বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠলো। এত ছেলেমানুষী স্বপ্ন দেখার বয়স আর তার নেই।

সে হঠাৎ কলকাতায় এসেছে বলে সবাই অবাক হয়েছে। বাড়ীর সবাই আশা করে, মন দিয়ে লেখা পড়া করবে, সে ভালো রেজাল্ট করবে। সে যে জীবন মরণ পণ করে পড়েছে, সে কথা কেউ জানে না। তবু এক এক সময় অসহ্য লাগে। চন্দনার কথা মনে পড়লেই কি ভীষণ একা লাগে। যদি নিশ্চিন্ত থাকা যেত।

হোস্টেলে প্রথম প্রথম ইন্দ্রজিতকে যে কত কষ্ট পেতে হয়েছে, সে কথা ইন্দ্রজিৎ কাউকে জানায় নি। চন্দনাকেও না। ওর, যেদিন তাকে সারারাত শুধু বুড়ো আঙ্গুলের ওপর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এক একবার পা পড়ে গেলেই বড় ছেলেরা চাবুক মেরেছে আর আলপিন ফুঁটিয়েছে ঘাড়ে। পরের দিন পায়ের শিরা ফুলে গিয়ে অসহ্য ব্যথা হয়েছিল। সে সবও ইন্দ্রজিৎ মুখ বুজে সহ্য করে গেছে শুধু চন্দনার কথা ভেবে। চন্দনাকে পাবার জন্য তাকে টিকে থাকতেই হবে, তাকে পাশ করতেই হবে।

কিন্তু যদি পাশ করে এসে দেখে চন্দনা নেই। চন্দনাকে তার আগেই যদি কেউ কেড়ে নিয়ে যায়?

কিছুক্ষণ বাদে সে একটা বড় নিশ্বাস ফেলে ধাতস্থ হলো। জুতোর ফিতে খুলতে লাগলো নীচু হয়ে। তারপর জামা খুলে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লো বিছানায়। চোখ বুজলো।

স্নান টান সেরে এসে রূপা বললো, এই ছোড়দা এই অবেলায় ঘুমোচ্ছিস কেন? মা বললো তোকে চান করে নিতে।

ইন্দ্রজিৎ চোখ মেলে বললো, রান্না হয়েছে?

মাংস চেপেছে। একটু বাদেই হয়ে যাবে?

তা হলে একটু বাদেই চান করবো। দাদা ফেরেনি তো এখনো?

দাদা কখন ফিরবে, তার ঠিক নেই। তোর তো খিদে পেয়েছে বলছিস। আমার সঙ্গে খেয়ে নিতে পারিস।

থাক, দাদা এলে এক সঙ্গে খাবো।

রূপা আর কিছু না বলে নিজের বই খাতা বার করে নিতে লাগলো। রূপার ছিপছিপে চেহারা, ছটফটে স্বভাব। একটা জংলা ছাপা শাড়ী পরেছে।

ইন্দ্রজিৎ তাকিয়ে আছে ছোটবোনের দিকে। কলেজে ভর্তি হবার পর থেকেই রূপা যেন হঠাৎ বড় হয়ে গেছে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, রূপা এই শাড়ীটায় তোকে চমৎকার মানিয়েছে তো!

রূপা মনে মনে হাসলো। সে রীতিমতন বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে জানে যে তার এই ছোড়দাটি আগে কখনো লক্ষ্য করেনি সে কি শাড়ী পরে। আগে কখনো বলেনি তাকে কিসে মানায় কিংবা কিসে মানায় না। এখন এই কথা বলার মানে, ইন্দ্রজিৎ খুশী করতে চাইছে তাকে।

রূপা মুখ ঘুরিয়ে বললো, চন্দনাকে বলবো যে তুই এসেছিস কলকাতায়? ইন্দ্রজিৎ উদাসিন ভাবে উত্তর দিল, এ আর বলবার কি আছে? হঠাৎ ওকে বলতে যাবি কেন?

আজ চন্দনার সঙ্গে আমার দেখা হবে কিনা। নিয়ে আসবো ওকে আমাদের বাড়িতে?

আমি তার কি জানি। কি আজেবাজে কথা বলিস!

ঠিক আছে বাবা আজেবাজে কথা। এরপর যেন বলিস না, চন্দনাকে তোর চিঠি পৌছে দিতে হবে।

রূপা মার খাবি কিন্তু।

থাক, আর কিছু বলবো না। চন্দনার তো বিয়েই হয়ে যাচ্ছে। এ বাড়িতে আর ওর না আসাই ভালো। ওর মাও পছন্দ করেন না।

এটুকু মেয়ে, এরই মধ্যে বিয়ে হয়ে যাবে?

ওদের বাড়ি এই রকমই। একজন খুব ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, বয়সে অবশ্য চন্দনার চেয়ে এগারো বছর বেশী, কিন্তু খুব হ্যাণ্ডসাম।

বাঃ, খুব আনন্দের কথা তো!

রূপা বললো, আমি চলি, আমার দেরি হয়ে যাচ্ছে।

তারপর সারা ঘরে তার রঙীন আঁচলের ঘুর্ণি তুলে রূপা বেরিয়ে গেল।

ইন্দ্রজিৎ চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়লো খাটে। চোখ বন্ধ করেও সে অনেক কিছু দেখতে পাচ্ছে।

দাদার জন্য প্রায় দেড়টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলো ইন্দ্রজিৎ। দাদা তখনও ফিরলো না। মা রাগ করে বললেন, তুই আর কতক্ষণ বসে থাকবি, খেতে বসে যা। তোর দাদার কথা আর বলিস না, সারাদিন টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। রোজই ওর ভাত ঢেকে রাখতে হয়। উনি চারটি খেয়ে ধন্য করেন আমাদের!

দাদার জন্য একটু দুঃখ হলো ইন্দ্রজিতের। দাদা এম, এ. পাশ করে বেকার বসে আছে। বাড়িতে তার আর খাতির নেই। বাবা অনেক করে দাদাকে বলেছিলেন সায়েন্স পড়তে। দাদা কিছুতেই পড়লো না। শেষ পর্যন্ত নিল কিনা বাংলায় অনার্স। তাও তো মন দিয়ে পড়াশুনো করলো না তেমন ভাবে। কি সব পত্রিকা-টত্রিকা বার করা নিয়ে মেতে উঠলো। লেখাপড়ায় খারাপ ছিল না দাদা, তবু সাধারণভাবে বাংলায় এম, এ, পাশ করায় তার এখন কোন সম্মান নেই।

বাবার রিটায়ারমেণ্টের আর কয়েক বছর মাত্র বাকি। এখন থেকেই সেই জন্য চিন্তিত! এখনো তিনটি ছেলেমেয়েদের পড়ার খরচ চালাতে হয়। তার মধ্যে আবার ইন্দ্রজিতের ইঞ্জিনিয়ারিং পড়াবার খরচ একটা বিরাট বোঝার মতন। বাবা-মা আশা করে আছেন, ইন্দ্রজিৎ ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে বেরুলেই একটা মস্ত চাকরি পাবে —তখন সব দৈন্য ঘুচে যাবে।

দাদার সম্পর্কে বাড়ির সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছে। অনেক চেষ্টা

করেও দাদা চাকরি পাচ্ছে না। বাংলার এম এ-কে কে চাকরি দেবে? একমাত্র রাস্তা কোন স্কুল বা কলেজে মাস্টারি। কলেজে বাংলায় এম-এ হলে চাকরি পাওয়া এখন দারুণ শক্ত অনেক ক্যাণ্ডিডেট। চেষ্টা চরিত্র করলে একটা মফঃস্বলের দিকে স্কুলে পাওয়া যায়—কিন্তু দাদার দারুণ জেদ মাস্টারি করবে না।

মা আজকাল দাদা সম্পর্কে রাগ রাগ করে কথা বলেন সব সময়। অথচ ইন্দ্রজিৎ জানে, মা দাদাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন ভাই বোনদের মধ্যে। দাদা চিরকালই মাছের বড় টুকরোটা পেয়ে এসেছে। এখন বেকার বলেই দাদাকে মা প্রকাশ্যে আর প্রশ্রয় দেন না।

বাবার সঙ্গে দাদার তো আর দেখাই হয় না প্রায়। দাদা বাবাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলে।

ইন্দ্রজিতের খাওয়া প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, এমন সময় তার দাদা অমল বাড়িতে ঢুকলো। এত বেলায় ফেরার জন্য মুখ চোখে একটা সঙ্কুচিত ভাব। পাজামা ও পাঞ্জাবী পরা, এক মাথা রুক্ষ চুল, দু'দিনের না-কামানো দাড়ি। এই তিনমাসে দাদা আরও রোগা হয়ে গেছে, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্য করলো। বাড়ির রান্না খেয়েও রোগা হয়ে যাচ্ছে, মা তা বোঝেই না।

ইন্দ্রজিতকে দেখে অমল বললো, খোকন, তুই কখন এলি? হঠাৎ চলে এলি যে!

ইন্দ্রজিৎ হেসে বললো, তোমরা সবাই মিলে এই কথা জিজ্ঞেস করছো কেন? একদিন দু'দিন কলেজ কমাই করা যায় না!

অমল বললো, না, তোদের তো রেসিডেন্সিয়াল কলেজ, হঠাৎ কেউ চলে আসে না! শরীর-টরির খারাপ হয়নি তো!

কিছু হয়নি। এমনি খেয়াল হলো, চলে এলাম। তুমি চান করে নাও টপ করে। আমি বসছি। এক সঙ্গে খাবো।

অমল বললো, আজ আর চান করবো না তাহলে। মা খাবার দিয়ে দাও আমায়।

মা মুখ ঝাপটা দিয়ে বললেন, চান করবি না কি? নোংরা হদ্দ কোথাকার! যা চট করে চান করে আয়!

অমল তার প্রতিবাদ করার সাহস করলো না। খাবার ঘরেই জামাটা খুলে রেখে দৌড়ে চলে গেল বাথরুমে। মাত্র দেড় মিনিটে সে স্নান সেরে ফিরে এসে ব্যস্ত হয়ে বললো, কই, এখনো ভাত বাড়োনি?

মা বললেন, চুল আঁচড়ালি না?

পরে আঁচড়াবো, দাও না

না, যা, আগে চুল আঁচড়ে আয়। এত দেরী করে এসে বাবুর আর এক মিনিট তর সইছে না!

বলছি তো, পরে চুল আঁচড়াবো। আগে খেয়ে নিই।

না, ওসব চলবে না। চুল আঁচড়ে আয় বলছি না!

অমল আর কোনো কথা না বলে উপরে উঠে গেল। তারপর আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেও ফিরলো না। মা ভাত বেড়ে রেখেছেন। এত তাড়াহুড়া করছিল অমল, এখন তার এরকম অস্বাভাবিক দেরী হওয়ায় চেঁচিয়ে ডাকলেন, অমু, অমু! চুল আঁচড়াতে যে একঘণ্টা লাগিয়ে দিচ্ছিস।

ওপর থেকে অমল উত্তর দিল, আজ আর খাবো না। আমার খিদে নেই।

মা ইন্দ্রজিতের দিকে ফিরে বললেন, দেখলি তো রাগ আছে ষোলো আনা! আমি অন্যায় কিছু বলেছি! ঠিক সময় চান করবে না, চুল আঁচড়াবে না—আবার সে কথা বললেই রাগ।

ইন্দ্রজিৎ ডাকলো, দাদা এসো, আমি বসে আছি।

ওপর থেকে উত্তর এলো, তুই খেয়ে নে খোকন। আমি আজ আর খাবো না।

এঁটো হাতেই ওপরে উঠে গেল ইন্দ্রজিৎ। দেখলো চুল আঁচড়ে নিয়েছে অমল, পাজামা ও গেঞ্জি পরে একটা বই খুলে নিয়ে বসেছে। ইন্দ্রজিৎ বললো, দাদা, কি ছেলেমানুষের মতন রাগ করছো। এসো,

খাবো এসো।

অমল মুখ তুললো। মুখে পাতলা অভিমানের ছায়া।

আর বেশী জেদ করলো না সে শান্তভাবে বললো, হঠাৎ খিদে মরে গেল, তাই খেতে ইচ্ছে করছে না। আচ্ছা চল্।

হু'ভাই নেমে এলো নীচে। অমল চেয়ার টেনে বসল। ভাত ভেঙে তার মধ্যে খানিকটা ডাল মাখলো। পাশ থেকে একটা বেগুন ভাজা তুলে এক কামড় দিয়ে বললো, সব ঠাণ্ডা।

মা বললেন, তোমারজন্য সব সময় কে সব কিছু গরম করে রাখবে।

ঠিক আছে, বলিনি তো গরম করে দিতে।

হঠাৎ ইন্দ্রজিতের বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো। দাদার জন্য খুব কষ্ট হলো তার। কিছুদিন আগেও দাদা ছিল এ বাড়ির সবচেয়ে আদরের ছেলে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে দাদা দারুণ শৌখিন আর খুঁতখুঁতে। ঠাণ্ডা খাবার সে কোনোদিন খেতে পারে না। কলেজে পড়ার সময় এক একদিন দাদা অনেক রাত করে বাড়ি ফিরলেও মা নিজে দাদার সব খাবার গরম করে দিয়েছে।

দাদা আজ ঠাণ্ডা খাবার মুখ বুজে খেয়ে যাচ্ছে। মা সব জানেন, তবু দাদার জন্য এখন আর আলাদা ব্যবস্থা হবে না।

ইন্দ্রজিৎ আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলো। তার জন্য মাংস দেওয়া হয়েছে আলাদা বাটিতে। আর দাদাকে দেওয়া হচ্ছে হাতায় করে তুলে। যেন ইন্দ্রজিৎ এ বাড়ির বিশিষ্ট অতিথি। আর দাদা একজন সাধারণ লোক।

এর কারণ কি এই, সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ছে আর দাদা বাংলায় এম, এ। দাদা বেকার, কিন্তু ইন্দ্রজিতও তো টাকা রোজগার করে না, বরং তার জন্য অনেক টাকা খরচ হয়। তবু তার ভবিষ্যৎ আছে। দাদার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। দাদা চাকরি-বাকরি করে না অথচ কবিতা লেখে, এটাও যেন একটা লজ্জার ব্যাপার।

অমল খাবার সময় আর একটাও কথা বললো না। কোনো

খাবার দ্বিতীয়বার চাইলো তো না-ই, মা কিছু দিতে এলেও সে নিল না। ফেলে ছড়িয়ে কোনোরকমে খাওয়া শেষ করে হাত ধুয়ে ওপরে উঠে গেল।

ইন্দ্রজিৎ ওপরে উঠে দেখলো, দাদা নিজের ঘরে খাটে গা এলিয়ে দিয়ে আবার সেই বইখানা খুলে ধরেছে। কবিতার বই। এক হাতে সিগারেট।

ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞেস করলো, দাদা, তোমার ঘরে একটু বসবো!

অমল বললো, হ্যাঁ, বোস না!

তারপর অমল অপ্রত্যাশিত ভাবে বললো, খোকন, তুই সিগারেট খাসতো? খেতে পারিস আমার সামনে।

ইন্দ্রজিৎ লজ্জা পেয়ে গেল। দাদার সামনে কখনো সিগারেট খায়নি আগে। ভাত খেয়ে উঠে একটা সিগারেট খাওয়া ভারী আরামের। তবু সে ইতস্তত করতে লাগলো!

অমল চারমিনারের প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, নে, লজ্জা কি! হস্টেলের ছেলেরা তো সবাই সিগারেট খায় দেখেছি।

ইন্দ্রজিৎ চারমিনার খেতে পারে না, তার দারুণ কড়া লাগে। কিন্তু এখন পকেট থেকে নিজের সিগারেট বার করতে খুব লজ্জা করলো। তাছাড়া দাদার তুলনায় সে অনেক বেশী দামী সিগারেট খায় এটা দেখানো যেন কি রকম।

চারমিনার নিয়েই সে আস্তে আস্তে টানতে লাগলো। তারপর বললো, দাদা, তোমার যে পত্রিকাটা বার করতে, সেটার নতুন সংখ্যা বেরিয়েছে? আমি তোমাদের জন্য কয়েকটা গ্রাহক জোগাড় করে দিতে পারি।

অমল অবহেলার সঙ্গে বললো, সে কাগজ বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন?

অনেক খরচ। কে চালাবে? বিজ্ঞাপন পাওয়া যায় না—স্টল-ওয়ালারা বড় বড় কাগজের আড়ালে চাপা দিয়ে রাখে।

ইস, তা বলে বন্ধ করে দিলে কাগজটা।

ওরকম কত কাগজ বন্ধ হয়ে যায়।

দাদা, তোমার কোনো কবিতার বই বেরুবে না ?

আমার কবিতার বই আবার কে বার করবে !

কেন, কত বই তো বেরোচ্ছে দেখছি।

অনেকেই নিজের পয়সায় ছাপে। আমার অত টাকা কোথায় !

ইন্দ্রজিৎ একটু চুপ করে রইলো। সে অবশ্য ঠিক বুঝতে পারে না যে লোকেরা নিজের পয়সা দিয়ে বই ছাপে কেন। কিন্তু তার দাদার যখন ছাপার ইচ্ছে আছে অথচ টাকা নেই, তখন এটা নিশ্চয়ই একটা খারাপ ব্যাপার।

কত টাকা একটা বই ছাপাতে লাগে কে জানে ! তার দাদার এখন রোজগার নেই কোনো, স্বভাবটা দিলদরিয়া ! দাদার হাতে পাঁচ টাকা দশ টাকা থাকলেও বন্ধুদের খাইয়ে উড়িয়ে দেবে। ইন্দ্রজিৎ এরকম অনেকবার দেখেছে। দাদা তার নিজের হাত ঘড়িটা দিয়ে দিয়েছে ইন্দ্রজিতকে।

ইন্দ্রজিৎ আবার বললে, আমাদের হস্টেলে কয়েকটা ছেলে তোমার কবিতা পড়েছে।

ইন্দ্রজিৎ দাদাকে খুশী করার জন্য এ কথাটা বানিয়ে বললেও অমল প্রায় বিশ্বাস করে ফেললো।

অমল অবাক হয়ে বললো, তোদের কলেজের ছেলেরা আবার কবিতা পড়ে নাকি !

বাঃ, ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র হলে কি অন্য কিছু সম্বন্ধে খোঁজ রাখতে নেই। আমাদের ওখানে স্টাডি সার্কেল হয় নিয়মিত।

যতীন সেনগুপ্ত ছাড়া আর কোনো ইঞ্জিনিয়ার কবির কথা শুনিনি কখনো।

কবিতা না লিখলেও কবিতা পড়তে তো পারি। বেশ কয়েকজন ওখানে আছে। কবিতার বই কেনে, পত্রিকা আনায়। তোমার কবিতা আবৃত্তি করে—অবশ্য জানে না যে আমি তোমার ভাই।

অমল একটা সিগারেট শেষ করে সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ধরালো।

তারপর এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললো, আমি তো কবিতা লেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছি ?

কেন ?

কি হবে আর ওসব লিখে ?

বাঃ, তোমার এখন নাম হচ্ছে বেশ।

নাম দিয়ে কি ধুয়ে খাবো। আজকালকার দিনে কবিতা লিখি শুনলে কেউ চাকরিও দিতে চায় না। খবরের কাগজে একটা চাকরির চেষ্টা করছি, যদি হয়।

ইন্দ্রজিতের ইচ্ছে হলো যে বলে, দাদা, তুমি পাঁচটা বছর কোনো ক্রমে চালিয়ে নাও। তারপর তো আমি পাশ করে বেরিয়েই চাকরি পাবো—তখন সংসারটা আমিই চালিয়ে নেবো। তুমি তোমার ইচ্ছে মতন দিন কাটাবে। তোমার কবিতা লিখতে ভালো লাগে শুধু শুধু টাকার চিন্তা করে তুমি ছাড়বে কেন ?

কিন্তু সে মুখে তা বললো না। ছোট ভাই হয়ে দাদাকে একথা বলা যেন কি রকম শোনায়। কয়েক বছর আগেও সে দাদার হাত ধরে ক্রিকেট খেলা দেখতে গেছে। দাদা কত বই পড়েছে, বানান সম্পর্কে দাদার পাণ্ডিত্য দেখে সে মুগ্ধ হয়ে যেত। আজ দাদা কোনো চাকরি পাচ্ছে না বলেই কি তার সঙ্গে উপদেশের সুরে কথা বলতে পারে ?

তার মানে আছে, বছর সাতেক আগে সে একবার বঙ্গ সংস্কৃতি মেলা দেখতে গিয়ে হারিয়ে গিয়েছিল। ভুল করে সেই গেট দিয়ে একবার বেরিয়ে পড়ে আর ঢুকতে পারে নি। বাড়ি ফেরার জন্য সে বাসে উঠতে গেছে, তখন সে অতীব ছেলেমানুষ, রাত্রিবেলা ঠিক খেয়াল করতে পারেনি, উঠে পড়েছে উল্টো দিকের ন'নম্বর বাসে। শ্যামবাজারে আসবার বদলে পৌঁছে গেছে যাদবপুর আবার বাসে উঠেছে, দেখলো পয়সা নেই পকেটে! মাঝ রাস্তায় নামিয়ে দিল। ইন্দ্রজিতের অসহায় অবস্থা। কোনোক্রমে অনেক রাত্তিরে ফিরেছিল বাড়িতে। এসে শুনলো, দাদা তখনও ফেরেনি। দাদা ওকে

খোঁজবার জন্য সারা-কলকাতা শহরটা চষে বেড়িয়েছিল। গিয়েছিল সমস্ত থানায় আর হাসপাতালে। দাদা ফিরলো রাত একটায় উস্কোখুস্কো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত চেহারা। হঠাৎ ইন্দ্রজিতকে দেখে দু'এক মুহূর্ত কথা বলতে পারেনি—তারপরেই এক চড় মেরে বলেছিল উল্লুক।

দাদার হাতের মারও সেদিন খুব মিষ্টি লেগেছিল ইন্দ্রজিতের।

অমল বললো, তুই শুবি? এখানটায় একটু শো না।

ইন্দ্রজিৎ কিছু বলার আগেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো একটি মেয়ে।

অমল ধড়মড় করে উঠে বসলো। গেঞ্জি পরা ছিল বলে দ্রুত উঠে গিয়ে গায়ে একটা জামা গলালো। অমলের চোখের দৃষ্টি শঙ্কিত।

মেয়েটি হেসে বললো, এদিকে এসেছিলাম, তাই হঠাৎ চলে এলাম। আপনাকে বাড়িতে পাবো, ভাবিনি।

অমল বললো, আসুন।

মেয়েটি বেশ লম্বা ও চোখা। খুব সুশ্রী নয়, কিন্তু মুখে চোখে একটা আলগা লাবণ্য আছে! অমলের সঙ্গে এম. এ ক্লাসে এক সঙ্গে পড়েছে। একটা ডুরে তাঁতের শাড়ী পরে আছে, নিরলঙ্কার হাতে শুধু একটা ছোট্ট ঘড়ি, কাঁধে ঝোলানো শান্তিনিকেতনী ব্যাগ।

মেয়েটি ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বললো, তুমি ভালো আছো?

ইন্দ্রজিৎ ঘাড় হেঁট করে বললো, হ্যাঁ। আপনি ভালো আছেন তো সান্ত্বনাদি?

হ্যাঁ ভাই। তুমি তো এখন বাইরে কোথাও থাকো তাই না।

আরও দু'একটা এরকম মামুলি কথার পর ইন্দ্রজিৎ উঠে পড়ার জন্য উসখুস করতে লাগলো। সান্ত্বনাদি এসেছেন দাদার সঙ্গে গল্প করার জন্য, তার এখানে বসে থাকার কোনো মানে হয়। কিন্তু হঠাৎ উঠে পড়বেই বা কি করে।

সান্ত্বনাদির সাহস দেখে অবাক হয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ। মা এই সান্ত্বনাদিকে দু'চক্ষে দেখতে পারেন না। দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে মা

নিজের ঘরে গেছেন, রাঁধুনি নিশ্চয়ই দরজা খুলে দিয়েছে। মা দেখতে পেলে নিশ্চয়ই একটা কিছু গণ্ডগোল হতো

ইন্দ্রজিৎ এর আগে দেখেছে, সান্ত্বনাদি কখনো এলে মা নিজের ঘর থেকে রাগী রাগী গলায় ডেকেছেন, অমল! অমল!

দাদা উঠে গিয়ে মার কাছে দাঁড়ালে মা বলেছেন, ঐ মেয়েটা কে? বাড়িতে আসে কেন?

অমল ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বলেছে। চুপ! একটু আস্তে বলো না মা!

মা তবু গলা না নামিয়ে বলেছেন, ঐ মেয়েটা বাড়িতে আসে কেন?

আমরা এক সঙ্গে পড়ি।

তা বাড়িতে আসবার দরকার কি!

আমার অন্য বন্ধুরা কত আসে, আর একটা মেয়ে এলেই—আঃ তোমরা কি ব্যাকডেটেড।

হয়েছে, হয়েছে। ওরকম যখন তখন বাড়িতে আসতে বারণ করবি!

কারুকে আসতে বারণ করা যায়? আমি মোটেই তা বলতে পারবো না।

তখন অমল ছাত্র ছিল, এখনকার মতন বেকার নয়, তাই অনেক সময় মায়ের মুখে মুখে তেজের সঙ্গে কথা বলতে পারতো। এখন আর তা পারে না।

সান্ত্বনাদির পদবী কুণ্ডু। মায়ের চোখে ওরা খুবই নিচু জাত। মায়ের ধারণা, ঐ নিচু জাতের মেয়েটা তার ছেলের সঙ্গে বেশী খাতির জমিয়ে মাথা ঘুরিয়ে দিতে এসেছে। হঠাৎ যদি অমল ঐ মেয়েটিকে বিয়ে করতে চায়, তা হলে আর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে মুখ দেখানো যাবেনা! এদিকে সান্ত্বনাদি যে এম. এ. পাশ এবং একটা কলেজে পড়াচ্ছেন, এতেও তার জাতের মলিনত্ব ঘোচে নি মার চোখে। হস্টেলে থাকতে গিয়েই ইন্দ্রজিৎ প্রথম ঠিক মতন বুঝতে পেরেছে যে জাতপাতের ব্যাপারটা কত বাজে!

ইন্দ্রজিৎ বললো, সান্ত্বনাদি, আপনি বসুন, আমি একটু আসছি।
ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে পড়লো। সে বরং এখন মাকে অন্য দিকে আটকে রাখার চেষ্টা করবে।
বেরিয়ে যেতে যেতে ইন্দ্রজিৎ শুনতে পেল, সান্ত্বনাদি দাদাকে বলছেন, আপনাকে কফি হাউসে কয়েকদিন দেখিনি কেন ?
দাদা উত্তর দিল, এমনিই যাই নি। আপনি এই রোদ্দুরের মধ্যে এতটা এলেন।
ইন্দ্রজিতের একটু হাসি পেল। সান্ত্বনাদির সঙ্গে দাদার প্রায় পাঁচ ছ' বছরের বন্ধুত্ব। তবু ওরা দু'জনকে এখনো আপনি বলে। কি যে অদ্ভুত স্বভাব হয় কবিদের। দাদা যে সান্ত্বনাদিকে বিয়ে করবে, এতে কোনো সন্দেহই নেই ইন্দ্রজিতের। চাকরি পাচ্ছে না বলেই দাদা বিয়ে করতে পারছে না। তখন মা খুব আপত্তি করলে দাদা বোধহয় অন্য কোথাও বাড়ি ভাড়া করে থাকবে। ইন্দ্রজিৎ অবশ্য মাকে বোঝাবার চেষ্টা করবে খুব। আজকালকার দিনে এরকম কুসংস্কারের কোনো মানে হয়।
ইন্দ্রজিৎ দেখলো, দাদা আর সান্ত্বনাদি একটু পরেই বেরিয়ে গেল। যাবার সময় দাদা এমন ভাবে দরজাটা বন্ধ করলো, যাতে একটুও শব্দ না হয়।
ইন্দ্রজিৎ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো দাদার জন্য। এই দুপুরবেলা নির্জন ঘরে সান্ত্বনাদির সঙ্গে গল্প করতে পারলেই নিশ্চয় বেশী ভালো লাগতো দাদার। ইন্দ্রজিৎ এটা ভালো করেই বোঝে। তবু দাদা থাকতে সাহস পেল না মায়ের কথা ভেবে। এই দুপুর রৌদ্রে কোথায় কোথায় ঘুরবে! কলকাতা শহরে কি একটুও ফাঁকা জায়গা আছে!
ইন্দ্রজিৎ গিয়ে শুয়ে পড়লো রূপার বিছানায়। হস্টেলে দুপুরে ঘুমোনো যায় না, সারা সপ্তাহ ক্লাস থাকে—রবিবার প্রচণ্ড আড্ডা হয়। অনেকদিন পর ইন্দ্রজিৎ দুপুরে টেনে ঘুম দিল।
জাগলো যখন তখন বিকেল পেরিয়ে গেছে।

রূপা ফিরে এসেছে কলেজ থেকে। কিন্তু এত দুষ্টু মেয়ে, একবারও বললো না, চন্দনার সঙ্গে দেখা হয়েছে কিনা।

বাবা ফিরলেন একটু পরে। অফিস থেকে ফেরার পর বাবা আজকাল রোজই খুবই ক্লান্ত থাকেন। এসেই শুয়ে পড়েন বিছানায়।

নিজেই তিনি ডেকে পাঠালেন ইন্দ্রজিতকে চিন্তিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে, খোকন, তুই হঠাৎ চলে এলি যে? কলেজ ছুটি?

ইন্দ্রজিৎ মুখ নীচু করে বললো, না এমনি?

স্ট্রাইক হচ্ছে নাকি? কি যেন শুনছিলাম ঐ রকম।

না, স্ট্রাইক নয়।

স্ট্রাইক ফাইকের দলে কক্ষনো ভিড়িস না।

বাবা জানেন না, স্ট্রাইক হলে কোনো ছেলের পক্ষেই আলাদা থাকা যায় না আজকাল। তাতে জীবন সংশয় হতে পারে। যাই হোক, এখন তো সে রকম কোনো ব্যাপার নেই।

না, আমাদের এখানে স্ট্রাইক হবার কোনো কথা নেই।

তাহলে হঠাৎ এলি যে?

এমনিই। অনেকদিন কলকাতায় আসিনি।

আর তো তিন সপ্তাহ পরেই পুজোর ছুটি।

বাবার এ' কথাটার ইঙ্গিত স্পষ্ট। কিছুদিন পরেই পুজোর ছুটি হবে, তখন তো ইন্দ্রজিৎ চলে আসবেই। শুধু শুধু তার আগে ট্রেন ভাড়া করে আসা একটা বিলাসিতা। থার্ড-ক্লাস ট্রেনে যাতায়াত করতে সব মিলিয়ে এগারো টাকা খরচ। তাছাড়া হস্টেলে খাও আর না খাও টাকা তো কেটে নেবেই।

ইন্দ্রজিৎ একটু লজ্জিত বোধ করলো। এই টানাটানির সংসারে সে বেশী টাকা খরচ করিয়ে দিচ্ছে।

বাবা আবার জিজ্ঞেস করলেন, পড়াশুনোয় মন বসছে তো? কিছু অসুবিধে হচ্ছে ওখানে?

না, কিছু অসুবিধে নেই।

তোর ওপরে আমাদের অনেক আশা-ভরসা। দেখিস্—

এ কথাটা আরও মর্মান্তিক। কলেজ চলাকালীন সে চলে এসেছে, তার মানে ক্লাস নষ্ট হচ্ছে। তার মানে, ভালো পড়াশুনো হচ্ছে না! তাহলে সে ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভালো রেজাল্ট করে বড় চাকরি পাবে কি করে? তার ওপরে যে সকলে নির্ভর করে আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেও যে আজকাল অনেকে বেকার বসে থাকে—সে কথা এ বাড়ির কেউ ভাবতে পারে না।

তারপর হঠাৎ চলে আসার জন্য একটা ভালো মতন যুক্তি দেখানো প্রয়োজন।

ইন্দ্রজিৎ তাই চট করে ভেবে ভেবে বললো, আমার কয়েকখানা বই ভীষণ দরকার। না হলে পড়াশুনোয় অসুবিধে হচ্ছে।

বাবার কপাল কুঁচকে গেল আবার। বললেন, সে কথা চিঠি লিখে জানালি না তো? কত দাম বইগুলোর? দরকার হলে তো কিনতেই হবে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, না, কেনার দরকার নেই। আমার এক বন্ধুর দাদা শিবপুরে আছেন, ওঁর এবার ফাইনাল ইয়ার। সুবোধদাকে চিঠি লিখেছিলাম, উনি ওঁর দু'খানা বই আমাকে দেবেন বলেছেন।

সাংসারিক ঝামেলায় বাবা আজকাল অনেক কিছুতেই অবিশ্বাসী হয়ে পড়েছেন, বললেন, ঠিক দেবে তো?

আজই সন্ধেবেলা যাবো একবার শিবপুরে।

মা বললেন, এই সন্ধেবেলা অতদূরে যাবি? কাল যাস বরং।

বাবা মাকে এক ধমক দিয়ে বললেন, শিবপুর আবার কত দূর সেখানে মানুষ জন থাকে না? সেখানে রাত্তিরে কি বাস চলে না? যাক্ আজই বরং ঘুরে আসুক।

চা বিস্কুট খেয়ে ইন্দ্রজিৎ শিবপুরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। কিন্তু শিবপুরের দিকেই গেল না একেবারে। সি আই টি রোডে গিয়ে একটা পার্কের পাশে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, তিনটি মেয়ে উল্টো দিক থেকে হেঁটে আসছে। তিন জনের শাড়ী তিন রঙের। দূর থেকে মনে হয়,

তিনটি প্রজাপতি।

মেয়ে তিনটি যখন রাস্তা পার হবার জন্য দাঁড়িয়েছে, তখন ইন্দ্রজিৎ হন হন করে তাদের ঠিক সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। যেন সে খুব ব্যস্ত। মেয়েদের মুখের দিকে একবার তাকাবারও সময় নেই।

মেয়ে তিনটি পেরিয়ে গেল রাস্তা। কি একটা হাসির কথায় যেন তারা হাসতে লাগলো খিলখিল করে।

দুটি মেয়ে পাশের গলিতে ঢুকে পড়ার পর তৃতীয় মেয়েটি ভীত চকিত ভাবে একবার তাকালো চারদিকে। তারপর যে দিক থেকে সে এসেছিল, সেই দিকেই হাঁটতে লাগলো আবার।

বেশ খানিকটা দূরে পার্ক সার্কাস ময়দানের কাছে এসে দাঁড়িয়ে আছে ইন্দ্রজিৎ। নার্ভাস ভাবে সিগারেট টানছে। সেই মেয়েটি তার কাছে এসে বললো, সত্যি তুমি! আমি নিজের চোখকেও বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। কি করে এলে?

ইন্দ্রজিৎ হাসতে হাসতে বললো, আকাশ থেকে ঝুপ করে পড়লুম।

হঠাৎ এই সময় এলে যে? আগের চিঠিতেও তো কিছু লেখো নি।

এমনিই এলাম।

এরকম সপ্তাহের মাঝখানে?

ইন্দ্রজিৎ বললো, সবাই আমাকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করছে, সপ্তাহের মাঝখানে কেন এলাম। হঠাৎ কি কারুর একরম একটা ইচ্ছে হতে পারে না? তাছাড়া, ঠিক কেন এসেছি সেটা অন্য কাউকে বলা যায় না।

কি?

তোমাকে নিয়ে একটা ভয়ের স্বপ্ন দেখলাম।

তুমি কি পাগল।

ইন্দ্রজিৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, কোথায় যাবে, এই মাঠের মধ্যে গিয়ে বসবে?

বাড়ির এত কাছে। কে যে কখন দেখে ফেলবে।

দু'জনে গেট দিয়ে ঢুকলো পার্ক সার্কাস ময়দানে। মাঠের মধ্যে ঘাসের ওপর বসলো। অন্ধকার হয়ে এসেছে—অল্প দূর থেকে আর মানুষ চেনা যায় না এখানে।

ইন্দ্রজিৎ বললো, আমার বোন রূপা তোমাকে আজ কিছু বলেছে?

চন্দনা বললো, রূপার সঙ্গে তো আজ দেখা হয়নি। অনেক দিন দেখা হয়নি।

ও যে বললো, তোমার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হয়। তুমি ওকে একটা ইংরাজি গল্পের বই পড়তে দাওনি?

না তো!

রূপাটা দারুণ মিথ্যেবাদী। বানিয়ে বানিয়ে যা খুশী বলে।

তুমি যে খবর টবর না দিয়ে চলে এলে, কি করে জানলে যে এখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে? আমি তো সন্ধের পর বাইরে বেরুই না!

বাঃ, সপ্তাহে দু'দিন তোমার গানের ইস্কুল না? সোম আর বৃহস্পতি!

ও, তুমি সেই কথা মনে করে বসে আছো! কিন্তু আজ তো আমি গানের ইস্কুলে নাও যেতে পারতুম।

তা বললে কি হয়? আমার ইচ্ছেশক্তির তো একটা জোর আছে!

আহা!

ইন্দ্রজিৎ আরাম করে এবার সিগারেট টানতে লাগলো। সত্যিই চন্দনার সঙ্গে তার দেখা হবে কিনা এই নিয়ে এতক্ষণ দারুণ একটা আশঙ্কা ছিল, তবু সে ঝুঁকি নিয়েই এসেছে। আগে থেকে চিঠি লিখে দেখা করার চেয়ে এই রকম দেখার রোমাঞ্চ অনেক বেশী।

সিগারেট শুদ্ধ হাতটা এগিয়ে দিয়ে বললো, তুমি খাবে একটু?

চন্দনা বললো, বাড়ির এত কাছে বসে আমি তোমার সঙ্গে সিগারেট খাই আর কি!

তা হলে চলো, অনেক দূরে চলে যাই ?

আমি একদম দেরী করতে পারবো না গো ! পনের মিনিটের মধ্যে আমাকে ফিরতেই হবে !

আমি এত দূর থেকে এলাম।

আমার ভীষণ ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। কিন্তু কি করবো, আমি যে বন্দী ! একটু দেরী হলেই মা এমন করবেন।

তুমি তা হলে শিগগিরই কি হতে যাচ্ছো ? মুখার্জি না ব্যানার্জি !

তার মানে ?

শিগগির তোমার বিয়ে হবে শুনলাম ?

কি সব আজে বাজে কথা বলো !

একদম সত্যি সব ঠিকঠাক হয়ে গেছে !

তুমি বুঝি এই স্বপ্ন দেখছো।

না, আমি মোটেই বাজে বাজে স্বপ্ন দেখি না। রূপা বললো কিনা ?

রূপা তোমায় রাগায়, তা বুঝতে পারো না ?

উঃ, রূপা যে মিথ্যে কথা বলে মুখ দেখে একটু বোঝা যায় না। যাক গে তোমার সেই সুব্রতদা তোমাকে আর জ্বালাতন করে কি ?

সুব্রতদা আবার কি জ্বালাতন করবে ?

তিনি তো তোমায় দেখে একেবারে পাগল !

রতনদা সম্পর্কে এরকম বলো। উনি ঠিক আমার দাদার মতন।

উনি আবার রতনদা হলেন কবে থেকে ?

ওঁর ডাক নাম রতন।

সুব্রতদার কথা বলে আমি যে তোমাকে রাগাই সেটা তুমি বুঝতে পার না।

বুঝেছি। কি স্বপ্ন দেখলে এবার বলো। কবে দেখলে ?

কালই রাত্তিরে অমনি ভোরবেলায় ট্রেন ধরে চলে এলাম।

এখন বলতে গিয়ে হাসি পাচ্ছে। এমনিতেই কিছুই না। তবু ঝোঁক চাপল, আজ আসতে হবে। তোমার সঙ্গে দেখা করতেই হবে। এ জন্য কত মিছে কথা বলতে হলো হস্টেলে, বাড়িতে—

আমি আর ধৈর্য রাখতে পারছি না।

কিছুই না, বুঝলে? প্রথম দেখলাম, তোমার সঙ্গে কি যেন একটা পাহাড়ী রাস্তায় গেছি! দার্জিলিং বা ঐ রকম কোন জায়গা। বাড়ির কেউ সঙ্গে টঙ্গে নেই। শুধু তুমি আর আমি! অনেকক্ষণ ধরে বেড়াচ্ছি। তুমি একটা গান গাইছো। কি যেন গানটা, ও 'হৃদয় নন্দন বনে নিভৃত এ নিকেতনে'—তুমি এ গানটা জানো!

চন্দনা হাঁটুতে থুতনি রেখে ইন্দ্রজিতের দিকে চেয়ে বললো, একটু একটু জানি।

তুমি সেই গানটা গাইছিলে, একটু একটু বৃষ্টি পড়ছিল। এমন সময় উল্‌টো দিক থেকে ঘোড়ায় চড়ে একজন লোক এলো। প্রথম দিকে মনে হলো, একজন সাহেব, অনেকটা হিলারীর মতন, তারপর তার চেহারাটা বদলে গেল, দেখলাম তোমাদের বাড়ির রতনদা।

রতনদা তোমাকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, কিরে তুই তাহলে এখানেই থেকে গেলি শেষ পর্যন্ত? তুমি বললে, হ্যাঁ রতনদা।

আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, এ কে?

রতনদা আমাকে ভালভাবেই চেনেন, তবু কেন একথা জিজ্ঞেস করলে জানি না। তুমি তার উত্তরে কি বললে জানো।

কি?

তুমি বললে, আমি তো একে চিনি না?

কি পাগলের মতন সব বলছো!

এটা তো স্বপ্ন। স্বপ্নে অনেক কিছু উল্‌টোপাল্‌টা হয়। তারপর তুমি রতনদার সঙ্গে চলে গেলে, আমি সেখানে একা দাঁড়িয়ে

রইলাম। একটু পরেই ঘুম ভেঙ্গে গেল। প্রথমে মনটা একটু খারাপ হয়েছিল। তারপর ভাবলাম, স্বপ্ন দেখে আবার কেউ মন খারাপ করে নাকি। স্বপ্নে লোকে খারাপ জিনিসই বেশী দেখে। কিন্তু তারপরেই আসল ভয়ের ব্যাপারটা হলো, আমি তোমার মুখটা ভাববার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি বাথরুমে গিয়ে চোখে জল দিলাম। তবুও কিছু হলো না। পৃথিবী শুদ্ধ সকলের মুখ মনে করতে পারছি, শুধু যে আমার সবচেয়ে আপন, তার মুখটাই মনে পড়ছে না, এর মানে কি! আমি একেবারে পাগলের মতন হয়ে উঠলাম, জানো!

চন্দনা হাত বাড়িয়ে ইন্দ্রজিতের গা ছুঁয়ে বললো, এই, তুমি কাঁপছ কেন?

ইন্দ্রজিৎ নিজেকে একটু সামলাবার চেষ্টা করলো, তবু পারলো না। আবেগপ্লুত গলায় বললো, কেন এরকম হয় বলতে পারো। আমি কি করে তোমার মুখ ভুলে যেতে পারি! ট্রেনে যখন আসছিলাম, কত করে ভাববার চেষ্টা করলাম! যত রাজ্যের অন্য মুখ মনে পড়েছে। সেই জন্যই আমার মনে হলো, স্বপ্নটাই বোধহয় সত্যি। তুমিও এরপর আমাকে দেখলে বলবে, আমি একে চিনি না! একটু আগে তুমি যখন আর দুটি মেয়ের সঙ্গে হেঁটে আসছিলে, আমি তোমাদের সামনে দিয়ে গেলাম, আমার বুক কাঁপছিল—

চন্দনা খুব মৃদু গলায় বললো, তুমি জানো না। আমিও দিন রাতের অনেকক্ষণই স্বপ্ন দেখি। আমি যখন তোমার স্বপ্ন দেখি। সেই সময়টা তুমি আমাকে দেখতে পাও না। তখন যে শুধু আমারই দেখার পালা।

ইন্দ্রজিতের মুখখানা তখনো বিমর্ষ হয়ে আছে। যেন সে স্বপ্নের কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছে না।

চন্দনা বললো, দেরি হয়ে যাচ্ছে আমি এবার যাই!

ইন্দ্রজিৎ সংক্ষেপে বললো, না!

বাঃ, যেতে যে হবেই।

কেন ?

মা ভীষণ রাগারাগি করেন। জানো না, আমাকে একেবারে বন্দী করে রেখেছেন আজকাল। কোথাও যেতে দেন না একা একা। এই গানের ইস্কুলে যে আসি।

মাসীমা তো আগে এত কড়া ছিলেন না।

তা তো ছিলেনই না। আজকাল কি যে হয়েছে।

ইন্দ্রজিৎ হাওয়া আড়াল করে সিগারেট ধরালো। মুখখানা এখন রীতিমতন গম্ভীর। হঠাৎ যেন কোনো কারণে তার পৌরুষ আহত হয়েছে।

চন্দনার দিকে তাকাতেই দেখলো যে চন্দনা মুখ নীচু করে আছে। আঙুল দিয়ে চন্দনার থুতনিটা তুলে সে বললো, আমার দিকে তাকাও।

চন্দনার চোখে একটা পাতলা জলের পর্দা। একে কান্না বলে না। যেন অপরূপ এক মায়ায় তার মুখখানা সাজানো।

চন্দনা ইন্দ্রজিতের চোখে চোখ রেখে খুব নরম গলায় বললো, কি ?

তুমি কি আমার কাছে কিছু গোপন করছো ?

গোপন ? কি গোপন করবো ?

কিছু না ?

তুমিই তো আমার সবচেয়ে বড় গোপন। তোমার কথাই আজ কারুর কাছে বলতে পারি না। তোমার কাছে আবার কি গোপন করবো ?

ঠিক ?

একি, তুমি আমাকে বকছো কেন ?

আমি যে তোমাকে চিঠি লিখি, তোমার বাড়ির কেউ জানতে পেরেছে ?

না তো।

আমার কথাও কেউ জানে না ?

না।

তা হলে মাসীমা তোমাকে বন্দী করে রাখেন কেন? আগে তো রাখতেন না। নিশ্চয়ই কিছু হয়েছে।

বললাম তো…

ঠাৎ থেমে গেল চন্দনা। প্রায় দু'মিনিট চুপ করে রইলো। টপ্ করে এক ফোঁটা চোখের জল পড়লো মাটিতে। চোখ মুছলো না।

উদাসীন গলায় বললো, তুমি ঠিকই ধরেছো। আমি অনেক কথা গোপন করেছি তোমার কাছে।

বিজয়ীর মতন ভঙ্গিতে তাকালো ইন্দ্রজিৎ। কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপরেই মুখটা আবার বিষাদে ভরে গেল। আস্তে আস্তে বললো, তুমি আর কারুকে ভালোবাসো?

তুমি তাই ভেবেছো যখন।

ইন্দ্রজিৎ জোর দিয়ে বললো, আমি মোটেই তা ভাবিনি।

তবে বললে যে?

যা মনে প্রাণে অবিশ্বাস করি, তাও অনেক সময় মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়।

তুমি যখন প্রথম কলকাতা ছেড়ে চলে, গেলে, তার ঠিক আগের দিন সন্ধ্যেবেলা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে তুমি আমাকে কি জিজ্ঞেস রেছিলে মনে আছে?

বাঃ, কেন মনে থাকবে না?

আমি কি উত্তর দিয়েছিলাম, তা কি মনে আছে?

চন্দনা, সে সব কথা আমি কখনো ভুলতে পারি।

চন্দনা মুখ তুললো। তার চোখে জল. তবু ক্রুদ্ধ দৃষ্টি। বাঘিনীর মতন তেজে বললো, না, তোমার কিছু মনে নেই! কিছু ইয়ে নেই! মনে থাকলে তুমি আমাকে এসব কথা জিজ্ঞেস করতে না। আমি তোমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করছি তা জানো, আমি বাবাকে আত্মহত্যার ভয় দেখিয়েছি পর্যন্ত। কেউ আমাকে হার মানাতে

পারে নি। আমি তোমার জন্য এত···আর তুমি স্বপ্ন দেখছো যে আমি তোমাকে চিনতে পারছি না, তোমাকে ভুলে গেছি।

ইন্দ্রজিৎ আহত ভাবে তাড়াতাড়ি বললো, না, না, আমি ঠিক সেভাবে বলতে চাইনি—আমি শুধু তোমার গোপন কথাটা জানতে চাইছিলাম।

তেজের সঙ্গে চন্দনা বললো, কোনদিন জানতে পারবে না। আমি তোমাকে আর সব কথা বলতে পারি—কিন্তু তোমার মত যদি অন্য কারুর কাছ থেকে কষ্ট পাই—সে কথা বলা যায় না। তুমি আমাকে সব কথা বলতে পারো? তোমার কোনো গোপন কথা নেই?

ইন্দ্রজিৎ জোর দিয়ে বলতে যাচ্ছিল যে, না আমার কোনো গোপন কথা নেই! কিন্তু থমকে গেল একটু। তার মনে পড়ে গেল একটা কথা। যেদিন তার স্যুটকেশ খুলে হস্টেলের বড় বড় ছেলেরা হঠাৎ চন্দনার ছবিটা পেয়েছিল। তারপর সবাই ছবিটা নিয়ে ওঃ সে যে কি অপমান, কি কষ্ট! সে কথা কি সে কোনোদিন চন্দনাকে বলতে পারবে? কিছুতেই না, কিছুতেই না!

ইন্দ্রজিৎ চন্দনার ডান হাতটা চেপে ধরলো। চন্দনা হাতটা ছাড়িয়ে নিতে গিয়েও মত বদলালো। তার ওপর নিজের আর একটা হাত রেখে বললো, বলা যায় না, সব কথা বলা যায় না।

ইন্দ্রজিতের মনে হলো, চন্দনার যেন অনেক শক্তি বেশী। ইন্দ্রজিতের তুলনায় সে অনেক বেশী সাহসী। সে তো ইন্দ্রজিতের গোপন কথা এমন ভাবে জানতে চায় নি। সে তো একটুও ভয় পায় নি।

ইন্দ্রজিৎ আর কোনো কিছু না বলে চুপ করে বসে রইলো কিছুক্ষণ। এক সময় চন্দনা বললো, তোমার রুমালটা দাও তো!

তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দিয়ে বললো, এই যা, রুমাল আনতে তো ভুলে গেছি!

হেসে উঠলো চন্দনা। সেই হাসিতে সমস্ত মেঘ, সমস্ত অন্ধকার,

সমস্ত কষ্ট, সমস্ত গোপনীয়তা ভেসে গেল, হাসতে হাসতে চন্দনা বললো, আনতে ভুলে গেছো না সব কটা রুমালই হারিয়েছো? আবার কিনে দিতে হবে দেখছি।

দূরে একটা গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে ঘণ্টা বেজে উঠলো। চমকে উঠলো দু'জনেই। এবার যেতে হবে। ইন্দ্রজিৎ দু' চোখের সমস্ত আলো দিয়ে দেখে নিলো চন্দনাকে। তার দামী দু'খানা পড়ার বইয়ের চেয়েও এই মুখখানা আজ একবার দেখা খুব বেশী দরকারী ছিল। এ কথা আর কারুকে বলা যায় না।